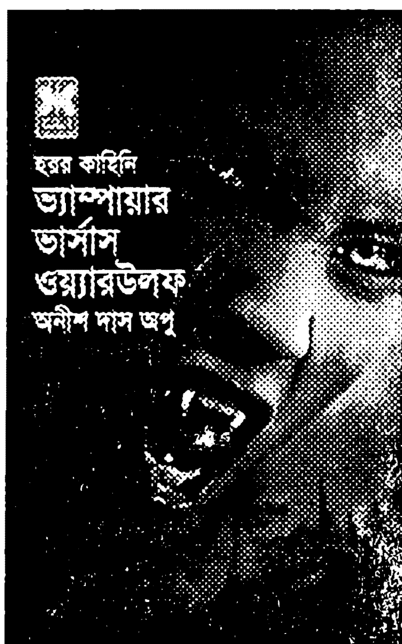
হরর কাহিনি

ভ্যাম্পায়ার ভার্সাস ওয়্যারউলফ

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0271-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

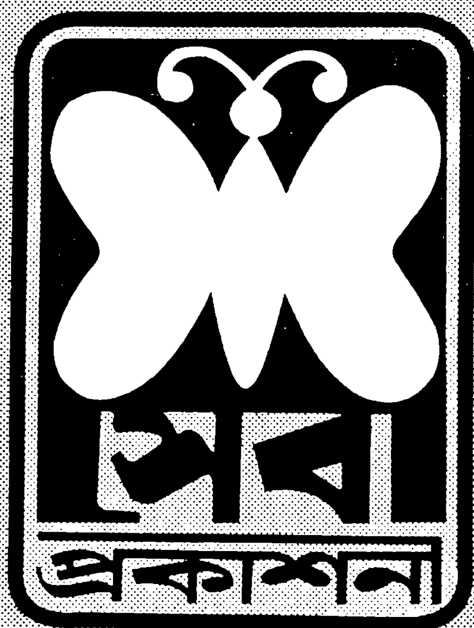
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

VAMPIRE VS WEREWOLF
A Collection of Stories
By: Anish Das Apu



একশ' চোদ্দ টাকা



সেবা প্রকাশনীর কʼটি পিশাচ কাহিনি

ব্রাম স্টোকার
রূপান্তরঃ রকিব হাসান
ড্রাকুলা-১, ২ (একত্রে) ৭২/-
রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস ৮৮/-
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম ৭৬/-
ফ্রেডা ওয়ারিংটন
রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান
রিটার্ন অভ ড্রাকুলা ৯৯/-
কাজি মাহবুব হোসেন
অশুভ সংকেত (তিনখণ্ড একত্রে) ১১০/-
অনীশ দাস অপু
দুঃস্বপ্নের রাত+প্রেতপুরী
আবার অশুভ সংকেত+নেকড়ে মানবী
অশুভ ১৩+অশরীরী আতঙ্ক
ভূত
ওয়্যারউলফ+কিংবদন্তীর প্রেত ৯৪/-
ভ্যাম্পায়ার ভার্সাস ওয়্যারউলফ
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত
মৃত্যু পুতুল+রক্ততৃষ্ণা
ভুতুড়ে দুর্গ+ছায়াবৃত্ত ৯৮/-
পিশাচ-চক্র ৭২/-
ভৌতিক হাত+হাকিনী ১১৪/-
শাঁখিনী ১০২/-

শা[illegible] মসুদ্দীন/অনীশ দাস অপু
প্রে[illegible] শক্তি+পিশাচ দেবতা
অনীশ দাস অপু/আফজাল হোসেন
অশুভ ছায়া+অপার্থিব প্রেয়সী ৭১/-
আফজাল হোসেন
প্রেতাত্মার ছায়া
অতৃপ্ত আত্মা ৯০/-
অভিশপ্ত রক্ত ৮৮/-
ইশতিয়াক হাসান
সব ভুতুড়ে ৭০/-
ভুতুড়ে ছায়া ৮১/-
মিলন গাঙ্গুলী
ওরা আসে নিঝুম রাতে ৯৮/-
অনীশ দাস অপু/তারক রায়
সেই ভয়ঙ্কর রাত+জ্যান্ত মমি ৯৪/-
তৌফির হাসান উর রাকিব
ঈশ্বরী ৮০/-
রোকসানা নাজনীন/
শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া/
রিয়াজুল আলম শাওন
তৃতীয় নয়ন+তান্ত্রিকের মূর্তি+
কেবিন নাম্বার ৩০৫ ১০৮/-

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

ভূমিকা

এবারের বইমেলায় *ভ্যাম্পায়ার স্টোরিজ* নামে একটি বই লেখার কথা ছিল আমার। পাঠকদেরকে বলেছিলাম বইটির নাম *ভ্যাম্পায়ার স্টোরিজ* হলেও এতে গল্প থাকবে না, থাকবে উপন্যাস। পরে সিদ্ধান্তটি আমি বদলে ফেলি। ভাবি শুধু ভ্যাম্পায়ারদের গল্প নিয়েই *ভ্যাম্পায়ার স্টোরিজ* করব। হঠাৎ মাথায় আসে ভ্যাম্পায়ার এবং ওয়্যারউলফ নিয়ে একটি বই করলে কেমন হয়। ওর মধ্যে এ দুটি হরর চরিত্র নিয়ে দুটি আলাদা উপন্যাস থাকবে। টিংকু ভাইকে বলতে তিনিও রাজি হয়ে গেলেন। বইয়ের নামও নির্বাচিত হলো—**ভ্যাম্পায়ার ভার্সাস ওয়্যারউলফ**।

এ বইয়ের প্রথম কাহিনিটি *কারমিল্লা*। জোসেফ শেরিডান লে ফানু'র গথিক হরর উপন্যাসিকা *কারমিল্লা* প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। কারমিল্লা নামে এক সুন্দরী-রূপসী ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে জমজমাট একটি হরর কাহিনি। ব্রাম স্টোকার তাঁর বিশ্বখ্যাত পিশাচ কাহিনি *ড্রাকুলা* রচনা করেছিলেন *কারমিল্লা* দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। শুধু তিনি নন, আধুনিক কালের অনেক হরর লেখকই *কারমিল্লাকে* ভিত্তি করে প্রচুর ভ্যাম্পায়ার উপন্যাস লিখেছেন। এটি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে এ কাহিনি অবলম্বনে সিনেমা, টিভি সিরিজ এবং ভিডিও গেমস পর্যন্ত তৈরি

হয়েছে।

বইয়ের দ্বিতীয় কাহিনি *আতংকের দিন আতংকের রাত* বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে রচিত। এ বইয়ের ওয়্যারউলফটি পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখলে রূপান্তরিত হয় না, কিংবা তার রক্ততৃষ্ণাও জাগে না। তবু কেন গোটা একটি শহরের মানুষ তার ভয়ে মহা আতংকিত থাকে জানতে হলে পড়ে ফেলুন গল্পটি।

জলাভূমির ভয়ঙ্কর নামে তৃতীয় যে হরর কাহিনিটি রয়েছে তাতে যে পিশাচীর কথা বলা হয়েছে সে কিন্তু মানুষের রক্ত পান করে না। তবে গল্পের নায়িকা জিনাত সুলতানা নীলুকে ভয় দেখিয়ে তার আত্মা কাঁপিয়ে দেয়। এটিও বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে। আমার কাছে দারুণ লেগেছে। আশা করি পাঠকদেরও ভাল লাগবে।

আগামীতে খুব শীঘ্রি *ভ্যাম্পায়ার স্টোরিজ* নিয়ে পাঠকদের সামনে আমি আবার হাজির হচ্ছি। শুধুই ভ্যাম্পায়ার নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কিছু গল্প এবং বোনাস হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বইটিতে থাকবে। নিশ্চিত করেই বলতে পারি এ বই হররপ্রিয় পাঠকদের বুকের রক্ত হিম করে দেবে।

অনীশ দাস অপু

কারমিল্লা

এক

স্টিরিয়ায় একটি প্রাসাদদুর্গে বাস করলেও আমাদেরকে ঠিক বড়লোক বলা যাবে না। এ অঞ্চলে স্বল্প আয় উপার্জনেই দিব্যি চলা যায়। বছরে আট-নয় হাজার ডলার কামাই ধনীদের তুলনায় এখানে সামান্যই মনে হবে। আমার বাবা ইংরেজ, এবং আমি একটি ইংরেজ নামও বহন করছি যদিও কোনদিন ইংল্যাণ্ডে যাইনি। তবে এই নির্জন এবং আদিম পরিবেশের অঞ্চলে, যেখানে সবকিছুরই দাম অত্যন্ত সস্তা, সেখানে আরাম-আয়েশ উপভোগ করার জন্য আসলে খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন আছে বলেও আমার মনে হয় না।

আমার বাবা অস্ট্রিয়ান সরকারের চাকরি করতেন, বর্তমানে অবসর নিয়ে পেনশন ভোগ করছেন, মধ্যযুগীয় এই বাড়িটি কিনেছেন অনেক দরদাম করে।

জায়গাটি ছবির মত সুন্দর এবং নির্জন। বনের ধারে উঁচু একটি জায়গায় বাড়িটি। রাস্তাটি অতি প্রাচীন এবং সরু, একটা ড্রব্রিজের সামনে দিয়ে চলে গেছে। এই সেতুটিকে আমি কখনও তুলতে দেখিনি। পরিখার জলে সাঁতরে বেড়ায় মিষ্টি স্বাদের পার্চ মাছ। জলকেলি করে রাজহাঁস, দীঘির ওপর ফুটে থাকে ঝলমলে সাদা পদ্ম।

এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘিরে, অসংখ্য জানালা, গম্বুজ এবং গথিক চ্যাপেলটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রাসাদদুর্গ।

ফটকের সামনে এক ফালি ফাঁকা জায়গা, ডানে ছোট একটি স্রোতস্বিনীর ওপরে খাড়া গথিক ব্রিজ। আঁকাবাঁকা নদীটি বয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের ছায়াঘন বীথির মাঝ দিয়ে।

আমি যে বললাম জায়গাটি খুব নির্জন, তা কিন্তু সত্যি। হলঘরের দরজা দিয়ে রাস্তায় তাকালে বনভূমিটি দেখা যায়। এটির বিস্তার ডানে পনেরো মাইল, বামে আরও বারো মাইল। সবচেয়ে কাছের গ্রামের দূরত্বও এখান থেকে সাত মাইলের কম হবে না। নিকটতম দুর্গটিতে বাস করেন জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ। 'নিকটতম' মানে কিন্তু প্রায় কুড়ি মাইল দূরে।

'সবচেয়ে কাছের গ্রাম' বলতে পশ্চিমে মাইল তিন তফাতে, জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফের বাড়ির দিকে, একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম আছে। ওখানে থাকার মধ্যে রয়েছে কেবল ছোট একটি গির্জা, তার আবার ছাদ নেই। এখানে কার্নস্টাইন পরিবার বাস করত। তারা মরে ভূত হয়ে গেছে কবেই।

এই গ্রাম পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ হিসেবে যে কাহিনি প্রচলিত রয়েছে তার কথা পরে বলব।

আমাদের দুর্গে লোকবসতি খুবই কম। এর মধ্যে অবশ্য চাকরবাকর এবং আশ্রিতদের ধরা হচ্ছে না। এরা দুর্গসংলগ্ন ভবনের ঘরে বাস করে। প্রাসাদে আছেন আমার বাবা। তাঁর মত দয়ালু মানুষ জীবনে দেখিনি আমি। বাবা বুড়িয়ে যাচ্ছেন। আর আমার বয়স উনিশ। আমার মা ছিলেন স্টিরিয়ান, আমার শৈশবে মারা যান তিনি। তবে আমি খুব ভাল একজন গভর্নেস পেয়েছি। সে আমাকে খুব ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে সে আমাকে পেলেপুষে বড় করেছে। মোটাসোটা, সদয় চেহারার মহিলাটির নাম মাদাম পেরোডন। আমার মা, যাঁকে আমি এত অল্পবয়সে

হারিয়েছি যে প্রায় কোন স্মৃতিই মনে নেই, তাঁর অভাব কখনও অনুভব করতে দেয়নি মাদাম পেরোডন নামে সদাশয় নারীটি। একে নিয়ে আমরা ডিনার করি একসঙ্গে। পরিবারে আরও একজন আছে। সে মাদমোয়াজেল ডি লাফন্টেইন। সে ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় কথা বলে, মাদাম পেরোডন কথা বলে ফরাসী এবং ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। ইংরেজি ভাষাটা যাতে ভুলে না যাই এবং দেশপ্রেমের টানে আমরা এ ভাষার চর্চা বজায় রেখেছি বাড়িতে। ফলে ভাষার যে জগাখিচুড়ি তৈরি হতো তা বাইরের লোকদের কাছে হাসির উদ্রেক করত। এছাড়া দু'তিনজন আমার বয়সী বান্ধবীও ডিনারে যোগ দিত। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসত বেড়াতে। আমিও কখনও-সখনও যেতাম ওদের বাড়ি।

সামাজিক যোগাযোগ বলতে এটুকুই তবে পাঁচ-ছয় লীগ (১ লীগ = ৩ মাইল) দূর থেকে পড়শীরাও আসত। কিন্তু এতে আমার একাকীত্ব খুব একটা কাটত না।

যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি আমার জীবনে প্রথম ঘটে, তার ছাপ এমন প্রবলভাবে পড়ে মনের ওপর যে আমি তা কোনদিনই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কারও কাছে হয়তো বিষয়টি নিতান্তই খেলো মনে হতে পারে। তাঁরা ভাবতে পারেন এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ না করলেও চলত। তবে ঘটনা শুনলেই আপনারা ক্রমশ বুঝতে পারবেন কেন এর কথা বললাম।

আমার নার্সারি ঘরটি ছিল প্রাসাদের দোতলায়। বেশ বড়সড় কামরা। ওক কাঠের ঢালু ছাদ। তখন আমার বয়স পাঁচ/ছয় হবে। এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে তাকালাম চারপাশে। কিন্তু নার্স-মেইডকে দেখতে পেলাম না কোথাও। নিজেকে খুব একা লাগছিল। তবে ভয় পাইনি। কারণ আমাকে ভূত-প্রেত বা রূপকথার দত্যিদানবের গল্প শোনানো হতো না।

আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। নিজেকে খুব অপমানিত লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমাকে ইচ্ছে করেই অবহেলা করা হচ্ছে। আমি কুঁইকুঁই করে কাঁদতে শুরু করলাম। একটু পরেই এ কান্না বিস্ফোরণে পরিণত হবে।

এমন সময় অবাক হয়ে দেখি একটি বিষণ্ন তবে ভারি সুন্দর মুখ বিছানার পাশ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এক সুন্দরী তরুণী, বসে আছে হাঁটু গেড়ে, তার হাত বিছানার চাদরের নীচে।

আমি বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে তার দিকে তাকালাম। আমার কুঁই কুঁই কান্না থেমে গেল। মেয়েটি চাদরের নীচ থেকে হাত বের করে আমাকে আদর করল। তারপর আমার পাশে শুয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে তার কোলে টেনে নিল আমাকে। আমার খুব ভাল্লাগছিল। মেয়েটির আদর খেতে খেতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

বুকে হঠাৎ সুইয়ের মত তীক্ষ্ণ কিছুর খোঁচা খেয়ে চিৎকার করে জেগে গেলাম। মেয়েটি দারুণ চমকে উঠল। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আলগোছে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। মনে হলো খাটের নীচে লুকিয়ে পড়েছে।

জীবনে এই প্রথম ভয় পেলাম আমি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিলাম। নার্স, নার্সারি-মেইড, হাউসকীপার সবাই আমার হাউমাউ শুনে ছুটে এল। কী ঘটেছে বললাম আমি তাদেরকে। তারা আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলল কিছু হয়নি। আমি নাকি চোখে ভুল দেখেছি ইত্যাদি। তবে ছোট হলেও তাদের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ ঠিকই বুঝতে পারছিলাম আমি। তারা আমার খাটের নীচে উঁকি দিল। ঘরের চারপাশ আতিপাতি করে খুঁজল, উঁকি দিয়ে দেখল টেবিলের নীচে, কাবার্ডের পাল্লা খুলল। হাউসকীপার নার্সকে ফিসফিস করে বলল, 'বিছানার ওই জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখ। কেমন নিচু হয়ে আছে। মনে হচ্ছে

কেউ শুয়েছিল। কারণ জায়গাটা এখনও গরম।'

মনে আছে নার্সারি-মেইড আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। বুকে ব্যথা লাগছে বলতে ওরা তিনজনই আমার বুক পরীক্ষা করে দেখল। তবে কোন দাগ বা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না বলল।

হাউসকীপার এবং অন্য দুই ভৃত্য, ওরা নার্সারির দায়িত্বে ছিল, সারা রাত আমার ঘরে জেগে রইল। এবং সেদিন থেকে একজন চাকর সারাক্ষণ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখত। এরকম পাহারা চলেছে আমার চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত।

এ ঘটনা আমাকে দীর্ঘদিনের জন্য নার্ভাস করে রাখে। এক বয়স্ক ডাক্তার ডাকা হয়। মনে আছে লোকটির মুখমণ্ডল ছিল লম্বাটে, গোমড়া, জলবসন্তের দাগভরা। মাথায় চেস্টনাট রঙের পরচুলা। তিনি প্রতি দুইদিন পরপর এসে আমাকে ওষুধ দিতেন। আর ওষুধ খেতে আমার মোটেই ভাল লাগত না।

ওই অশরীরীকে দেখার পর থেকে আমার দিন কাটত আতংকে। আমি এমনকী দিনের বেলাতেও একা থাকতে ভয় পেতাম।

মনে পড়ে বাবা আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেন। হাসিমুখে আমার সঙ্গে কথা বলতেন। নার্সকে আমার শরীরের সুস্থতা নিয়ে নানান প্রশ্ন করতেন এবং তার দু'একটি জবাব শুনে হো হো করে হাসতেন। বাবা আমার কাঁধ চাপড়ে দিতেন, চুমু খেতেন গালে, বলতেন ভয় পাবার কিছু নেই। আমি স্রেফ স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বপ্ন মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

তবে বাবার সান্ত্বনাবাণী খুব একটা কাজে লাগেনি। কারণ আমি জানতাম ওই অদ্ভুত মহিলা কোন স্বপ্ন ছিল না। ফলে আমি সারাক্ষণই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম।

নার্স-মেইড বলেছিল সেই রাতে সে নাকি আমার ঘরে

এসেছিল এবং আমার পাশে শুয়ে পড়ে। আধা ঘুমন্ত অবস্থায় আমি নাকি তার চেহারা ঠিকমত চিনতে পারিনি। তবে নার্সের ব্যাখ্যা আমাকে খুব একটা সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

মনে পড়ছে সেই দিন এক বৃদ্ধ এসেছিলেন আমার ঘরে নার্স এবং হাউসকীপারের সঙ্গে। মানুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে, পরনে কালো আলখেল্লা। তিনি নার্স এবং হাউসকীপারের সঙ্গে খানিক কথা বলেছিলেন। আমার সঙ্গে অত্যন্ত সদাশয় আচরণ করেছিলেন। বলেছিলেন তাঁরা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে আমার হাত জড়ো করে তিনি প্রার্থনা শুরু করেন। তিনি আমাকে বলতে বলেন, 'প্রভু, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা শোনো, যিশুর দোহাই।' আমি এ প্রার্থনা বহুবার নিজে নিজে করেছি। আমার নার্স আমাকে প্রার্থনার সময় এ কথাগুলো বলতে বলত।

পক্বকেশ সেই বৃদ্ধটির সদয় মুখখানা এখনও পরিষ্কার মনে আছে আমার, পরনে কালো আলখেল্লা, বাদামী রঙের ঘরটিতে, তিনশো বছরের প্রাচীন আসবাবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ঘুলঘুলি দিয়ে অল্প আলো আসছিল। তিনি হাঁটু মুড়ে বসে, সঙ্গে তিন মহিলা, প্রবল আবেগমথিত কণ্ঠে, কাঁপাকাঁপা গলায় জোরে জোরে প্রার্থনা শ্লোক আউড়ে চলছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছেন তিনি। আমি আমার জীবনের অনেক ঘটনাই পরবর্তীতে ভুলে গেছি তবে এইমাত্র যে দৃশ্যটির বর্ণনা দিলাম, তার কথা কখনও বিস্মৃত হইনি, ছবির মত পরিষ্কার ফুটে আছে মনে।

দুই

এখন আমি এমন আশ্চর্য এক ঘটনার কথা বলব, বিশ্বাস করতে হলে আমার সততার ওপর আপনাদের আস্থা রাখতে হবে। ঘটনাটি শুধু সত্যিই নয়, এর প্রত্যক্ষদর্শী আমি স্বয়ং।

সেটি ছিল গ্রীষ্মের এক মনোরম সন্ধ্যা। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে সামনের বনে একটু বেড়াতে যেতে বললেন। বলতে ভুলে গেছি প্রাসাদদুর্গের সামনে ভারি সুন্দর বৃক্ষশোভিত একটি বীথি ছিল যেখানে বাবা আমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন।

'জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ বোধকরি শীঘ্রি আসতে পারবেন না,' হাঁটতে হাঁটতে বললেন বাবা।

জেনারেল মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। আগামীকালই তাঁর আসার কথা। সঙ্গে তাঁর অতিথি মাদমোয়াজেল রাইনফেল্টও আসবে। তাকে আমি কখনও দেখিনি তবে শুনেছি বয়সে সে তরুণী এবং খুব হাসিখুশি স্বভাবের একটি মেয়ে। আমি ওদের আসার অপেক্ষাতেই দিন গুণছিলাম।

'তা হলে কবে আসতে পারবেন উনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শরতের আগে আসতে পারবেন বলে মনে হয় না। সে তো দুই মাসের আগে নয়।' জবাব দিলেন বাবা। 'তবে তোমার সঙ্গে মাদমোয়াজেল রাইনফেল্টের পরিচয় না হয়ে ভালই হয়েছে।'

'কেন?' শুনে আমি একই সঙ্গে মর্মাহত এবং বিস্মিত।

'কারণ বেচারী মেয়েটি মারা গেছে।' জানালেন বাবা। 'তোমাকে খবরটা দিতে ভুলে গেছি। আজ বিকেলেই জেনারেলের চিঠি পাই আমি। অবশ্য তুমি তখন ঘরেও ছিলে না।'

শুনে আমি ভয়ানক শকড হলাম। ছয়/সাত সপ্তাহ আগে জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ অবশ্য এক চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর ভাইঝির শরীর ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু অবস্থা যে এত খারাপ ছিল তা ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।

'এই যে জেনারেলের চিঠি,' বাবা চিঠিটি আমার হাতে দিলেন। 'উনি নিশ্চয় দারুণ শোকার্ত অবস্থায় আছেন। কারণ পড়ে মনে হচ্ছিল এটি সুস্থ মস্তিষ্কে লেখা কোন চিঠি নয়।'

আমরা এক সারি লেবু গাছের নীচে একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসলাম। আরণ্যক দিগন্তের পেছনে তার সকল বিষণ্ন সৌন্দর্য নিয়ে ডুব দিচ্ছে সূর্য। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীটি, যেটি পুরানো সেতুর নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নানা গাছপালার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে, তার বুকে সূর্যের আবির মাখানো। নদীর জল আমাদের পা প্রায় ছুঁইছুঁই করছে। জেনারেলের চিঠিটি অসাধারণ। তবে তাতে রয়েছে প্রবল আক্রোশ, কোথাও কোথাও বক্তব্য স্ব-বিরোধী বলেও মনে হলো। তাই চিঠিটি আমি দুইবার পড়লাম। দ্বিতীয়বারে বাবাকে জোরে জোরে পড়ে শোনালাম। তবু কয়েকটি জায়গা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল, মনে হলো প্রচণ্ড শোকে তাঁর মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে।

চিঠিতে লেখা, 'আমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মেয়েটিকে হারিয়েছি। বার্থার অসুস্থতার কারণে গত কয়েকদিন তোমাকে আমি চিঠি লিখতে পারিনি। ওর অসুস্থতার শেষ ক'টা দিনের আগে বুঝতেই পারিনি ও কীরকম বিপদের মধ্যে রয়েছে। আমি

ওকে হারিয়েছি এবং এখন সবকিছু জানতেও পেরেছি। তবে বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমার নিষ্পাপ মেয়েটি তার মৃত্যুর কারণ জানতে পারেনি। ভেবেছিলাম আমার বার্থার জন্য এক হাসিখুশি সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়েছি। হা, ঈশ্বর! কী বোকামোটাই না করেছি! যে শয়তান আমাদের আতিথেয়তার অবমাননা করেছে সে-ই আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। জীবনের বাকি দিনগুলো সেই দানবকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। শুনেছি এ কাজটি আমার দ্বারা সম্ভব হতেও পারে। যদিও এখন পর্যন্ত আমি আশার কোন আলো দেখতে পাইনি। আমি অভিশাপ দিই আমার অতিমাত্রার অবিশ্বাস, আমার অন্ধত্ব এবং আমার একগুঁয়েমিকে। আমি এ মুহূর্তে গুছিয়ে কিছু লিখতে পারছি না কিংবা বলতেও পারছি না। কারণ এখন আমার মন বড্ড বিক্ষিপ্ত। একটু সামলে ওঠার পরে আমি অনুসন্ধানে নেমে পড়ব। এজন্য ভিয়েনাও যেতে হতে পারে। আসছে শরতে, আর মাস দুই পরে, যদি বেঁচে থাকি, তোমাদের সঙ্গে আশা করি দেখা হবে। তখন আমি সবকথা বলব যা এ চিঠিতে লিখতে পারলাম না। বিদায়, আমার জন্য প্রার্থনা কোরো, বন্ধু।'

অদ্ভুত চিঠির এখানেই শেষ। বার্থা রাইনফেল্টকে আমি কোনদিন দেখিনি তবু তার জন্য আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তার মৃত্যুসংবাদ আমাকে যেমন চমকে দিয়েছে, হতাশও করেছে তেমন।

সূর্য এখন পশ্চিমাকাশে ডুব দিয়েছে। আমি বাবাকে জেনারেলের চিঠিটি ফিরিয়ে দিলাম। তারপর দু'জনে মিলে আবার হাঁটতে লাগলাম।

মনোরম একটি সন্ধ্যা। আমি হাঁটতে হাঁটতে চিঠিটির কথা ভাবছিলাম। জেনারেলের কথাগুলোর মানে কী হতে পারে চিন্তা করছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক হেঁটে আমরা দুর্গের সামনের রাস্তায় চলে

এলাম। চাঁদ উঠেছে আকাশে। ঝলমলে কিরণ ছড়াচ্ছে। ড্রব্রিজে দেখা হয়ে গেল মাদাম পেরোডন এবং মাদমোয়াজেল ডি লাফন্টেইনের সঙ্গে। চাঁদের আলো উপভোগ করতে তারা মাথায় বনেট না চাপিয়েই চলে এসেছে।

তারা দু'জনে বকবক করছে। আমরা ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে অপূর্ব প্রকৃতি দেখছি।

আমাদের সামনে বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গাটা। এইমাত্র ওখান থেকে হেঁটে এসেছি আমরা। আমাদের বামদিকে সরু রাস্তাটি বড় বড় গাছের নীচ দিয়ে এঁকেবেঁকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ডানদিকে একই রাস্তা ক্রস করেছে ঢাল এবং ছবির মত ব্রিজ, তার কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি টাওয়ার। ব্রিজ পেরিয়ে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে জমিন, জায়গাটি গাছপালা দিয়ে ঢাকা, ছায়ার মধ্যে ধূসর রঙের আইভিলতায় ঢাকা পাথর চোখে পড়ে।

তৃণভূমি এবং নিচু জমিনের ওপর ভেসে আছে ধোঁয়ার মত কুয়াশার পাতলা একটি পর্দা, দূরের জিনিসগুলোকে মনে হচ্ছে কুয়াশার স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনে ঢাকা; নদীর বুকে ঝিলমিল করছে চাঁদের আলো।

এরচেয়ে চমৎকার, কমনীয় দৃশ্য কী হতে পারে? আমি মাত্রই একটি দুঃখজনক খবর শুনেছি কিন্তু প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য উপভোগে সেই শোকাবহ সংবাদ কোন বাধার সৃষ্টি করল না।

আমার বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপরূপ এই নিসর্গ উপভোগ করছেন। আমাদের দুই গভর্নেস খানিক পেছনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় সমানে বকবক করেই যাচ্ছিল।

মাদাম পেরোডন মোটাসোটা, মধ্যবয়স্কা, বেশ রোমান্টিক স্বভাবের। কথা বলে কাব্যিক ঢঙে। মাদমোয়াজেল ডি লাফন্টেইন জাতিতে জার্মান। তারা দু'জনেই পূর্ণিমা রাতের এই পাগল করা

সৌন্দর্যে পাগল হওয়ার জোগাড়। তারা এই চাঁদনী রাতের রূপ নিয়েই মুগ্ধ চিত্তে গল্প করছিল।

বাবা শেক্সপীয়র থেকে কয়েক লাইন আবৃত্তি করলেন:

In truth I know not why I am so sad:
It wearies me; you say it wearied you;
But how I got it came by it.

'বাকিটা ভুলে গেছি,' বললেন তিনি। 'আসলে বেচারা জেনারেলের চিঠিটি আমার মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।'

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘোড়ার গাড়ির শব্দে আমাদের মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এবং গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শুনতে পাচ্ছি।

ব্রিজের দিকের উঁচু জমিন থেকে শব্দটা আসছে। একটু পরেই শব্দের উৎস দেখা গেল। প্রথমে দুই ঘোড়সওয়ার পার হলো সেতু, তারপর চার ঘোড়ায় টানা একটি ক্যারিজ এল, এটির পেছনে আরও দু'জন অশ্বারোহী।

দেখে মনে হলো দলবল নিয়ে কেউ ঘুরতে বেরিয়েছে। তবে একটু পরেই মারাত্মক একটি ঘটনা ঘটে গেল। ঘোড়ার গাড়িটি খাড়া ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি পার হয়েছে, সামনে থাকা দুটি ঘোড়ার একটি হঠাৎ আতংকিত হয়ে উঠল, তার ভয় সংক্রামিত হলো বাকিগুলোর মধ্যে। পরক্ষণে দেখি সবগুলো ঘোড়া বুনো গতিতে একসঙ্গে দৌড় শুরু করে দিয়েছে। ঘোড়ার গাড়িটি সামনের দুই ঘোড়সওয়ারের মাঝ দিয়ে বজ্রপাতের শব্দ তুলে, ঝড়ের গতিতে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

এ দৃশ্যের উত্তেজনা আরও অসহনীয় হয়ে উঠল যখন ঘোড়ার গাড়ির জানালা দিয়ে একটি নারী কণ্ঠের প্রলম্বিত আর্তনাদ ভেসে এল।

আমরা সবাই কৌতূহল এবং আতংক নিয়ে এগিয়ে গেলাম

সামনে।

রুদ্ধশ্বাস রহস্যের অচিরেই অবসান হলো। প্রাসাদের ড্রব্রিজে পৌঁছাবার আগে, যে রাস্তা ধরে ওরা ছুটে আসছিল, তার একধারে ঝাঁকড়া একটি লেবু গাছ এবং অন্যপাশে প্রাচীন একটি পাথরের ক্রুশ দেখে উন্মত্ত বেগে ছুটে আসা ঘোড়ার দল হঠাৎ গতি পরিবর্তন করল, চট করে একপাশে সরে যেতে মাটিতে দাঁত বের করে থাকা গাছের শেকড়ের গায়ে গাড়িটির চাকা বেদম ঘষা খেল।

আমি জানি কী ঘটতে চলেছে। ও দৃশ্য আমি দেখতে পারব না বলে সভয়ে চোখ বুজে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আমার গভর্নেসরা আর্তচিৎকার করে উঠল।

কৌতূহলে চোখ মেলে চাইলাম। যা দেখলাম তা এক কথায় মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। মাটিতে পড়ে আছে দুটো ঘোড়া, তার পাশে চাকা উঁচিয়ে চিৎ হয়ে রয়েছে ক্যারিজটি। লোকগুলো যাত্রী উদ্ধারে ব্যস্ত। অত্যন্ত অভিজাত চেহারার এক ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, হাতে রুমাল। মাঝে মাঝেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। এক তরুণীকে ক্যারিজের দরজা দিয়ে বের করে আনা হলো। নিথর দেহ দেখে মনে হলো প্রাণের চিহ্ন নেই। আমার বাবা ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলার কাছে চলে গেছেন তাঁকে সাহায্য করতে। মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলছেন। কিন্তু মনে হলো না ভদ্রমহিলা তাঁর কথা শুনছেন বা তাঁর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তরুণীটির দিকে। তাকে পাঁজাকোলা করে নদীর তীরে নিয়ে আসা হলো।

আমি কদম বাড়ালাম। নাহ্, মেয়েটি মারা যায়নি। অজ্ঞান হয়ে আছে। বাবার খানিকটা ডাক্তারী বিদ্যা জানা ছিল। তিনি তরুণীর নাড়ি টিপে পরীক্ষা করলেন। তারপর ভদ্রমহিলাকে, যিনি মেয়েটির মা, তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন তাঁর মেয়ের নাড়ির

স্পন্দন দুর্বল হলেও তা টের পাওয়া যাচ্ছে। মহিলা দু'হাত জড়ো করে ওপরের দিকে তাকালেন। যেন সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। পরমুহূর্তেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বয়সের দিক থেকে তাঁকে সুন্দরীই বলা যায় এবং এককালে যে বেশ রূপসী ছিলেন তাও আন্দাজ করা যায়। দীর্ঘাঙ্গিনী তবে রোগাটে নন, গায়ে কালো মখমলের পোশাক, একটু ফ্যাকাসে চেহারা হলেও অবয়বে ফুটে আছে ঔদ্ধত্য, যেন আদেশ করেই তিনি অভ্যস্ত।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে তিনি দুইহাত শক্ত করে চেপে রেখে বললেন, 'আমার জন্মই কি সবসময় বিপদে পড়ার জন্য? জীবন-মরণ সমস্যা—এমন একটি ব্যাপারে আমি চলেছি, তাতে এক ঘণ্টা সময় নষ্ট মানে মস্ত সর্বনাশ হওয়া। জানি না আমার মেয়েটার সুস্থ হতে কতক্ষণ লাগবে। কিন্তু ওকে রেখেই আমার চলে যেতে হবে কারণ আমি আর একটুও দেরি করতে পারব না। স্যর, কাছের গ্রামটা কতদূরে বলতে পারবেন? আমি ওখানে আমার মেয়েকে রেখে যাব। তবে তিন মাসের আগে ফিরতে পারব না বলে ওর সঙ্গে এরমধ্যে আমার আর দেখা হওয়ার কোন সুযোগ নেই।'

আমি বাবার কোট টেনে ধরে তাঁর কানে ফিসফিস করে বললাম, 'বাবা! বলো না উনি তাঁর মেয়েকে যেন আমাদের কাছে রেখে যান। তা হলে খুব ভাল হবে। বলো না, বাবা!'

বাবা ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'ম্যাডাম, ইচ্ছে করলে আপনার মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে যেতে পারেন। ওর এখানে যত্ন-আত্তির কোন অভাব হবে না। আমাদের গভর্নেস মাদাম পেরোডন ওর সেবা করবে। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার মেয়ে আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে থাকবে। ওর কোন সমস্যাই হবে না।'

'তা হয় না, স্যর। আমি আমার মেয়েকে রেখে গেলে আপনাদের ওপর জুলুম করা হবে।' বললেন ভদ্রমহিলা।

'বরং তার উল্টোটা হবে,' বললেন বাবা। 'আমার মেয়ে সম্প্রতি একটি দুঃসংবাদ শুনে ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছে। আপনি আপনার মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে গেলে সে খানিকটা সান্ত্বনা পাবে, তার মনটা খুশি হবে। তা ছাড়া কাছের গ্রামটি এখান থেকে অনেক দূরে। সেখানে এমন কোন ভাল সরাইখানাও নেই যে আপনার মেয়েকে নিশ্চিন্ত মনে রেখে যেতে পারবেন। আপনি বললেন যে এক্ষুণি আপনাকে রওনা হতে হবে, তা হলে মেয়েটিকে আমাদের কাছে রেখে গেলেই ভাল করবেন। এরকম আশ্রয় আর কোথাও পাবেন না।'

এদিকে গাড়িটিকে আবার সোজা করে তোলা হয়েছে, ঘোড়াগুলোকেও জুতে দেয়া হয়েছে গাড়িতে।

মহিলা তাঁর মেয়ের দিকে এক ঝলক তাকালেন। তবে খুব একটা স্নেহমিশ্রিত দৃষ্টি তাকে বলা যাবে না। বাবাকে কী যেন ইশারা করলেন। তাঁকে নিয়ে কয়েক কদম সামনে গেলেন। স্থির, কঠিন ভঙ্গিতে কী বললেন শোনা গেল না। তবে তাঁর এ আচরণের সঙ্গে খানিক আগের ব্যবহারের কোন সঙ্গতি নেই।

মহিলার আচরণের এ পরিবর্তন বাবা লক্ষ করেছেন বলে মনে হলো না। তবে তিনি বাবাকে প্রায় কানে কানে কী বলেছেন জানতে কৌতূহলে মরে যাচ্ছিলাম আমি।

দুই-তিন মিনিট বাবার সঙ্গে কথা বললেন ভদ্রমহিলা। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। চলে এলেন মেয়ের কাছে। মাদাম পেরোডন মেয়েটির মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। মহিলা হাঁটু গেড়ে মেয়ের পাশে বসলেন, কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। মাদামের ধারণা তিনি কোন প্রার্থনা শ্লোক উচ্চারণ করেছেন। তারপর চট করে মেয়েটিকে চুমু খেয়ে ফিরে

গেলেন ক্যারিজের কাছে। উঠে পড়লেন গাড়িতে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ফুটম্যানরা পেছনের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল। ভদ্রমহিলার রক্ষীরা তাদের ঘোড়ায় উঠে বসল। গাড়োয়ানের হাতে ঝলসে উঠল চাবুক। পরক্ষণে ভয়ানক গতিতে ছুটে চলল ঘোড়ার গাড়ি। যেভাবে ওরা এসেছিল, সেভাবেই চলতে লাগল–দুই অশ্বারোহী আগে আগে, বাকি দু'জন পেছন পেছন।

তিন

দেখতে দেখতে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেল ঘোড়ার গাড়ি এবং ঘোড়সওয়ারদের দল। নীরব রাতের বাতাসে মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুর এবং চাকার শব্দ।

মাটিতে শুয়ে থাকা মেয়েটি চোখ না মেলে চাইলে বোঝার জো ছিল না কিছুক্ষণ আগে এখানে একটি হুলস্থূল কাণ্ড ঘটে গেছে। তবে মেয়েটির মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল সে। মাথা তুলল সে, তাকাল ডানে-বামে, তারপর ভারি মিষ্টি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'মা কোথায়?'

মাদাম পেরোডন মৃদু গলায় তার প্রশ্নের জবাব দিল, সঙ্গে যোগ করল কিছু সান্ত্বনাসূচক বাক্য।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আমি? এটা কোন্ জায়গা? ক্যারিজটাই বা গেল কোথায়? আর মাটসকা, কোথায় সে?'

তার এতগুলো প্রশ্নের এক-এক করে জবাব দিল মাদাম পেরোডন। দুর্ঘটনার কথা আস্তে আস্তে মনে পড়ল মেয়েটির। শুনে খুশি হলো ক্যারিজের কেউ আহত হয়নি। তার মা তাকে এখানে রেখে চলে গেছেন এবং তিন মাসের মধ্যে তিনি ফিরতে পারবেন না শুনে সে কাঁদতে লাগল।

আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, বাধা দিল মাদমোয়াজেল ডি লাফন্টেইন। আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'যেয়ো না। এমন কিছু বলা ঠিক হবে না যাতে ওর উত্তেজনা বেড়ে যায়। এখন সামান্য উত্তেজনাও ওর ক্ষতি করতে পারে।'

ও বিছানায় শুয়ে যখন বিশ্রাম নেবে তখন আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব, ঠিক করলাম আমি।

বাবা এক চাকরকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি থাকেন দুই লীগ দূরে। মেয়েটির জন্য একটি ঘর ঝাড়পোঁছ করা হলো।

মেয়েটি আস্তে আস্তে সিধে হলো, মাদামের গায়ে হেলান দিয়ে ধীর পায়ে ড্রব্রিজ পার হয়ে এগোল প্রাসাদ গেটে।

হলরুমে একজন চাকর অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। সে মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে গেল।

আমরা যে ঘরটিতে সাধারণত বসি সেটি ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ঘরে চারটে জানালা। জানালা দিয়ে পরিখা এবং ড্রব্রিজ দেখা যায়।

ঘরের আসবাবপত্র সব কারুকাজ করা ওক কাঠের তৈরি। আছে বড় কেবিনেট, চেয়ারের গায়ে লাল মখমলের কুশন পরানো। দেয়াল ঢেকে আছে ট্যাপেস্ট্রিতে, সে সঙ্গে প্রমাণ সাইজের বড় বড় ছবি। কোনটি শিকারের, কোনটি বিশেষ কোন উৎসবের। খুব বেশি আরামদায়ক ঘর না হলেও এখানে বসে

আমরা চা পান করি।

আমরা এ ঘরে এসে বসলাম। মোম জ্বলছে। আমরা সন্ধ্যার ঘটনাটি নিয়ে কথা বলতে লাগলাম।

মাদাম পেরোডন এবং মাদমোয়াজেল ডি লাফন্টেইনও এসেছে চা খেতে। তরুণী মেয়েটি বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। এক চাকরের জিম্মায় তাকে রেখে আসা হয়েছে।

'আমাদের অতিথিটিকে কেমন লাগল?' মাদাম ঘরে ঢোকামাত্র প্রশ্ন করলাম আমি।

'খুব ভাল,' জবাব দিল মাদাম। 'অমন সুন্দর মেয়ে জীবনে দেখিনি। বয়স তো তোমারই মত।'

'সত্যি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি,' সায় দিল মাদমোয়াজেল।

'আর গলার স্বরটিও কী মিষ্টি!' যোগ করল মাদাম পেরোডন।

'আচ্ছা, তোমরা ক্যারিজে এক মহিলাকে লক্ষ করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল মাদমোয়াজেল। 'গাড়ি থেকে সে নামেনি তবে গাড়ি চলার সময় জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল।'

না, আমরা কেউ তাকে লক্ষ করিনি।

মাদমোয়াজেল তখন এক কুৎসিত চেহারার কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার কথা বলল। মাথায় রঙিন পাগড়ি জড়ানো ছিল। গাড়ির জানালা দিয়ে বারবার সে তাকাচ্ছিল, শয়তানী হাসি ছিল তার ঠোঁটে, জ্বলজ্বল করছিল ক্রূর দুই চোখ, বড় বড় সাদা মণি যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। দাঁতে দাঁত ঘষছিল সে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে।

'আর চাকরগুলোরও কেমন বদখত চেহারা ছিল লক্ষ করোনি?' জিজ্ঞেস করল মাদমোয়াজেল।

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকালেন বাবা। তিনি এইমাত্র ঘরে ঢুকেছেন। 'বিশ্রী দেখতে সবক'জন। জঙ্গলের মধ্যে বেচারী মহিলার ওপর ওরা না ডাকাতি করে বসে। দেখে মনে হলো

বাজে সব লোকজন।'

'গোমড়া, কালো কালো মুখ,' মন্তব্য করল মাদাম। 'ওরা কে জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার। তবে মেয়েটি সুস্থ হলে হয়তো কাল ওর কাছ থেকে সব জানা যাবে।'

'মনে হয় না ওই মেয়ে কিছু বলবে,' রহস্যময় হেসে বললেন বাবা। তিনি যেভাবে মাথা নাড়লেন তাতে মনে হলো এ বিষয়ে তিনি আরও কিছু জানেন কিন্তু প্রকাশ করছেন না।

তাঁর এ কথায় আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বাবার সঙ্গে ওই ভদ্রমহিলার কী কথা হয়েছে?

আমরা একা হওয়ামাত্র বাবাকে চেপে ধরলাম। মহিলা তাঁকে কী বলেছেন আমার জানতেই হবে। অবশ্য বেশি চাপাচাপি করতে হলো না। বাবা বললেন, 'তোমাকে বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। ভদ্রমহিলা চাননি তাঁর মেয়েকে এখানে রেখে আমাদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলেন। বলছিলেন তাঁর মেয়ের শরীর ভাল নয় এবং সে খুব নার্ভাসও হয়ে পড়েছে। বললেন তিনি নাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ আর গোপনীয় এক কাজে অনেক দূরের দেশে যাচ্ছেন। তিন মাস পরে ফিরে এসে মেয়েকে নিয়ে যাবেন। তবে তাঁর মেয়ে নাকি তাদের পরিচয় প্রকাশ করবে না, বলবে না তারা কারা, কোত্থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে।' বাবা একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলেন, 'মহিলা বিশুদ্ধ ফরাসীতে কথাগুলো বলছিলেন। কথা বলার সময় এক মুহূর্তের জন্যও আমার ওপর থেকে তাঁর নজর সরে যায়নি। তুমি তো দেখলেই কেমন তাড়াহুড়ো করে তিনি চলে গেলেন। আশা করি তাঁর মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে কোন ভুল করিনি।'

আমার অবশ্য খুশি লাগছিল। মেয়েটিকে দেখতে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য উতলা হয়ে উঠছিলাম আমি। শুধু ডাক্তারের অনুমতি পেলেই হলো। আপনারা যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা

বুঝতে পারবেন না আমাদের মত নির্জনবাসীদের কাছে নতুন বন্ধুর গুরুত্ব কতখানি।

ডাক্তার এলেন রাত একটার দিকে। তখনও আমি জেগে আছি। রোগিণীকে দেখে বললেন আর কোন ভয় নেই। সে এখন বিছানায় উঠে বসতে পারে, নাড়ির গতিও ঠিক আছে, মনে হচ্ছে বিপদ কাটিয়ে উঠেছে। ক্যারিজ উল্টে গেলেও তার শরীরের কোথাও ছড়েটড়ে যায়নি, শুধু তাৎক্ষণিক শকের কারণে সে কিছুক্ষণের জন্য হতচকিত হয়ে পড়েছিল। মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা করার অনুমতি মিলল। চাকরকে দিয়ে খবর পাঠালাম আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার কোন আপত্তি আছে কিনা।

চাকর একটু পরেই ফিরে এসে বলল আমি দেখা করতে পারি। কোন সমস্যা নেই।

শুনে আমি তক্ষুনি গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে।

আমাদের অতিথিকে প্রাসাদের সেরা আরামদায়ক কক্ষগুলোর একটিতে রাখা হয়েছে। খুবই সুন্দর এবং সাজানো-গোছানো ঘর। বিছানার ধারে মোমবাতি জ্বলছে। মেয়েটিকে দেখলাম বসে আছে। ছিপছিপে শরীর, গায়ে নরম সিল্কের ড্রেসিং গাউন, তাতে ফুলের ছবি। এ পোশাকটি ওর মা ওর জন্য রেখে গেছেন। তখন সে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল।

আমি মেয়েটির বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাকে ডাকতে গেছি, দারুণ চমকে গেলাম। অজান্তেই পিছিয়ে এলাম এক কদম।

এ তো সেই মুখ যাকে আমি শৈশবে রাতের বেলা আমার বিছানার পাশে দেখেছিলাম। এ সেই চেহারা যার ভয়াল স্মৃতি আমাকে বছরের পর বছর দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছে, আমাকে আতংকগ্রস্ত করে রেখেছে। অথচ কেউ জানত না কীসের ভয় আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মুখখানা ভারি সুন্দর তবে সেই প্রথম দিনকার মতই বিষণ্নতার ছাপ ফুটে আছে চেহারায়।

আমাকে দেখে মেয়েটি হাসল, যেন চিনতে পেরেছে। পুরো এক মিনিট নীরবতা বজায় রইল দু'জনের মাঝে। তারপর সে কথা বলে উঠল।

'কী আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বারো বছর আগে তোমার মুখটি আমি স্বপ্নে দেখেছি। তারপর থেকে এই চেহারা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

'আমাকেও!' বিস্ময় হজম করে বললাম আমি। 'বারো বছর আগে আমিও তোমাকে দেখেছিলাম। সেটা স্বপ্ন হতে পারে কিংবা বাস্তব। তবে তুমিই যে সেই মেয়েটি ছিলে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তোমার চেহারা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি।'

মেয়েটির হাসি কোমল হয়ে এল। তার ভেতরে অদ্ভুত যে ব্যাপারটি লক্ষ করেছিলাম তা এ হাসিতেই যেন দূর হয়ে গেল। হাসলে মেয়েটির গালে টোল পড়ে লক্ষ করলাম আমি। সে সঙ্গে চেহারায় ফুটে ওঠে বুদ্ধিমত্তার ছাপ।

আমার অস্বস্তি দূর হলো। তাকে স্বাগত জানালাম। বললাম তার আকস্মিক আবির্ভাবে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

কথা বলার সময় আমি মেয়েটির হাত চেপে ধরে বসে রইলাম। একাকী থাকি বলে প্রকৃতিগতভাবেই আমি একটু লাজুক প্রকৃতির। তবে মেয়েটির উপস্থিতিতে আমার লজ্জা লজ্জা ভাবটি শুধু দূরই হলো না, আমি অনেকটা সাহসীও হয়ে উঠলাম। সে আমার হাতে চাপ দিল, গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, জ্বলজ্বল করছে চোখ। আবার হাসল সে এবং গালে রাঙা ছোপ পড়ল।

মেয়েটি আমাকে বলল, 'আমার স্বপ্নের কথা তোমাকে বলি শোনো। তখন আমার বয়স ছয়। কী একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ

জেগে উঠি আমি। একটা ঘরে একটি খাটের নীচে নিজেকে দেখতে পাই। ঘরটি আমার নার্সারি রুমের মত নয়। কালো কাঠ দিয়ে তৈরি একটি কামরা। তাতে আলমারি আছে, আছে পালঙ্ক, চেয়ার, বেঞ্চি ইত্যাদি। বিছানাগুলো খালি, ঘরে আমি ছাড়া কেউ নেই। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনতে পাই আমি। খাটের নীচ থেকে মুখ বের করতেই দেখতে পাই তোমাকে–হ্যাঁ, অবিকল তোমার মত একটি মেয়ে। এই যে তোমাকে এখন দেখছি–খুব সুন্দরী এক তরুণী, মাথায় সোনালি চুল, ডাগর নীল চোখ, আর ঠোঁট জোড়া–একদম তোমার ঠোঁটের মত। তোমাকে দেখে আমি যেন কেমন হয়ে যাই। আমি বিছানার নীচে এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম। আর সেই মেয়েটি ছিল খাটের ওপর। আমি খাটে উঠে পড়ি এবং সেই মেয়েটি মানে তোমাকে আমি জড়িয়ে ধরি। তারপর বোধহয় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা চিৎকার শুনে জেগে উঠি। দেখি তুমি বিছানায় বসে চিৎকার করছ। তোমার চিৎকারে আমি ভয় পেয়ে যাই, চট করে নেমে পড়ি বিছানা থেকে, তারপর মনে হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি আবার আমার বাড়িতে, নিজের নার্সারি রুমে। তারপর থেকে তোমার মুখখানা আমি আর ভুলতে পারিনি। আমি নিশ্চিত আমি সে রাতে তোমাকেই দেখেছিলাম।'

এরপরে আমার স্বপ্নের কথা বলার পালা। আমি তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব বললাম। আমার কথা শুনে ও খুব অবাক হয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, 'জানি না কার অভিজ্ঞতাটি বেশি ভয়ঙ্কর। সে যাকগে, কি জানো, তোমার প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছি আমি। জানি না আমার প্রতি তোমার এরকম কোন অনুভূতি হচ্ছে কিনা।' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটি। তার আশ্চর্য সুন্দর কাজল কালো চোখ দুটি আমার চোখে রেখে অদ্ভুত গলায় বলল, 'আমার না কোন বন্ধু নেই। তুমি

কি আমার বন্ধু হবে?’

সত্যি বলতে কি এই অপূর্ব রূপবতী তরুণীটির প্রতি কেন জানি না একটা দারুণ আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। তবে একই সঙ্গে কেমন যেন একটা বিকর্ষণবোধও ছিল। তবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাটানিতে শেষে আকর্ষণেরই জয় হলো। ও যেন আমাকে জয় করে নিল।

মেয়েটিকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া রাতও হয়ে গেছে অনেক। আমি এখন চলে যাওয়াই সমীচীন মনে করলাম। ‘ডাক্তারের নির্দেশ,’ ওকে বললাম আমি। ‘তোমার ঘরে সারাক্ষণ কারও পাহারার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের এক চাকরানি বাইরেই আছে। সে তোমার ঘরে শোবে।’

‘ধন্যবাদ। তবে কি জানো, কেউ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখলে আমার ঠিক ঘুম আসবে না। আমার কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। একটা কথা বলি কিছু মনে কোরো না—আমার আবার ডাকাতভীতি আছে। একবার আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। দুই চাকর খুন হয়ে যায়। তারপর থেকে আমি সবসময় দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে শুই। এটা একরকম অভ্যাসই হয়ে গেছে। আশা করি তুমি আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছ।’

সে আমাকে এক মুহূর্ত জড়িয়ে ধরে রইল। ফিসফিস করে বলল, ‘গুডনাইট, ডার্লিং, তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, তবু বিদায়। কাল সকালে, না না দুপুরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি চলে আসছি, টের পেলাম ওর চোখ আমাকে অনুসরণ করছে। আবার বিড়বিড় করল, ‘শুভরাত্রি, প্রিয় বান্ধবী।’

পরদিন আবার দু’জনে মিলিত হলাম। ওকে কাছে পেয়ে বেশ ভাল লাগছিল আমার। ওকে দিনের আলোয় যেন আরও বেশি

সুন্দর লাগছিল। এমন রূপসীকন্যা জীবনেও দেখিনি আমি। বলল সেও নাকি আমার মত সুন্দরী দ্বিতীয়টি দেখেনি। আমরা একে অন্যকে দেখে যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সে কথা মনে করে খিলখিল হাসিতে দু'জনেই ফেটে পড়লাম।

চার

মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে বলেছি আমি। তবে কিছু কিছু জিনিস আমার ভাল্লাগেনি।

মেয়েটির উচ্চতা মাঝারি। হালকাপাতলা গড়ন, ভারি লাবণ্যময়ী, চলাফেরায় কেমন একটু জড়তা আছে, তবে চলৎশক্তিহীন মানুষের মত অবশ্যই নয়। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, মুখখানা ছোট হলেও দেখতে অতি চমৎকার, বড় বড় কালো চোখ ঝকমক করছে। আর তার চুলের মত এত সুন্দর ঘন এবং লম্বা কেশ আমি কখনও দেখিনি। মখমলের মত মসৃণ এবং নরম, গাঢ় বাদামী রঙের সাথে স্বর্ণালী একটা আভাও রয়েছে। তার এই চুল নিয়ে খেলাচ্ছলে কত নাড়াচাড়া করেছি আমি। সে তার ঘরে চেয়ারে বসে থাকত, নিচু গলায় মিষ্টি স্বরে কথা বলত আর আমি তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতাম, বিনুনী করতাম। হা, ঈশ্বর, তখন যদি জানতাম!

বলেছি মেয়েটির কিছু ব্যাপার আমার ঠিক পছন্দ হতো না। ওর মনের জোরটাই প্রথম রাতে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

তবে সে নিজের সম্পর্কে কিংবা তার মা অথবা পরিবার নিয়ে কিছুই বলতে চাইত না। এ ব্যাপারটিই আমার ভাল লাগত না। আমি এত করে তার ব্যাপারে জানতে চাইতাম! আমাকে বললে তার কীইবা ক্ষতি হতো? আমার ওপর কি ওর বিশ্বাস নেই? আমি তো ওকে বারবার বলেছি ও যা কিছুই বলুক না কেন তা তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে কখনও ফাঁস করতে যাব না। মেয়েটির মধ্যে শীতল একটি ভাব আছে যা তার বয়সের সঙ্গে ঠিক যায় না।

অনেক চাপাচাপি করে যেটুকু তথ্য আমি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি তা হলো–তার নাম কারমিল্লা। সে অত্যন্ত প্রাচীন এবং বনেদী এক বংশের মেয়ে। এবং তার বাড়ি পশ্চিমের কোন এক জায়গায়। কারমিল্লা তার পরিবার সম্পর্কে কিছুতেই মুখ খুলতে রাজি নয়। সে কোথায় থাকে, দেশ কোথায় কোন কিছুই বলে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আচমকা কথাটা তুললেও বারবারই সে আমাকে এড়িয়ে গেছে।

সে আমাকে তার কোমল দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলত, 'প্রিয় বান্ধবী, আমি পরিচয় দিচ্ছি না বলে তোমার অভিমান হয়েছে জানি তবে সেজন্য আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না। উপায় নেই বলেই কিছু বলতে পারছি না। তুমি যদি কষ্ট পাও আমার হৃদয়ে দ্বিগুণ রক্তক্ষরণ হবে।' এসব বলে সে আমাকে আরও নিবিড় করে বুকে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় মুখ ভরিয়ে দিত।

তার এই উত্তেজনা এবং ভাষা ঠিক বুঝতে পারতাম না আমি। তবে তার এসব কথার মধ্যে একটা ঘুমপাড়ানির ভাব ছিল। আর তার রহস্যময় আচরণ ভাল না লাগলেও এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতাম। এ উত্তেজনার সঙ্গে আনন্দ মিশে থাকলেও ভয় এবং বিরক্তির মিশ্রণও ছিল।

আজ দশ বছর বাদে এসব কথা আমি লিখছি। যে ভয়ঙ্কর

অবস্থার মাঝ দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে তা লিখতে হাত কাঁপছে। যদিও প্রতিটি স্মৃতিই পরিষ্কার মনে আছে আমার।

আমার অদ্ভুত এবং সুন্দরী সঙ্গীটি মাঝে মাঝে আমার হাত ধরে আদর করত। চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। তার নিঃশ্বাস হয়ে উঠত ঘন। তার আদরের মধ্যে ছিল প্রেমিকসুলভ উন্মাদনা। আমার ভারি বিরক্ত লাগত। তবে তাকে এড়িয়ে যেতেও পারতাম না। আমাকে বুকে চেপে ধরে গালে ঘন ঘন চুমু খেতে খেতে ফিসফিস করত কারমিল্লা, প্রায় ফোঁপানির সুরে বলত, 'তুমি আমার। তুমি আমারই থাকবে, তুমি আর আমি এক অভিন্ন সত্তা।'

'তোমার সঙ্গে তো আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই,' বলতাম আমি। 'তা হলে এসব কথার মানে কী? হয়তো আমাকে দেখে তোমার কোন প্রেমিকের কথা মনে পড়ে যায়। আর এ ব্যাপারটি আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আমি তোমাকে চিনি না, জানি না। কিন্তু তুমি যখন আমার সঙ্গে এভাবে কথা বল আমি নিজেকেও ভুলে যাই।'

আমার কথা শুনে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, আমার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে যেত। ওর এরকম আচরণের কোন কারণ আমি খুঁজে পেতাম না। ওর মাথায় ছিট নেই তো? নাকি কোন পুরুষ, মহিলার ছদ্মবেশে এসেছে? এরকম গল্প পড়েছি বইতে। কিন্তু ওর মধ্যে তরুণীসুলভ ভাবভঙ্গিও প্রকাশ পায় এবং একটা অবসাদ যেন ওকে সবসময় ঘিরে থাকে যার সঙ্গে এই পুরুষালী আচরণ ঠিক খাপ খায় না।

কারমিল্লার কিছু অভ্যাস ছিল অস্বাভাবিক। আপনারা, যাঁরা শহুরে নারী, তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক মনে না-ও হতে পারে। আমরা গ্রামের মেয়ে বলে কারমিল্লার ঘুম থেকে অনেক দেরিতে ওঠার অভ্যাসটি ঠিক মেনে নিতে পারতাম না। বেলা একটার

আগে ওকে কখনোই নীচে আসতে দেখিনি। তারপর সে এক কাপ চকোলেট পান করে। আর কিছুই খায় না। তারপর আমরা দু'জনে ঘুরতে বেরোই, তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। কারণ অল্প হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে কারমিল্লা। তখন কোন গাছের তলায় পাতা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। তবে কথা বলায় তার উৎসাহের কমতি নেই। আর বুদ্ধিও অনেক প্রখর।

মাঝে মাঝে কারমিল্লা দু'এক মুহূর্তের জন্য তার বাড়ির কথা বলে। অদ্ভুত সব মানুষ এবং প্রথার গল্প বলে। এসব শুনে আমার মনে হয় ও যেখানে থাকে সেটি আমাদের এলাকার চেয়েও প্রত্যন্ত কোন অঞ্চল।

একদিন বিকেলে—আমরা একটি গাছের নীচে বসে আছি। দেখি একটি শবযাত্রা চলেছে। মারা গেছে আমাদের বনরক্ষকের মেয়ে। খুবই কম বয়স। অনেকবারই ওকে দেখেছি। বেচারা বাপ কফিনের পেছন পেছন হাঁটছে। একমাত্র মেয়ে তার। কন্যাশোকে বনরক্ষকের বুকটা একদম ভেঙে গেছে।

শবযাত্রার প্রতি সম্মান দেখাতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তাদের সমবেত কণ্ঠের অন্ত্যেষ্টির প্রার্থনায় গলা মেলালাম।

আমার সঙ্গী জোরে একটা ঠেলা দিল আমাকে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম।

সে রূঢ় গলায় বলল, 'শুনছ না কী বেসুরো গলায় গাইছে ওরা?'

'কিন্তু আমার কাছে সুরটা তো মিষ্টিই লাগল।' প্রতিবাদ করলাম আমি। তার এহেন আচরণে খুবই বিরক্ত হয়েছি। পাছে ওর কথা শবযাত্রীরা শুনতে পায় সেজন্য আমি আবার গাইতে শুরু করলাম।

'তুমি তো আমার কান ফাটিয়ে দেবে,' রাগত গলায় বলল কারমিল্লা, হাত চাপা দিয়েছে কানে। 'তা ছাড়া কী করে ভাবছ

তোমার আর আমার ধর্ম এক? তোমাদের রীতিনীতি আমার কাছে অসহ্য লাগে। তা ছাড়া আমি ফিউনারেল একদমই পছন্দ করি না। মরব তো আমরা সবাই। তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কীসের? চলো, বাড়ি ফিরি।'

'আমার বাবা পাদ্রীর সঙ্গে চার্চে গেছেন। আমি ভেবেছি তুমি হয়তো জানতে মেয়েটিকে আজ কবর দেয়া হবে।'

'ওই মেয়েটা? চাষাভুষো নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ওকে তো আমি চিনিই না।' বলল কারমিল্লা। তার চোখ ঝলসে উঠল।

'দিন পনেরো আগে এই মেয়েটা ভূত দেখেছে বলেছিল। তার পরপরই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গতকাল মারা গেছে।'

'আমাকে ভূতের গল্প শুনিয়ো না। তা হলে রাতে ঘুমাতে পারব না।'

'আশা করি আমাদের গাঁয়ে কোন প্লেগ বা জ্বর হামলা করবে না; যদিও আলামত সেরকমই মনে হচ্ছে,' বলে চললাম আমি। 'শূকরপালকের কমবয়েসী বউটা সপ্তাহখানেক আগে মারা গেছে। সে ঘুমাচ্ছিল। এমন সময় কে যেন তার গলা টিপে ধরে। প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে মরার জোগাড়। তার পরপরই সে জ্বরে পড়ে যায়। বাবা অবশ্য বলেন মানুষ ভয়ানক কিছু কল্পনা করলে তার অসুখ হতে পারে। মেয়েটা আগের দিনও দিব্যি সুস্থ ছিল। কিন্তু এরপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সপ্তাহ না গড়াতেই মৃত্যু।'

'যাকগে, ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে এবং সেইসঙ্গে সেই গানও। ওই বিশ্রী বেসুরো গানটা আর শুনতে হবে না। ওই গানটা আমাকে নার্ভাস করে ফেলেছে। এখানে বসো, আমার পাশে; আমার হাত ধরো; শক্ত করে ধরো–আরও শক্ত করে।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটু পেছন দিকে চলে গিয়েছিলাম। এখানে আরেকটি বেঞ্চ পেয়ে গেলাম।

বসল কারমিল্লা। হঠাৎ ওর চেহারায় এমন এক পরিবর্তন লক্ষ করলাম যে ভয়ে আমার বুক হিম হয়ে গেল। ওর মুখ কালো এবং নীলচে হয়ে উঠল; দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, হাত মুষ্টিবদ্ধ, কুঁচকে গেছে ভুরু, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। তাকিয়ে আছে পায়ের নীচের মাটির দিকে। ওর সারা শরীর জ্বরগ্রস্তের মত কাঁপছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে জ্ঞান না হারাতে। অবশেষে ওর মুখ দিয়ে চাপা যন্ত্রণাসূচক একটি আর্তনাদ বেরিয়ে এল, একটু একটু করে নিজেকে সামলে নিল কারমিল্লা। হিস্টিরিয়া রোগীর মত আচরণ থেকে যেন মুক্তি পেল। বলল, 'স্তোত্র শুনিয়ে মানুষের দম বন্ধ করতে গেলে এমনই হয়। ধরো, ধরো, আমাকে শক্ত করে চেপে ধরো। হ্যাঁ, ঝিমঝিম ভাবটা এখন কেটে যাচ্ছে।'

হলোও তাই। ওর হিস্টিরিয়ার ভাব কেটে গেল। ওর আচরণ আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। সেটা দূর করতেই হয়তো কারমিল্লা আগের চেয়েও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। আমরা বাড়ির পথ ধরলাম।

ড্রইংরুমের জানালা দিয়ে দু'জনে তাকিয়ে আছি, দেখি এক লোক ড্রব্রিজ পার হয়ে এগিয়ে আসছে। একে আমি চিনি, বছরে দু'বার সে দুর্গে আসত।

লোকটি কুঁজো, মুখে কালো ছুঁচলো দাড়ি। দুই কান ভরে হাসে সে। হাসার সময় ধবধবে সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। তার পোশাকে কত জিনিস যে ঝোলানো আছে গুণে শেষ করা যাবে না। সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে একটা ম্যাজিক লণ্ঠন এবং দুটো বাক্স। আমি জানি ওই বাক্সের একটার মধ্যে আছে একটা সালামাণ্ডার, অন্যটায় একটা বেজি। এ দুটো প্রাণীর মারামারি দেখে আমার বাবা খুব হাসেন। বাক্সে আরও আছে বানরের শরীরের কাটা অংশ, কাকাতুয়া, কাঠবেড়ালী, মাছ এবং কাঁটাচুয়া। শুকনো এ জিনিসগুলো একসঙ্গে সুতো দিয়ে সেলাই করা।

দেখলে চমকে যেতে হয়। এ ছাড়া তার কাছে ছিল একটা বেহালা, একটা ম্যাজিকের বাক্স, একজোড়া ধাতুর পাত্র, কিছু মুখোশ, আরও বেশ কিছু রহস্যময় বস্তু। তার হাতে তামা দিয়ে বাঁধানো একটা কালো লাঠি। তার সঙ্গী বদমেজাজী এক রোগা কুকুর, সবসময়ই তার পিছু-পিছু চলে। তবে আজ কুকুরটা ড্রব্রিজের কাছে এসেই আর্তচিৎকার শুরু করে দিল।

ইতিমধ্যে লোকটা এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। হ্যাট তুলে বেশ জাঁকালোভাবে সম্মান জানাল, তারপর বেহালা নিয়ে অত্যন্ত চটুল সুরে বাজাতে শুরু করল, সেইসঙ্গে এমন বেসুরো গান ধরল আর নাচতে লাগল যে আমার হাসি পেয়ে গেল। জানালার কাছে এগিয়ে এসে সে অনেকক্ষণ ধরে নিজের কীর্তি কাহিনি জাহির করল। তারপর আমাদেরকে বলল মন্ত্রপূত কবচ কিনতে, যা সঙ্গে থাকলে আর রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ারের ভয় থাকবে না—সেই ভ্যাম্পায়ার নাকি নেকড়ের মত এই বনের অসংখ্য প্রাণী হত্যা করে চলেছে। এই মন্ত্রপূত কবচ বালিশের নীচে রেখে দিলে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব, ভ্যাম্পায়ার কিছু করতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে কারমিল্লা একটা কবচ কিনল, আমিও একটা কিনলাম।

লোকটা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল আর আমরা মজা পেয়ে মুখ নামিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, অন্তত আমি। তার অন্তর্ভেদী কালো চোখের দৃষ্টি কী দেখে জানি না হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। চট করে সে একটা চামড়ার ব্যাগ খুলল, কী-সব ইস্পাতের যন্ত্রপাতি সেই থলেতে। সেগুলো দেখিয়ে সে আমাকে বলল, 'এই দেখুন, লেডি, দাঁত তোলার সব সরঞ্জাম, দাঁতের চিকিৎসাও আমার জানা আছে—গোল্লায় যাক কুকুরটা—থাম, অভাগা! এমন চিল্লাচ্ছে যে ভদ্রমহিলারা একটা কথাও শুনতে

পাচ্ছেন না! যে অভিজাতবংশীয়া লেডি আপনার বাঁদিকে রয়েছেন, তাঁর মত অমন ধারালো, লম্বা, ছুঁচলো দাঁত আর কারও নেই। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি তাঁর দাঁত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় ওই দাঁতের জন্যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তা, আমি আমার যন্ত্রপাতি দিয়ে ওই দাঁতগুলো গোল আর ভোঁতা করে দিতে পারি যদি উনি আপত্তি না করেন, তা হলেই ও-দাঁত মাছের মত না হয়ে মানুষের দাঁতের মত হয়ে উঠবে।–কী হলো, উনি কি রাগ করলেন নাকি, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?'

অভিজাতবংশীয়া লেডিটিকে দেখে মনে হলো সত্যিই সে ক্রুদ্ধ হয়েছে–জানালা থেকে সে পেছিয়ে গেল। বলল, 'বেদে জাদুকরটা কোন্ সাহসে আমাকে এমন অপমান করে? কোথায় তোমার বাবা, তাঁকে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে! আমার বাবা হলে একে বেঁধে বেত মারতেন আর ওর শরীরের সমস্ত মাংস আগুনে ঝলসে দিতেন!'

জানালা থেকে সরে দু'এক পা পেছিয়ে গিয়ে কারমিল্লা বসে পড়ল। লোকটা চলে যাওয়ামাত্র তার ক্রোধ যেমন হঠাৎ জেগে উঠেছিল তেমনি হঠাৎই নেমে গেল, স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে, মনে হলো যেন জাদুকরের প্রসঙ্গ ভুলেই গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবার মেজাজ তেমন ভাল ছিল না, বললেন আগের দু'জনের মত আরও একজন একইভাবে মারা গেছে। তাঁরই এক প্রজা, তার বাড়ি মাইলখানেক দূরে, তার বোনেরও সেই একই অসুখ হয়েছিল, এবং ক্রমেই তার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই এগুলোকে ধরা হচ্ছে। এদের অন্ধবিশ্বাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে, একজনের থেকে আর-একজনের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

'কিন্তু সেখানেই তো আমার ভয়।' কারমিল্লা বলল।

'কেন?' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এমন সব দৃশ্য আমি দেখেছি যা কল্পনা করতেও ডর লাগে।'

বাবা বললেন, 'সবই ঈশ্বরের হাতে, তাঁর ইচ্ছে ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না, আর যারা তাঁকে ভালবাসে তাদের কোন অমঙ্গল হবে না। স্রষ্টা তিনি, তিনিই রক্ষা করবেন আমাদের।'

'স্রষ্টা? না না, প্রকৃতি!' বাবার কথার উত্তরে কারমিল্লা বলল, 'যে রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে তা প্রাকৃতিক। আর প্রকৃতি থেকেই তো সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, তাই না? স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে যা কিছু ঘটে সে সবই ঘটে প্রকৃতির ইচ্ছানুসারে। তাই নয় কি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন, 'ডাক্তার বলেছেন আজ আসবেন। তিনি কী বলেন শুনি তারপর ঠিক করব কী করা যায়।'

কারমিল্লা বলল, 'কিন্তু ডাক্তাররা কোনদিনই আমার কোন উপকারে আসেনি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ও, তুমি অসুস্থ হয়েছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তবে তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়।'

'কবে অসুখ করেছিল? অনেক দিন আগে?'

'হ্যাঁ। ঠিক এমন অসুখই হয়েছিল। কিন্তু সে সবই আমি ভুলে গেছি, শুধু মনে আছে যন্ত্রণা আর দুর্বলতার কথা। তবে, তাও অন্যান্য অসুখের মত তেমন মারাত্মক নয়।'

'তোমার বয়স কি তখন খুব কম ছিল?'

'থাক, ও নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।' বলে সে দুর্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর দু'হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। বাবা জানালার কাছে বসে কয়েকটা কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'তোমার বাবা আমাকে এমন ভয় দেখান কেন বল তো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একটু শিউরে উঠে সে প্রশ্ন করল।

'আরে দূর, বাবা কেন তোমাকে ভয় দেখাবেন!'

'তুমি কি ভয় পেয়েছ লক্ষ্মীটি?' বলল কারমিল্লা।

'ভয় পেতাম, যদি জানতাম এদের মত আমিও এ রোগ বাধিয়ে বসতে পারি।'

'মরতে ভয় পাও তুমি?'

'নিশ্চয়, সকলেই ভয় পায়।'

বেলা হলে ডাক্তার এলেন, বাবার সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ একান্তে কথা বললেন। তাঁর বয়স ষাটের উপরে, খুবই ভাল চিকিৎসক। বাবা আর তিনি শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন, 'আপনার মত জ্ঞানী লোকও যে দানব আর ড্রাগন নিয়ে কথা বলবেন ভাবতেও পারিনি।'

ডাক্তার হাসলেন, 'জীবন আর মৃত্যু তো রহস্যঘেরা ব্যাপার, সে রহস্যের কতটুকুই বা আমরা জানি!'

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন দু'জনে। তাঁদের কথা আর শুনতে পেলাম না। তখন বুঝতে পারিনি ডাক্তার কী বলতে চাইছিলেন, কিন্তু এখন তা আন্দাজ করতে পারছি।

পাঁচ

সন্ধ্যায় গ্রাটজ থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে হাজির হলো পিকচার-ক্লিনারের ছেলে। গোমড়ামুখো একটা লোক। সঙ্গে বড় সাইজের দুটো প্যাকিং বাক্স নিয়ে এসেছে। তাতে ছবি বোঝাই।

দশ লীগ দূর থেকে এসেছে সে। তার আগমনে আমাদের প্রাসাদদুর্গে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। অবশ্য অত দূর থেকে কেউ এলে আমাদের মধ্যে সবসময়ই উত্তেজনা তৈরি হয়। আমরা তাকে ঘিরে ধরি কী খবর নিয়ে এসেছে তা শোনার আশায়।

প্যাকিং বাক্সগুলো হলঘরে রইল। বাক্স বহনকারীর জন্য সাপারের ব্যবস্থা করা হলো। খাওয়া শেষ করে সে তার সহকারীদের নিয়ে হলরুমে চলে এল। হাতে হাতুড়ি, বাটালি এবং টার্নস্ক্রু। এসব দিয়ে বাক্স খোলা হবে।

কারমিল্লা নিরুৎসাহী ভঙ্গিতে বসে রইল। বাক্স খুলে একটার পর একটা ছবি বের করা হলো। প্রায় সবগুলো ছবিই নিয়ে আসা হলো আলোর নীচে। আমার মা একটি প্রাচীন হাঙ্গেরিয়ান পরিবারের মেয়ে, ছবিগুলোর বেশিরভাগই এসেছে তাঁর সূত্রে।

বাবার হাতে একটি তালিকা। চিত্রশিল্পী একটির পর একটি ছবি বের করছে আর তিনি তালিকা মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। ছবির কোয়ালিটি যে খুব ভাল তা বলা যাবে না, বেশিরভাগ অত্যন্ত প্রাচীন। এবং অনেকগুলো এই প্রথম দেখলাম। এসব ছবির অনেকগুলোই ধুলো এবং ধোঁয়ার কারণে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

'তালিকায় একটি ছবির নাম দেখতে পাচ্ছি ওটা আমি আগে কখনও দেখিনি,' বললেন বাবা। 'মার্সিয়া কার্নস্টাইন। তারিখ দেয়া ১৬৯৮। দেখি তো ছবিটি কেমন।'

আমার মনে আছে ছবিটি ছিল ছোট, উচ্চতায় দেড় ফুটের মত, প্রায় চৌকোনা। ছবিটি ফ্রেমে বাঁধানো নয়, তবে কালের গ্রাসে বেশ কালো হয়ে গিয়েছিল।

বেশ গর্ব নিয়ে ছবিটি বের করল শিল্পী। অপূর্ব একটি ছবি, রীতিমত চমকে দেয়ার মত, ভীষণ জীবন্ত। এ যেন হুবহু

কারমিল্লার প্রতিচ্ছবি!

'কারমিল্লা, কী অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো। এ ছবিতে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমি। দারুণ জীবন্ত। হাসছ তুমি। যেন এখুনি কথা বলে উঠবে। অসাধারণ না, বাবা? আর দেখ, ওর গলার জড়ুলটা পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে।'

হেসে উঠলেন বাবা। 'সত্যি অসাধারণ মিল।' বলেই তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পিকচার-ক্লিনারের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বাবা ছবিটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না বলে আমার আশ্চর্যই লাগল। পিকচার-ক্লিনার দেয়ালে ছবি টাঙাচ্ছে, বাবা তার সঙ্গে খোশগল্পে মেতে উঠলেন। কিন্তু আমি ছবিটি যত দেখছিলাম ততই বেড়ে যাচ্ছিল বিস্ময়।

'আমি এ ছবিটি আমার ঘরে টাঙাই, বাবা?' অনুমতি চাইলাম আমি।

'নিশ্চয়,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 'কারমিল্লার সঙ্গে ছবিটির সত্যি অপূর্ব মিল রয়েছে। যা ভেবেছি তারচেয়েও ছবিটি সুন্দর।'

বাবার এ মন্তব্য কারমিল্লার হয়তো পছন্দ হয়নি কিংবা সে না শুনেও থাকতে পারে। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটি আমার দিকে নিবদ্ধ।

'ছবির কিনারে লেখা নামটা এখন পরিষ্কার পড়তে পারছি,' বললাম আমি। 'সোনার জলে লেখা নাম। তবে এটা মার্সিয়া নয়, মির্কাল্লা কার্নস্টাইন। ছবিতে একটি ছোট মুকুট আছে, তার তলায় লেখা রয়েছে ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ। কার্নস্টাইন বংশে আমার জন্ম—আমার মায়ের দিক দিয়ে।'

'তাই নাকি!' নিস্তেজ গলায় বলল কারমিল্লা। 'আমিও ওই বংশের মেয়ে। বংশটি অত্যন্ত প্রাচীন, খুবই প্রাচীন। কার্নস্টাইন বংশের আর কেউ কি এখনও জীবিত আছে?'

'মনে হয় না। গৃহযুদ্ধে বহু বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে পরিবারটি। তবে দুর্গের ধ্বংসাবশেষটা এখনও আছে। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে।'

'দ্যাখো, বাইরে কী সুন্দর জোসনা ফুটেছে,' অলস ভঙ্গিতে বলল কারমিল্লা। খোলা হলঘরের দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'এমন রাতে রাস্তায় এবং নদীর ধারে হেঁটে বেড়াতে মজা।'

'এরকম একটি রাতেই তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে,' বললাম আমি।

কারমিল্লা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাসছে।

সিধে হলো সে, আমরা হাত দিয়ে একে অন্যের কোমর জড়িয়ে ধরে পেভমেণ্টে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ড্রব্রিজের কাছে। এখানে প্রকৃতি তার অবারিত সৌন্দর্য মেলে দিয়েছে আমাদের কাছে।

'তা হলে তুমি সেই রাতের কথা ভাবছ যে রাতে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম?' ফিসফিস করল কারমিল্লা। 'আমি এসেছি বলে তুমি খুশি হয়েছ?'

'খুব খুশি হয়েছি, কারমিল্লা।' বললাম আমি।

'আর তুমি আমার মত দেখতে একটি ছবি তোমার ঘরে টাঙাতে চাইছ,' বিড়বিড় করে বলল সে, আমার কোমর ধরে টেনে নিল তার কাছে, আমার কাঁধে গুঁজে দিল মুখ।

'তুমি খুব রোমাণ্টিক, কারমিল্লা,' বললাম আমি।

ও আমাকে নীরবে চুমু খেল।

'তুমি নিশ্চয় কারও প্রেমে পড়েছ,' বললাম আমি।

'আমি জীবনেও কারও প্রেমে পড়িনি, ভবিষ্যতেও সে আশা নেই,' ফিসফিস করল কারমিল্লা। 'অবশ্য সে মানুষটি যদি তুমি হও তা হলে ভিন্ন কথা।'

চাঁদের মায়াবী আলোয় ওকে যে কী সুন্দর লাগছে!

কারমিল্লা তার নরম গাল আমার গালে ঘষতে ঘষতে বলল, 'ডার্লিং, ডার্লিং, তোমাকে কত ভালবাসি আমি। তোমার মধ্যেই আমার জীবন। আর আমার জন্যই মরবে তুমি। তোমাকে আমি এতটাই ভালবাসি।'

কারমিল্লা মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তবে মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে নাকি, ডিয়ার?' ঘুম-ঘুম গলায় বলল সে। 'আমার কেমন শীত লাগছে। চলো, ভেতরে যাই।'

'তোমাকে অসুস্থ লাগছে, কারমিল্লা। তোমার বোধহয় একটু ওয়াইন খাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, খাব। আমি এখন একটু ভাল বোধ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাব। হ্যাঁ, চলো, তুমি আমাকে ওয়াইন খাওয়াবে।' বলল কারমিল্লা। আমরা বাড়ির দরজায় পা বাড়ালাম। ওর জন্য আমার চিন্তা হচ্ছিল। একটা অদ্ভুত মহামারী হামলা করেছে এদেশে, বলে লোকে। কারমিল্লা আবার অসুস্থ হয়ে না পড়ে।

'তোমার শরীর খারাপ লাগলে বলো,' বললাম আমি। 'আমাদের পরিচিত খুব ভাল একজন ডাক্তার আছেন। তুমি বললেই বাবা তাঁকে খবর দেবেন।'

'আরে না না, ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি ঠিক আছি। শুধু একটু দুর্বল লাগছে শরীর। লোকে বলে আমার গায়ে শক্তি কম। আমি তো তিন বছরের আগে হাঁটতেই পারিনি। মাঝে মধ্যে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ি বটে তবে পরে আবার ঠিক হয়ে যাই। দেখছ না এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

সত্যিই তাই। কারমিল্লাকে এখন সুস্থই লাগছে। সে বকবক শুরু করে দিল। তবে সে রাতে এমন একটি ঘটনা ঘটল যে আমার চিন্তাভাবনাগুলো কেমন ওলটপালট হয়ে গেল।

ছয়

আমরা ড্রইংরুমে ঢুকলাম। কফি এবং চকোলেট খেলাম। তবে কারমিল্লা কিছুই নিল না। সে আবার নিজের মধ্যে ডুবে গেছে। আমাদের সঙ্গে যোগ দিল মাদাম পেরোডন এবং মাদমোয়াজেল ডি লাফন্টেইন। সবাই মিলে কিছুক্ষণ তাস খেললাম। এর মধ্যে বাবাও এসে পড়লেন। আমাদের সঙ্গে খেলতে বসে গেলেন।

খেলা শেষে বাবা সোফায়, কারমিল্লার পাশে বসলেন। একটু উদ্বেগ নিয়েই জানতে চাইলেন কারমিল্লার মা তাকে কোন খবর পাঠিয়েছেন কিনা।

কারমিল্লা জবাব দিল, 'না।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন চিঠি লিখলে কারমিল্লার মাকে পৌঁছানো যাবে কিনা।

'তা আমি বলতে পারব না,' অস্পষ্ট গলায় বলল কারমিল্লা। 'তবে আমি চলে যাব ভাবছি। আপনারা আমার প্রতি অনেক দয়া দেখিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি। কাল আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। মা'র খোঁজে যাব। মাকে কোথায় পাওয়া যাবে সে আমি জানি। কিন্তু আপনাদেরকে বলতে পারছি না।'

'না, না, চলে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভেব না,' আমাকে স্বস্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন বাবা। 'তোমাকে আমরা এখনই হারাতে

চাই না। তোমার মা আমাদের ওপর অনেক ভরসা করেছেন। কাজেই তোমাকে আমরা এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। তোমার মা'র কোন খবর পেলে ভাল লাগত। আমাদের গাঁয়ে রহস্যময় এক মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে। আমি এরকম একটা অবস্থার মধ্যে তোমাকে কী করে যেতে দিই বলো?'

'আপনার আতিথেয়তার জন্য হাজারো ধন্যবাদ, স্যর,' বলল কারমিল্লা। 'আপনারা সবাই আমার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। আমি এত আদর-যত্ন আগে কখনও পাইনি। বিশেষ করে আপনার মেয়ের তো তুলনাই হয় না।'

প্রশংসা শুনে খুশি হলেন বাবা। কারমিল্লার হাতে চুমু খেলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওপরে, কারমিল্লার ঘরে চলে এলাম। ঘুমাতে যাওয়ার আগে দু'জনে খানিক গল্প করার ইচ্ছে।

'তুমি কি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছ না, কারমিল্লা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

শুনে হাসল শুধু কারমিল্লা, জবাব দিল না।

'তুমি এ প্রশ্নের জবাব দেবে না, না?' বললাম আমি। 'তোমাকে আসলে প্রশ্নটা করাই আমার উচিত হয়নি।'

'আমাকে যে কোন প্রশ্ন করার অধিকার তোমার আছে,' বলল কারমিল্লা। 'তুমি জান না তুমি আমার কত প্রিয়। কিন্তু আমি যে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি। সে শপথ এখন ভাঙতে পারব না। তাই তোমাকে কিছু বলতেও পারছি না। তবে সে সময় খুব বেশি দূরে নয়। তুমি সবকথা জানতে পারবে। তুমি নিশ্চয় ভাবছ আমি খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির, প্রচণ্ড স্বার্থপর। কিন্তু ভালবাসা সবসময়ই স্বার্থপর হয়। ভালবাসা যত প্রবল হয় ততই সে স্বার্থপর হয়ে ওঠে। আমি কতটা ঈর্ষাপরায়ণ তুমি জান না। তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে, ভালবাসতেই হবে এবং তা আমৃত্যু। অথবা তুমি

আমাকে ঘৃণা করতেও পার তবু আমার কাছে তোমাকে আসতে হবে। আমাকে মৃত্যুর মাঝে এবং মৃত্যুর পরেও হয়তো ঘৃণা করবে।'

'কারমিল্লা, তোমার এসব আবোল-তাবোল বকুনি থামাবে?' দ্রুত বলে উঠলাম আমি।

'আমি আবোল-তাবোল বকছি না। যা বলছি ভেবেচিন্তেই বলছি। যাকগে, বাদ দাও এসব। তুমি বরং ঘুমাতে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।' বলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল কারমিল্লা। আমি ওকে শুভরাত্রি জানালাম। চলে আসছি, টের পেলাম ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আগেও লক্ষ করেছি ও সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে। এই হাসির অর্থ আমি সত্যি জানি না।

কারমিল্লা ঘুমাতে যাওয়ার আগে কখনও প্রার্থনা করে কিনা বলতে পারব না। কোনদিন অবশ্য ওকে প্রার্থনা করতে দেখিওনি। সে সকালে যখন নীচে নেমে আসে ততক্ষণে আমাদের প্রার্থনা পর্ব শেষ। ড্রইংরুমে আমাদের সংক্ষিপ্ত সান্ধ্যকালীন প্রার্থনাতেও ও কখনও যোগ দেয়নি।

কারমিল্লা একদিন কথায় কথায় বলেছিল ওকে ব্যাপ্টাইজড করানো হয়েছে, নইলে ও যে ক্রিশ্চিয়ান সেটাই বিশ্বাস করতাম না আমি। ধর্ম নিয়ে কক্ষনো ওকে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে শুনিনি।

আমি নিজের ঘরে এসে বিছানায় শোবার খানিক বাদেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমানোর সময় আমার ঘরে সবসময় উজ্জ্বল বাতি জ্বলে। ছোটবেলার অভ্যাস।

সে রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। তবে এটিকে দুঃস্বপ্নও বলা যায়। দেখি আমি নিজের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার ঘরে। তবে কামরার সবগুলো আসবাব কালো রঙে রঙ করা। আমার

খাটের ধারে কিছু একটা নড়াচড়া করছিল। প্রথমে বুঝতে পারিনি ওটা কী। পরে খেয়াল করে দেখি ওটা একটা কুচকুচে কালো বেড়াল। প্রকাণ্ড। লম্বায় চার-পাঁচ ফুট তো হবেই। ওটাকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম আমি। গলা দিয়ে রা বেরুচ্ছিল না। ওটা ঘরের মধ্যে খাঁচাবদ্ধ জন্তুর মত পায়চারি করছিল। ওটার পায়চারির গতি দ্রুততর হয়ে উঠল, সে সঙ্গে ঘর অন্ধকার হতে শুরু করল। ক্রমে এমন আঁধার হয়ে এল যে ওটার জ্বলজ্বলে চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হলো ওটা লাফিয়ে উঠেছে বিছানায়। আমার দিকে এগিয়ে আসছে বড় বড় একজোড়া চক্ষু। হঠাৎ যেন সুই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে আমার দুই বুকে। আমি চিৎকার দিয়ে জেগে গেলাম। দেখি ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। এ মোমবাতিই সারা রাত ধরে জ্বলে। আমার খাটের পায়ার কাছে একটি নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ঢিলা, কালো পোশাক। খোলা চুল ঢেকে রেখেছে কাঁধ, পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। নিঃশ্বাসও নিচ্ছে না। আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি ওটার দিকে, মূর্তিটি জায়গা বদল করল। পরক্ষণে দেখি সে দরজার সামনে চলে গেছে। খুলল দরজা এবং বেরিয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম অবশেষে। এতক্ষণ দম বন্ধ হয়ে ছিল আমার, নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। প্রথমে ভাবলাম কারমিল্লা বোধহয় আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছে। আমি দরজা বন্ধ করে শুতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই ফাঁকে সে ঢুকে পড়েছে ঘরে। আমি চট করে নেমে পড়লাম বিছানা থেকে। নাহ্, দরজা তো বন্ধ। যথারীতি ভেতর থেকে ছিটকিনি দেয়া। দরজা খুলতে ভয় লাগল আমার। খুললে না জানি কী দেখতে পাব বাইরে। আমি এক লাফে বিছানায় উঠে পড়লাম। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আতংকে আধমরা হয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত ওভাবেই শুয়ে রইলাম।

সাত

সে রাতের বিভীষিকার বর্ণনা করতে গেলে আমি আজও আতংকিত হই, বর্ণনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখে যে ক্ষণকালীন ভয়ে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি সেরকম ভয় এ নয়, এ ভয় যেন সময় যত যায় ততই গভীরভাবে চেপে ধরে।

পরের দিন এক মুহূর্তের জন্যও একা থাকার সাহস আমার হলো না। বাবাকে ঘটনাটি বলা উচিত তবে দুটি কারণে বলতে পারিনি। প্রথমত আমার মনে হয়েছে তিনি এটা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না, হেসে উড়িয়ে দেবেন। এবং তখন আমি তা সহ্য করতে পারব না। আর অপর কারণটি হলো, তিনি শুনে হয়তো ভাববেন, যে রহস্যময় অসুখটা ছড়িয়ে পড়েছে তার ছোঁয়াচ আমারও লেগেছে। বাবার শরীরটা কয়েকদিন ধরেই খারাপ যাচ্ছে। খবরটা পেয়ে হয়তো তিনি ভয় পাবেন।

তবে মাদাম এবং মাদমোয়াজেলের কাছে ঘটনা বলতে আমার অসুবিধে নেই। তারা আমার শুকনো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিল আমার কিছু একটা হয়েছে। আমার গল্প শুনে মাদমোয়াজেল হাসল তবে উৎকণ্ঠিত বোধ করল মাদাম পেরোডন। মাদমোয়াজেল হাসতে হাসতে বলল, 'কারমিল্লার শোবার ঘরের জানালার পেছনের লেবু গাছের রাস্তাটায় কিন্তু ভূত আছে।'

'বাজে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল মাদাম। কথাটা তার মোটেই পছন্দ হয়নি। 'কে বলল শুনি?'

'মার্টিন, সে দু'-দু'বার ওখানে ভূত দেখেছে,' বলল মাদমোয়াজেল। 'ভোরের দিকে উঠোনের গেট সারাতে এসেছিল মার্টিন। তখন সে এক পেত্নিকে দেখে লেবু গাছের রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে।'

'এসব কথা কারমিল্লাকে বলতে যেয়ো না কিন্তু,' মাদমোয়াজেলকে মানা করে দিলাম আমি। 'কারণ ওর ঘরের জানালা দিয়ে ওই রাস্তাটা দেখা যায়। তা ছাড়া ও আমার চেয়েও বেশি ডরপুক।'

সেদিন কারমিল্লা আরও দেরি করে নীচে নামল।

'কাল রাতে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' বলল ও। 'ভাগ্যিস ওই মাদুলিটা নিয়েছিলাম, নইলে নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে হতো–অথচ ওই কুঁজো লোকটাকে কত আজেবাজে কথা বলেছি। আমি স্বপ্নে দেখলাম কী একটা কালো জিনিস আমার বিছানার চারপাশে ঘুরছে। সঙ্গে একটা কালো মূর্তি। তখন বালিশের নীচে কবচটায় হাত দিতেই ওটা মিলিয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'বেশ, এবার আমার অভিজ্ঞতার কথা শোন।' আমার গল্প শুনে শিউরে উঠল কারমিল্লা।

'তোমার কাছে তখন কবচটি ছিল না?'

'না, আমি ওটা ড্রইংরুমের একটা চীনামাটির পাত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। তবে ওটার ওপর তোমার যখন এতই বিশ্বাস তখন আজ রাতে আমি আমার কবচটা নিয়েই শোব।'

তবে এতদিন পরে আমি বলতে পারব না কোন্ ভরসায় আতংক নিয়েও সে রাতে আমি একা ঘরে কাটাই। যদিও স্পষ্ট মনে আছে কবচটি আমি বালিশের নীচে রেখেছিলাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর সে রাতে অন্যান্য দিনের

চেয়ে গভীর ঘুম হয়েছিল।

পরের রাতে কোন ঝামেলা হলো না। আমি বেশ শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলাম এবং কোন স্বপ্নও দেখিনি। তবে ঘুম থেকে জাগার পরে শরীরটা কেমন অবসন্ন লাগছিল। এরকম প্রতিদিন সকালে হতে থাকল। আগের রাতে গভীরভাবে ঘুমানো সত্ত্বেও পরদিন প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগে। নিস্তেজ একটা ভাব সারাদিন আমার ওপর চেপে থাকে। মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে আমি বদলে যাচ্ছি। এমন একটা বিষণ্নতা আমাকে জেঁকে ধরছিল যার ব্যাখ্যা ঠিক দিতে পারব না। আমার মাথায় মৃত্যুচিন্তা আসতে লাগল। আমি যেন মৃত্যুর কুয়োয় ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি। তবু আমার মনে কোনরকম বিকার জাগছে না।

তবু আমি মানতে চাইছি না যে আমি অসুস্থ। বাবা কিংবা ডাক্তারকেও এ কথা জানাব না ঠিক করেছি।

কারমিল্লাকে মনে হলো আমার প্রতি আগের চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। আমার শক্তি যত নিস্তেজ হয়ে পড়ছে আমার প্রতি তার উষ্ণ আবেগ ততই উথলে উঠছে। এ ব্যাপারটি আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

আমার মনে হচ্ছে অজ্ঞাতসারেই আমি এক অদ্ভুত অসুখের দিকে এগিয়ে চলেছি। গুরুতর কোন রোগ যাতে কখনও কোন মানুষ আক্রান্ত হয়নি। তবে আশ্চর্য এই যে, এ অসুখটির প্রতি আমি কেমন যেন একটি আকর্ষণ অনুভব করছি এবং যত দিন যাচ্ছে আকর্ষণ ততই বাড়ছে।

আমি ইদানীং অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। তবে ঘুম থেকে জাগবার পরে স্বপ্নের দৃশ্যপট, ব্যক্তি কিংবা অন্যকিছু আমার মনে থাকে না। যদিও মনে হয় স্বপ্নগুলো অদ্ভুত এক ছাপ রেখে গেছে আমার দেহ-মনে। আমি নিদারুণ অবসন্নবোধ করতে থাকি, যেন দীর্ঘকালের মানসিক এক বিপদ পার হয়ে এসেছি।

আমি স্বপ্ন দেখি ভীষণ অন্ধকার একটা জায়গায় আমি হাঁটছি, এমন সব লোকের সঙ্গে কথা বলছি যাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। শুনতে পাই একটি নারী কণ্ঠ। গভীর গলার স্বর, ভেসে আসে যেন অনেক দূর থেকে। আর সেই কণ্ঠটি শুনলে আমার মনে অবর্ণনীয় এক আতংক জন্ম নেয়। মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ আস্তে আস্তে আমার গালে এবং ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ যেন উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে আমাকে চুম্বন করে, গাল থেকে ঠোঁট নেমে যায় আমার গলায়। সেখানে ঠোঁটজোড়া চেপে থাকে। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাসও তাই। মনে হয় আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি ফুঁপিয়ে উঠি। আমার সারা দেহে একটা ভয়ঙ্কর কম্পন তৈরি হয়। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

এরকম অবস্থা চলল তিন সপ্তাহ ধরে। আমার এই মানসিক যন্ত্রণা আমার শরীরে ফুটে উঠল। আমি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগলাম, চোখের মণি প্রসারিত হয়ে উঠছিল, চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। এবং যে ক্লান্তি অনুভব করছিলাম ওটার ছাপও ফুটল দেহে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন আমি অসুস্থ কিনা। কিন্তু আমি তা কিছুতেই স্বীকার করলাম না। বললাম ঠিক আছি।

তবে কথাটি একদিক দিয়ে সত্যও বটে। আমার কোন শারীরিক যন্ত্রণা ছিল না। অসুস্থতা যা ছিল তা স্নায়ু আর আমার কল্পনা ঘিরে। আর সেই অসুস্থতার যন্ত্রণা আমি একাই সঙ্গোপনে বহন করছিলাম।

কারমিল্লা অনুযোগ করত সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে কিংবা জ্বরজ্বর লাগছে শরীর। তবে আমার মত এত খারাপ অবস্থা ওর ছিল না।

আমি অন্ধকারে সাধারণত মিষ্টি এবং মধুর ধরনের যে শব্দ শুনতে পেতাম, এক রাতে শুনতে পেলাম তার উল্টোটা। কেউ

ভয় ধরানো গলায় বলে উঠল, 'তোমার মা তোমাকে হত্যাকারীর ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন।' ঠিক তখন অপ্রত্যাশিতভাবে একটি আলো জ্বলে উঠল এবং দেখি কারমিল্লা আমার খাটের পায়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে সাদা রাতপোশাক, তার থুতনি থেকে পা পর্যন্ত লম্বা একটি রক্তের দাগ।

আমি বিকট চিৎকার দিয়ে জেগে উঠলাম। ভেবেছি কারমিল্লাকে কেউ খুন করতে যাচ্ছে। আমি লাফ মেরে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম, এক ছুটে চলে এলাম লবিতে, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছি।

মাদাম এবং মাদমোয়াজেল তাদের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। লবিতে সবসময় বাতি জ্বালানো থাকে। সে আলোয় ওরা দেখল আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপছি।

আমি ওদেরকে কারমিল্লার দরজায় কড়া নাড়তে বললাম। কিন্তু ওর কোন সাড়া মিলল না। জোরে জোরে কড়া নাড়লাম, ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম। কোন লাভ হলো না।

আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ দরজা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। আমরা আমার রুমে চলে এলাম। জোরে জোরে বেল বাজাতে লাগলাম। বাবার ঘর কাছে থাকলে তাঁকে ডাকতে যেতাম কিন্তু তিনি যে কামরায় থাকেন সেটি এখান থেকে অনেক দূরে। চেঁচামেচি করলেও শুনবেন না।

চাকরগুলো দৌড়ে এল। ওদেরকে নিয়ে আবার কারমিল্লার ঘরের সামনে গেলাম। কিন্তু ডাকাডাকি, দরজা ধাক্কাধাক্কিই সার হলো। কারমিল্লার সাড়া নেই। আমি চাকরদেরকে দরজা ভেঙে ফেলতে বললাম। ওরা তা-ই করল। ভেঙে ফেলল দরজা। আমরা দোরগোড়ায় এসে, আলো উঁচিয়ে ধরে ডাক দিলাম কারমিল্লার নাম ধরে। জবাব মিলল না। রুমের চারপাশে চোখ বুলালাম। ঘরের সবকিছু আগের অবস্থাতেই আছে, শুধু কারমিল্লা নেই!

আট

ফাঁকা ঘরে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর চাকরবাকরগুলোকে বের করে দিলাম ঘর থেকে। মাদমোয়াজেল বলল কারমিল্লার হয়তো হট্টগোল শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং ভয়ের চোটে দিশাহারা হয়ে সে পর্দা বা অন্যকিছুর পেছনে লুকিয়ে পড়েছে। আমরা আবার ওর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে খোঁজ চালালাম।

কিন্তু কোনই লাভ হলো না। জানালার ধারে গিয়ে দেখি ওগুলো বন্ধ। আমি কারমিল্লার উদ্দেশ্যে অনুনয় করে বললাম সে যদি মজা করে লুকিয়ে থাকে তবে যেন দয়া করে বেরিয়ে আসে। কারণ এই নিষ্ঠুর খেলাটা আমাদের আর ভাল লাগছিল না। কারমিল্লা আমাদের অনুরোধে সাড়া দিলে তো। আমি ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি ও ঘরে নেই। নেই ড্রেসিংরুমেও, কারণ ওটার দরজা বন্ধ। আমি রীতিমত বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। বুড়ো হাউসকীপার একবার বলেছিল দুর্গ থেকে বাইরে যাওয়ার নাকি গোপন সুড়ঙ্গপথ আছে। কারমিল্লা কি সেরকম কোন সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করেছে?

ভোর চারটা বাজে। আমি বাকি সময়টুকু মাদামের ঘরেই বসে কাটিয়ে দিলাম। সকাল হলো। কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা হলো না।

সকালবেলা বাবা নিজে নেমে পড়লেন অনুসন্ধান অভিযানে। তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো গোটা দুর্গপ্রাসাদ। কিন্তু নিখোঁজ কারমিল্লার কোন সন্ধান মিলল না। বাবার তো মাথা খারাপ হবার জোগাড়। মেয়েটার মা ফিরে এলে তিনি তাঁকে কী জবাব দেবেন!

নিষ্ফল খোঁজাখুঁজিতে বেলা বেড়ে চলল। এখন বাজে একটা। এ সময়েই সাধারণত কারমিল্লা তার ঘর থেকে নেমে আসে নীচে। আমি এক ছুটে ওর রুমে চলে গেলাম। দারুণ অবাক হয়ে দেখি কারমিল্লা তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে সামনাসামনি দেখতে পেয়েও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারমিল্লা ওর চম্পক আঙুল তুলে ইশারায় আমাকে ডাকল। মুখ শুকিয়ে আছে ভয়ে।

আমি তীব্র আনন্দ নিয়ে ওর দিকে ছুটে গেলাম। ওকে জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খেতে লাগলাম। তারপর জোরে জোরে বেল বাজাতে লাগলাম। বেলের শব্দে সবাই চলে আসবে। আমার বাবার উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের অবসান ঘটবে। 'কারমিল্লা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'জানো, তোমার জন্য চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম। তুমি কীভাবে ফিরে এলে?'

'গতরাতে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে,' বলল কারমিল্লা।

'ঈশ্বরের দোহাই, সব খুলে বলো।'

'তখন রাত দুটো বাজে,' বলল কারমিল্লা। 'আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেছি। বেশ গভীর ঘুমাচ্ছিলাম আমি। কোন স্বপ্নও দেখিনি। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমি ড্রেসিংরুমের সোফায় শুয়ে আছি। ড্রেসিংরুম এবং আমার ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা। গ্যালারির দিকের দরজাটিও তাই। দরজাগুলো কীভাবে খুলে গেল অথচ আমি টেরও পেলাম না! কারণ দরজা খুললে শব্দ হতো এবং আমি জেগে যেতাম। আর কেইবা আমাকে বিছানা থেকে তুলে এনে সোফায় শুইয়ে দিয়েছে? আমি একটুও টের পাইনি!'

বেলের শব্দে ইতিমধ্যে মাদাম, মাদমোয়াজেল, বাবা এবং কয়েকটি চাকর চলে এসেছে এ ঘরে। কারমিল্লা যখন শুনল গোটা তল্লাটে তার জন্য খোঁজ লাগানো হয়েছিল সে খুবই অভিভূত হলো। সে সবাইকে ধন্যবাদ জানাল। ওই একই গল্প সে সকলকে শোনাল। বাবা চিন্তিত মুখে ঘরের চারপাশটায় একবার চোখ বুলালেন। লক্ষ করলাম গম্ভীর মুখে বাবাকে অনুসরণ করছে কারমিল্লার থমথমে চাউনি।

চাকরবাকরদের বিদায় করে দিলেন বাবা। ঘরে রইলাম শুধু আমি, মাদাম এবং কারমিল্লা। বাবা কারমিল্লার কাছে এসে তার হাত ধরে একটি সোফায় বসালেন।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, সোনা?' ওর পাশে বসে বললেন বাবা।

'নিশ্চয়,' বলল কারমিল্লা। 'আপনি যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব। তবে আমি যে গল্পটি একটু আগে বললাম তার বেশি কিছু জানি না। আর মা আমাকে কিছু ব্যাপারে মুখ খুলতে মানা করেছেন জানেনই তো।'

'সে জানি, সোনা। তোমার মা যেসব ব্যাপারে তোমাকে মুখ খুলতে মানা করেছেন আমি সেসব প্রসঙ্গে যাবও না। তুমি বলছ কাল রাতে কেউ তোমাকে তোমার বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সোফায় শুইয়ে দিয়েছে। তোমার ঘরের জানালা বন্ধ ছিল, দুটো দরজাই ভেতর থেকে ছিল বন্ধ। এর একটা ব্যাখ্যা হয়তো আমি দিতে পারব। তার আগে একটি প্রশ্নের জবাব জানা জরুরি।'

কারমিল্লা সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে; আমি এবং মাদাম রুদ্ধশ্বাসে ওদের দু'জনের কথা শুনছি।

'আমার প্রশ্ন হলো তোমার কি নিশিপাওয়া রোগ আছে? মানে তুমি কি রাতে ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়াও?'

'খুব ছোটবেলায় ঘুমের ঘোরে হাঁটতাম। বড় হওয়ার পরে এ

অভ্যাসটা চলে গেছে।'

'কিন্তু খুব ছোটবেলায় ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে তো?'

'হুঁ। আমার বুড়ি নার্স বহুবার আমাকে এ কথা বলেছে।'

বাবা হেসে মাথা ঝাঁকালেন।

'এবারেও তা হলে তা-ই ঘটেছে। তুমি ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে উঠেছ, দরজা খুলেছ এবং চাবি সঙ্গে নিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছ। তারপর তালা থেকে চাবি খুলে নিয়ে এই ফ্লোরের পঁচিশটি রুমের যে কোন একটাতে অথবা নীচতলার কোন ঘরে ঢুকেছিলে। এ বাড়িতে এত বেশি ঘর এবং ক্লজিট রয়েছে, আছে ভারী ভারী আসবাব, কেউ এর মধ্যে একবার লুকিয়ে পড়লে সারা সপ্তাহ ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও হয়তো তার সন্ধান মিলবে না। আমি কী বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছ তো?'

'বুঝতে পারছি তবে পুরোটা নয়,' বলল কারমিল্লা।

'কিন্তু বাবা, ও ড্রেসিংরুমের সোফায় কী করে গেল? তার ব্যাখ্যা কী? আমরা তো খুব ভাল করে খুঁজেছি। ওকে ড্রেসিংরুমে পাইনি।'

'তোমরা ড্রেসিংরুমে পাত্তা লাগানোর পরে ও ওখানে গিয়েছিল। তখনও সে ঘুমিয়ে আছে, পরে ঘুম ভেঙে যখন দেখে ওখানে শুয়ে আছে অন্য সবার মত ও-ও দারুণ অবাক হয়েছিল। তোমার রহস্যময় অন্তর্ধানের এটাই ব্যাখ্যা, কারমিল্লা।' হাসছেন বাবা।

কারমিল্লাও হাসল। ওকে ভারি সুন্দর লাগছিল। বাবা বোধহয় কারমিল্লার সঙ্গে মনে মনে আমার তুলনা করছিলেন। কারণ তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার লরাটা যদি দেখতে ওর মত হতো!'

আমাদের দুশ্চিন্তার এভাবেই অবসান হলো। কারমিল্লাকে ফিরে পেয়ে আমরা সবাই মহাখুশি।

নয়

কারমিল্লা যেহেতু ঘরের মধ্যে কোন পাহারাদার নিয়ে ঘুমাতে রাজি নয় তাই বাইরে এক কাজের লোককে রাখার ব্যবস্থা করলেন বাবা যাতে সে আবার ঘুমের ঘোরে দরজা খুলে বাইরে যেতে না পারে।

সে রাতটি বেশ দ্রুতই পার হলো। পরদিন সকালে একজন ডাক্তার এলেন আমাকে দেখতে। আমি জানতামও না বাবা আমাকে ডাক্তার দেখাবেন।

মাদাম আমাকে লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে গেল। সাদা চুল, চোখে চশমা, ছোটখাট গঠনের ডাক্তারটি আমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। ইনি ডা. স্পিয়েলসবার্গ।

আমি তাঁকে আমার গল্প বললাম। শুনে তাঁর গম্ভীর মুখে অন্ধকার ঘনাল।

একটা জানালার ধারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। আমার কথা শেষ হলে ডাক্তার দেয়ালে হেলান দিলেন, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি, আতংক মিশ্রিত চাউনি।

একটু পরে তিনি মাদামকে বললেন বাবাকে খবর দিতে। বাবা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। হাসিমুখে ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি নিশ্চয় এখন আমাকে বলবেন আপনাকে খামোকাই এখানে নিয়ে এসেছি। আশা করি আমার মেয়ের কিছু

হয়নি।'

কিন্তু ডাক্তারের থমথমে মুখ দেখে তাঁর হাসি ম্লান হয়ে গেল। ডাক্তার বাবাকে জানালার ধারে, কুলুঙ্গির মত একটি জায়গায় যেতে ইশারা করলেন। ওখানে দাঁড়িয়ে দু'জনে নিচুগলায় কিছুক্ষণ কথা বললেন। বিশাল ঘরের একপ্রান্তে আমি আর মাদাম দাঁড়িয়ে আছি। কৌতূহলে মরে যাচ্ছি ওঁরা কী আলাপ করছেন জানার জন্য। ওঁরা ঘরের আরেক প্রান্তে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছেন বলে আমরা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ পরে বাবা আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চেহারা কেমন ফ্যাকাসে এবং চিন্তিত।

'লরা, সোনা, এদিকে একবার এসো। আর মাদাম, তুমি এখন যেতে পার। তোমাকে এ মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

এই প্রথম বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার। শরীর আমার খুব দুর্বল লাগলেও নিজেকে কখনও অসুস্থ মনে হয়নি। ডাক্তার কি ভাবছেন আমি অসুস্থ?

আমি কাছে আসতে বাবা আমার হাত ধরলেন। বললেন, 'এসো, মা, ডাক্তার স্পিয়েলসবার্গের সঙ্গে কথা বলো।'

ডাক্তার বললেন, 'তুমি যে রাত্তিরে প্রথম ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখেছিলে সেদিন তোমার গলায় সুই ফোটানোর মত ব্যথা পেয়েছিলে বললে। ব্যথাটা কি এখনও আছে?'

'একদমই নেই,' বললাম আমি।

'জায়গাটা একটু দেখাও তো?'

গলার ঠিক নীচে–জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম আমি।

'তোমার বাবা তোমার ড্রেসটা একটু নামিয়ে দেখলে আপত্তি নেই তো? আমার একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।'

আপত্তি করলাম না আমি।

আমার বুকের ক্ষতচিহ্ন দেখামাত্র রক্তশূন্য হয়ে গেল বাবার

মুখ। অস্ফুটে বলে উঠলেন, ‘গড ব্লেস মি! তাই তো!’

ডাক্তার বললেন, ‘কেমন, নিজের চোখেই দেখলেন তো?’

‘কী ব্যাপার?’ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘না, না, তেমন কিছু নয়–শুধু ছোট একটি নীল দাগ–তোমার কড়ে আঙুলের ডগার সমান।’ বাবার দিকে ফিরলেন ডাক্তার। ‘প্রশ্ন হচ্ছে এখন আমাদের কী করা উচিত।’

কম্পিত গলায় প্রশ্ন করলাম, ‘কোন বিপদের ভয় আছে নাকি?’

‘আশা করি সেরকম কোন আশঙ্কা নেই।’ জবাব দিলেন ডাক্তার। ‘তুমি শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবে। আচ্ছা, দমবন্ধ হওয়ার কথা যে বলছিলে সেটা কি গলার ওখানেই?’

‘জি,’ মাথা দোলালাম আমি।

‘বেশ। এবার মনে করে বলো তো–সেই সময় তুমি বিশেষ একটি শিহরণ অনুভব করেছিলে, তাই না–যেন কনকনে জলের স্রোত তোমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছিল।’

‘শুনলেন তো?’ বাবার দিকে ফিরে বললেন ডাক্তার। ‘আচ্ছা, মাদামের সঙ্গে কথা বলতে পারি?’

‘নিশ্চয়।’ বললেন বাবা।

মাদামকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সে এলে ডাক্তার বললেন, ‘আমাদের তরুণী বান্ধবীটি একটু অসুস্থ। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওকে সুস্থ করতে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে, মাদাম, এখন থেকে লরাকে এক মুহূর্তের জন্যও তোমার চোখের আড়াল করা যাবে না। আপাতত এটিই আমার নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করা খুব জরুরি।’

‘মাদাম, আমি জানি তোমার ওপর আমরা নিশ্চয় ভরসা করতে পারব,’ বললেন বাবা।

জবাবে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মাদাম।

'আর তুমি, লরা মা, তুমি কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।' বললেন বাবা। ফিরলেন ডাক্তারের দিকে। 'আরও একজন রোগী সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই, ডাক্তার। তারও লক্ষণ অনেকটা একইরকম। সেও এক তরুণী, আমাদের অতিথি। সে একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। আপনি তো সন্ধের দিকে এ পথেই ফিরবেন, তখন দয়া করে দেখে যাবেন তাকে। আর রাতের খাবারটা এখানেই সারবেন।'

'ধন্যবাদ,' বললেন ডাক্তার। 'আমি সাতটার দিকে আসব।'

ডাক্তারের সঙ্গে বাবা বেরিয়ে গেলেন। জানালা দিয়ে দেখলাম দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে পার হচ্ছেন রাস্তা। ডাক্তার তাঁর ঘোড়ায় উঠে পড়লেন। ছুটলেন পুবে, জঙ্গল অভিমুখে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক লোক এসে হাজির হলো ড্রানফেল্ড থেকে। ডাকপিয়ন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাবার হাতে একটি চিঠি দিল।

আমি আর মাদাম যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আধঘণ্টা বাদে বাবা আমার কাছে এলেন। হাতে সেই চিঠিটি। বললেন, 'চিঠিটি দেরি করে এল। জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ লিখেছেন। তিনি আজকালকের মধ্যেই চলে আসবেন।'

বাবা চিঠিটি আমাকে দিলেন। তবে তাঁর মুখটি কেমন গম্ভীর। জেনারেলের মত অতিথি এলে তিনি খুশিই হয়ে ওঠেন। আজ তাঁকে খুশিখুশি লাগছে না। বরং মনে হলো জেনারেল না এলেই খুশি হতেন বাবা। তবে মনের ভাব প্রকাশ করলেন না তিনি।

আমি বাবার হাতে হাত রেখে বললাম, 'বাবা, কী হয়েছে বলবে না?'

আমার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বাবা বললেন, 'বলব।'

'ডাক্তার কী বললেন—আমার অসুখটা খুব মারাত্মক?'

'আরে না, তিনি বললেন ঠিকমত খেয়াল রাখলে তুমি দু'এক

দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। ভাল হতো জেনারেল এখন না এসে অন্য কোন সময় যদি আসতেন। তা হলে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে তাকে অভ্যর্থনা করতে পারতে।'

'কিন্তু বলো না, বাবা, ডাক্তার ঠিক কী বলেছেন।' আমি গোঁ ধরে রইলাম।

'বললাম না তেমন কিছু বলেননি? এখন আমাকে বিরক্ত কোরো না।' বাবা কখনও এমন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। মনে হলো তিনি ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছেন। তাঁর কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে গালে আদর করে চুমু খেলেন। 'মামণি, দু'একদিনের মধ্যেই সবকিছু তুমি জানতে পারবে। এখন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না তো!'

চলে গেলেন বাবা। তবে কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরলেন। ঘোষণা করলেন তিনি কার্নস্টাইন যাচ্ছেন। বারোটার মধ্যে ঘোড়ার গাড়ি রেডি করতে বললেন। আমাকে এবং মাদামকে তাঁর সঙ্গে যেতে হচ্ছে। বাবা এক পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। কার্নস্টাইনে ছবির মত একটি জায়গায় পাদ্রী থাকেন। কারমিল্লা যেহেতু কখনও ওদিকে যায়নি, ইচ্ছে করলে সেও আমাদের সঙ্গী হতে পারে। মাদমোয়াজেলকে নিয়ে নীচে নেমে এল কারমিল্লা। সঙ্গে বনভোজন করার নানান উপকরণ। কার্নস্টাইন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের ধারে পিকনিক হবে।

বেলা বারোটার মধ্যে রেডি হয়ে আমরা দুটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসলাম। একটিতে আমি আর বাবা, অপরটিতে কারমিল্লাসহ অন্যান্যরা। ড্রব্রিজ পার হয়ে ডানদিকে মোড় নিল আমাদের গাড়ি, রাস্তাটা চলে গেছে পশ্চিমে গথিক ব্রিজ বরাবর। তারপর জনমানবশূন্য গাঁ এবং কার্নস্টাইনের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ।

অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝ দিয়ে আমরা চলেছি। রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট পাহাড়, ঘন জঙ্গল। রাস্তা হঠাৎ করে

বাঁক নিয়ে পাহাড়ি ঢাল অভিমুখে চলে গেছে। এরকম একটি রাস্তায় মোড় নিতে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এক ভৃত্যকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। তাঁর জিনিসপত্র পেছন পেছন বহন করে নিয়ে আসছে ভাড়া করা ওয়াগন।

আমাদেরকে দেখে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন জেনারেল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে তাঁকে সহজেই আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি করানো গেল। তিনি তাঁর ভৃত্যকে ঘোড়া নিয়ে দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

দশ

প্রায় দশ মাস বাদে জেনারেলের সঙ্গে দেখা। অনেক শুকিয়ে গেছেন তিনি। চেহারার সদয়ভাবটা দূর হয়ে গিয়ে সেখানে ভর করেছে বিষাদ এবং দুশ্চিন্তা। ঘন ঝোপের মত ভুরুর নীচে গভীর নীল চোখজোড়ায় ফুটে আছে কাঠিন্য। মনে হলো শুধু বিষাদই নয়, চেহারায় একই সঙ্গে আক্রোশও ফুটে উঠেছে।

কিছুদূর এগোবার পরে জেনারেল তাঁর শোকের গল্প বলতে লাগলেন। বলতে বলতে ক্রমে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। যে নারকীয় কাণ্ডের ফলে প্রিয় ভাতিঝির মৃত্যু হয়েছে সে কথার উল্লেখ করে বললেন, 'জানি না ঈশ্বর কী করে এতবড় অন্যায় ঘটতে দিলেন।'

বাবা তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে বললেন।

'আমি তোমাকে সবই বলব,' বললেন জেনারেল। 'তবে মনে হয় না আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে।'

'বিশ্বাস হবে না কেন?' জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'কারণ,' তিক্ত গলায় বললেন তিনি, 'তোমার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যায় না এমনকিছু তুমি বিশ্বাস কর না। আমিও করতাম না। তবে পরে মত বদলেছি।'

'বলেই দেখ না,' বললেন বাবা। 'তুমি যেমনটি ভাবছ অতটা গোঁড়া আমি নই। তা ছাড়া আমি জানি আমার মতই তুমি প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস কর না।'

জেনারেল চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তোমরা তো কার্নস্টাইনের ধ্বংসাবশেষের দিকে যাচ্ছ, না? কাকতালীয়ই বলা যায়, কারণ আমিই তোমাকে অনুরোধ করতাম ওখানে নিয়ে যেতে। এর বিশেষ কারণ আছে। ওখানে একটা ছোট গির্জার ধ্বংসস্তূপ আছে না? লুপ্ত পরিবারটির অনেক কবরও আছে ওখানে।'

'হ্যাঁ, আছে,' জবাব দিলেন বাবা। 'তুমি কি ওসব কিনে নেবে ভাবছ?'

বাবা হালকা গলায় কথাটি বললেও জেনারেল বিষয়টি হালকাভাবে নিলেন না। ভাবলেন বাবা তাঁর সঙ্গে মশকরা করছেন। তাঁর চেহারা আরও থমথমে হয়ে গেল, তিনি রেগেও গেলেন।

'না, ঠিক তার উল্টো,' রুক্ষ গলায় বললেন জেনারেল। 'আমি ওখানে কিছু লোকের কবর খুঁড়ব। আশা করি ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার এ পাপ পুণ্যে রূপান্তরিত হবে। এর ফলে পৃথিবী কয়েকটা দানবের কবল থেকে রেহাই পাবে। ভাল মানুষেরা খুনীর আতংক থেকে নির্ভয়ে ঘুমাতে পারবে। বন্ধু, তোমাকে আমি আশ্চর্য দু'একটি গল্প শোনাব যার কথা কয়েক মাস আগেও বিশ্বাস

করতাম না।'

বাবা তাঁর বন্ধুর দিকে তাকালেন, তবে এবারে সন্দেহ নয়, চাউনিতে ফুটল সতর্কতা।

'কার্নস্টাইনদের পরিবার একশো বছরের বেশি হলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার প্রয়াত স্ত্রীও তার মায়ের দিক থেকে এ পরিবারের মেয়ে ছিল। তবে তাদের পদবী কেউ ব্যবহার করত না। দুর্গ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, গ্রামটাও পরিত্যক্ত। গত পঞ্চাশ বছরে ওখানকার কোন বাড়িতে উনুন ধরানো হয়নি।'

'তা বটে,' বললেন জেনারেল। 'তোমার সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি যা জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তুমি তো আমার ভাইঝিকে দেখেছ। ওর মত সুন্দরী মেয়ে খুব কমই ছিল। কিন্তু মাত্র তিন মাস আগে মেয়েটা আমার মারা যায়।'

'বেচারী! ওকে শেষবার যখন দেখি, রূপের ছটায় ঝলমল করছিল মেয়েটা,' বললেন বাবা। 'কিন্তু ওর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি যে কী শোক পেয়েছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি জানি ওর মৃত্যু তোমার জন্য কী নিদারুণ শকের ব্যাপার ছিল।'

জেনারেলের হাত ধরে তিনি মৃদু চাপ দিলেন। বুড়ো সৈনিকের চোখে জল। তিনি অশ্রু গোপনের চেষ্টা না করে ধরা গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের বন্ধুত্ব। জানতাম তুমি আমার এ খবরটা শুনে খুব দুঃখ পাবে। আমি আমার ভাইঝিকে হারিয়ে সন্তানহারা হয়ে পড়েছি। ও ছিল আমার জীবনের সকল আনন্দের উৎস। কিন্তু ও নেই, আমার জীবন থেকে সমস্ত সুখ-শান্তিও চলে গেছে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচব না। তবে মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের দয়ায় আশা করি আমার মেয়ের হত্যাকারী শয়তানদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারব।

শয়তান হত্যা করে মানুষের মঙ্গল করতে পারব।'

'তুমি আমাকে সবকথা খুলে বলবে বলেছ। এখন বলো।' বললেন বাবা।

আমরা ড্রানস্টন রোডের ধারে চলে এসেছি। জেনারেল এ পথ ধরেই এসেছেন। এখান থেকে রাস্তা সোজা চলে গেছে কার্নস্টাইনের দিকে।

'এখান থেকে গন্তব্য কত দূর?' সামনের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইলেন জেনারেল।

'আর মাত্র আধা লীগ দূরে,' জবাব দিলেন বাবা। 'নাও, এবারে তোমার গল্প শুরু করো।'

এগারো

'আমার ভাইঝি তোমার মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল,' শুরু করলেন জেনারেল। 'এদিকে আমার পুরানো বন্ধু কাউন্ট কার্সফিল্ড আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর দুর্গ কার্নস্টাইনের অপর প্রান্তে, ছয় লীগ দূরে। গ্রাণ্ড ডিউক চার্লসের অভ্যর্থনা উৎসবে যোগ দিতে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেন।

'তাঁর আতিথেয়তার তুলনা হয় না। তিনি যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়েছেন। দারুণ রাজকীয় ব্যবস্থা। কত রঙ বেরঙের আলো সেখানে, আর কত যে বাজি পোড়ানো হয়েছিল। অমন দৃশ্য প্যারিসেও দেখা যায় না। আর মিউজিক–মিউজিকের

কথা কী বলব তোমায়! তুমি তো জানোই গানের প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। বোধকরি ইউরোপের সবচেয়ে সেরা যন্ত্রীদলকে আনা হয়েছিল ওই অনুষ্ঠানে।

'বাজি পোড়ানোর মহোৎসব শেষ হলে বল নাচ শুরু হলো। আমরা সবাই বলরুমে চলে আসি। বল নাচের সময় সবাই মুখোশ পরে ছিল। মুখোশ পরা বল নাচ যে কত চমৎকার হয় তুমি তো জানোই। আর ওখানকার বল ডান্সের মত চমৎকার আয়োজন আমি আগে কখনও দেখিনি। সমাজের গণ্যমান্য, অভিজাত এমন কেউ নেই যিনি সেদিন ওখানে আসেননি।

'আমার ভাইঝিকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। তবে ও কোন মুখোশ পরেনি। আনন্দ আর উত্তেজনায় ঝলমল করছিল সে। ওখানে এক খুব সুন্দরী তরুণীকে আমার চোখে পড়ে, দারুণ সেজেছিল সে, তবে মুখে ছিল মুখোশ, আমার ভাইঝির দিকে এমনভাবে বারবার তাকাচ্ছিল যে রীতিমত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল আমার কাছে। আমি ওই মেয়েটিকে বিকেলের দিকে একবার হলরুমে কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিলাম। প্রাসাদের জানালার নীচের টেরাসে, আমাদের কাছাকাছিই হেঁটে বেড়াচ্ছিল। আরেক মহিলাকে দেখলাম, তাঁরও মুখোশ পরা, গায়ে দামী পোশাক, দেখে মনে হয় অতি উঁচুবংশের কেউ, তরুণীকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। বোধকরি মেয়েটির অভিভাবিকা ধরনের কিছু হবেন। মহিলার মুখে মুখোশ না থাকলে দেখতে পেতাম তিনি আমার ভাইঝির ওপর লক্ষ রাখছেন। এখন আমি জানি তিনি তা-ই করছিলেন।

'আমরা একটি সেলুনে ঢুকি। আমার ভাইঝি নেচে ক্লান্ত হয়ে দরজার কাছের একটি চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। যে দুই মহিলার কথা এইমাত্র বললাম তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। কমবয়েসী মেয়েটি আমার ভাইঝির

পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে থাকলেন আমার পাশে।

'মুখোশপরা মহিলাটি আমার দিকে ফিরলেন, যেন আমরা বহুদিনের চেনা এভাবে আমার নাম ধরে ডেকে আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে উঠলেন। আমি তাঁর প্রতি আগ্রহবোধ করছিলাম। বললেন আমাকে নাকি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন–কখনও কোন রাজসভায়, কখনওবা সম্ভ্রান্ত কোন লোকের বাড়িতে। এবং মহিলা এমন কয়েকটি ঘটনার কথা বললেন যার কথা আমি বহু আগেই ভুলে গেছিলাম। তবে মহিলার কথা শুনে আবার আমার পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে।

'মহিলার প্রতি আমার কৌতূহল ক্রমে বেড়েই চলছিল। তবে তিনি সুকৌশলে আমার সেই কৌতূহল এড়িয়ে যান। আমার জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন, ইনি কীভাবে তা জানতে পারলেন ভেবে আমি বিস্মিত।

'সেই তরুণী মেয়েটি, যাকে তার মা মিল্লার্কা বলে সম্বোধন করছিল, সে আমার ভাইঝির সঙ্গে ততক্ষণে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছে।

'নিজের সে পরিচয় দিল এই বলে তার মা নাকি আমার অনেকদিনের পরিচিত। মেয়েটি আমার ভাইঝির সঙ্গে বহুকালের পরিচিত বান্ধবীর মত কথা বলছিল।

'সে আমার ভাইঝির ড্রেসের প্রশংসা করছিল, তার রূপের প্রশংসা করছিল। বলরুমের লোকজন নিয়ে সে ঠাট্টা-তামাশা করল, আমার ভাইঝির কৌতুক শুনে হা হা করে হাসল। অল্পক্ষণের মধ্যে ওদের মধ্যে বেশ দোস্তি হয়ে গেল। তরুণী কথা বলতে বলতে তার মুখোশ খুলে ফেলে। দেখতে পাই তার আশ্চর্য সুন্দর মুখশ্রী। এত সুন্দর মেয়ে না আমি কোনদিন দেখেছি না আমার ভাইঝি। মনে হচ্ছিল প্রথম দর্শনেই সে মেয়েটির প্রেমে

পড়ে গেছে।

'আমি মুখোশ পরা বয়স্কা মহিলাটিকে বললাম, "আপনি আসলে আমাকে দারুণ চমকে দিয়েছেন। দয়া করে মুখোশটি খুলবেন কি? তা হলে দেখতে পেতাম কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছি।"

"'এ আপনার বড্ড অন্যায় অনুরোধ," বললেন মহিলা। "তা ছাড়া কী করে বুঝলেন মুখোশ ছাড়া আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন? আর আমার মুখ দেখেই বা আপনার কী লাভ?"

"'লাভ-লোকসানের কথা পরে," বললাম আমি। "বৃদ্ধার সাজ সাজলেও শরীর দেখে কিন্তু মনে হয় না আপনি বয়স্কা কেউ।"

"'আপনার সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে," বললেন মহিলা। "আমার মেয়ে মিল্লার্কাকে দেখুন। আমার সত্যি বয়স বেড়েছে। আমি এখন আর তরুণী নেই।"

"'তা হলে অন্তত এটুকু বলুন আপনি ফরাসী নাকি জার্মান। আপনি তো দুই ভাষাতেই দারুণ স্বচ্ছন্দ।"

"'তা আপনাকে বলা যাবে না, জেনারেল। এটা বরং সারপ্রাইজই থাকুক।"

"'বেশ, তা হলে আপনাকে কী বলে সম্বোধন করব? মাদাম লা কমতেস?"

'এ কথায় মহিলা হেসে উঠলেন। বুঝতে পারছিলাম এ প্রশ্নটিও ইনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এমন সময় মুখোশধারী এক লোক তাঁর কাছে এল। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য চেহারা। মরা মানুষের মত দেখতে। লোকটা মুখোশ পরেনি। সে মহিলাকে অনেকখানি মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে বলল, "মাদাম লা কমতেসের সঙ্গে ।৮ জরুরি কিছু কথা বলতে পারি?"

'মহিলা চট করে তার দিকে ফিরলেন। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে

লোকটিকে চুপ করে থাকতে ইশারা করলেন। আমাকে বললেন, "আমি এক্ষুণি ফিরছি, জেনারেল। তখন আবার কথা হবে।"

'এই বলে তিনি কালো পোশাক পরা লোকটিকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। দু'জনে ফিসফিস করে কী যেন বলল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে। আমি ওদেরকে আর দেখতে পেলাম না।

'ভদ্রমহিলা কোথাকার কাউন্টেস হতে পারেন ভেবে পেলাম না। আমি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলব ভাবছিলাম, এমন সময় তিনি ফিরে এলেন। সঙ্গে সেই লোক।

'লোকটা বলল, "গাড়ি রেডি হলেই আমি মাদাম লা কমতেসকে খবর দিচ্ছি।"

'এই বলে সে বাউ করে চলে গেল।

বারো

'"মাদাম লা কমতেসের সঙ্গে তা হলে আপাতত দেখা হচ্ছে না," আমি মৃদু বাউ করে বললাম।

'"হয়তো আগামী কয়েক সপ্তাহ দেখা না-ও হতে পারে," বললেন ভদ্রমহিলা। "আপনি কি এখন আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

'আমি মাথা নাড়লাম।

'"চিনতে পারবেন," বললেন তিনি। "তবে এখন নয়, পরে।

এখনই আমি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছি না। আমি সপ্তাহ তিনেক বাদে আপনার দুর্গের পাশ দিয়েই যাব। তখন ঘণ্টা দুই আপনার সঙ্গে সময় কাটাব। অনেক স্মৃতিচারণ হবে। তবে এ মুহূর্তে আমাকে বিদায় নিতেই হচ্ছে। কারণ হঠাৎ একটি খবর এসেছে। প্রায় একশো মাইল দূরের একটা জায়গায় যাচ্ছি। তবে আপনাকে একটি অনুরোধ করব। আমার অনুপস্থিতির সময়টুকুতে আমার মেয়ের ওপর একটু খেয়াল রাখবেন। বেচারী শিকারে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে খুব ব্যথা পেয়েছে। এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। ডাক্তার ওকে কিছুদিন দীর্ঘ কোন যাত্রায় যেতে মানা করেছেন। আর আমি তো এখন দিনরাত চলার ওপর থাকব। জীবন-মরণ সমস্যা। এর কথা ফিরে এসে পরে বলব আপনাকে।"

'স্বল্প পরিচয়েই এরকম একটি অনুরোধ আমার কাছে একটু অস্বাভাবিকই ঠেকল। তবে কাউন্টেস এমনভাবে অনুরোধ করলেন যে ফেলতেও পারলাম না। এদিকে আমার ভাইঝিও এসে নিচু গলায় পীড়াপীড়ি করতে লাগল আমি যেন তার নতুন বান্ধবী মিল্লার্কাকে আমাদের বাড়ি যেতে বলি। মিল্লার্কা যেতে রাজি, শুধু ওর মা রাজি হলেই হলো।

'অন্য সময় হলে আমি আমার ভাইঝিকে বলতাম একটু সবুর করতে। কারণ ওদের পরিচয়ই তো এখন পর্যন্ত ভাল করে জানি না। তবে চিন্তা করার অবকাশই পেলাম না। কারণ দুই নারীর অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হলো না।

'কাউন্টেস তাঁর মেয়েকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। মেয়ে থমথমে মুখে মায়ের কথা শুনল। তিনি বললেন হঠাৎ করেই তাঁকে জরুরি একটা কাজে চলে যেতে হচ্ছে। যে ক'দিন তিনি বাইরে থাকবেন, সে ক'দিন আমার জিম্মায় ওকে দিয়ে যাচ্ছেন। সে সঙ্গে এ কথাও যোগ করলেন যে আমি তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

'কালো পোশাক পরা লোকটি ফিরে এল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে আবার শ্রদ্ধা জানাল। তার আচরণ দেখে মনে হলো কাউন্টেস হোমরাচোমরা বিরাট কেউ। যাওয়ার আগে কাউন্টেস শেষ অনুরোধ করলেন, তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তাঁর থেকে বেশি কিছু জানার চেষ্টা যেন না করি। এবং তাঁর কন্যাও তাঁর পরিচয় গোপন রাখবে।

'তিনি মেয়েকে ফিসফিস করে দু'একটি কথা বলে, তার গালে দু'বার দ্রুত চুমু খেয়ে লোকটির সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

'"পাশের কামরায়," বলল মিল্লার্কা, "একটা জানালা আছে। ওখান থেকে হলঘরের দরজা দেখা যায়। আমি মাকে ওখান থেকে বিদায় জানাব।"

'আমরা মিল্লার্কাকে নিয়ে সেই জানালার ধারে গেলাম। বাইরে তাকাতে দেখি পুরানো আমলের বেশ সুন্দর একটি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। সঙ্গে ফুটম্যানসহ নানান লোকজন। কালো পোশাক পরা লোকটিকে দেখতে পেলাম আমরা। হাতে মখমলের ভারী আলখেল্লা। সে কাউন্টেসের কাঁধে ওটা চাপিয়ে দিয়ে মাথার ওপর হুড তুলে দিল। কাউন্টেস লোকটির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, নিজের হাত দিয়ে তার হাত স্পর্শ করলেন। ক্যারিজের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে লোকটি মৃদু নড করল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

'"মা চলে গেল," দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিল্লার্কা। "কিন্তু মুখ তুলে একবার তাকালও না।"

'"কাউন্টেস ওঁর মুখোশ খুলে ফেলেছেন। হয়তো তিনি তাঁর চেহারা দেখাতে চাননি," বললাম আমি। "তা ছাড়া তিনি কী করে জানবেন তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছ।"

'মেয়েটি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকাল। ওর

অপূর্ব মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে আমার মায়াই হলো। মেয়েটি মুখে আবার মুখোশ পরে নিল। তারপর আমার ভাইঝির সঙ্গে চলে গেল কনসার্টে অংশ নিতে।

'মিল্লার্কা ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ওকে আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। বল নাচ চলল ভোররাত পর্যন্ত। গ্রাণ্ড ডিউক তাঁর অতিথিদের নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত বেশ নাচানাচি করলেন।

'আমরা ভিড়ে ভর্তি সেলুনে ঢুকেছি, আমার ভাইঝি মিল্লার্কার খোঁজ করল। আমি ভেবেছি মেয়েটি ওর সঙ্গেই আছে। আর ভাইঝি ভেবেছে মিল্লার্কা আমার সঙ্গে আছে।

'অনেক খোঁজ চলল মিল্লার্কার। কিন্তু কোথাও ওর টিকিটিরও চিহ্ন নেই। একটা মেয়েকে চিনি না, জানি না, হুট করে তার দেখভালের দায়িত্ব নেয়াটা মূর্খামি হয়ে গেছে। কাউকে বলতেও পারছি না যে সদ্যবিদায়ী এক কাউন্টেসের নিখোঁজ তরুণী মেয়ের অনুসন্ধান করছি। কারণ ভদ্রমহিলা পইপই করে বলে গেছেন কাউকে যেন তাঁদের কথা না বলি।

'ভোর হলো। বেড়ে চলল বেলা। আমি হাল ছেড়ে দিলাম। আর কোথায় খুঁজব মিল্লার্কাকে? ওকে খুঁজে পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় বেলা দুটোর দিকে তার খবর মিলল।

'এক চাকর আমার ভাইঝির ঘরের দরজায় নক করে বলল এক তরুণী নাকি তার কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে জানতে চেয়েছে জেনারেল ব্যারন স্পিয়েলসডর্ফ ও তাঁর মেয়েকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তার মা নাকি তাকে জেনারেলের জিম্মায় রেখে গেছেন।

'কোনই সন্দেহ রইল না এ হলো হারিয়ে যাওয়া মিল্লার্কা। সে-ই আমাদের খোঁজ করছে। তবে ও যদি সত্যি হারিয়ে যেত তা হলেই বরং ভাল হতো।

'অকস্মাৎ নিখোঁজ হওয়ার জবাবদিহি করতে গিয়ে মিল্লার্কা আমার ভাইঝিকে বলল, সে আমাদের খোঁজে হাউসকীপারের ঘরে গিয়েছিল। তবে ওখানে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

'ওইদিনই মিল্লার্কা আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলে এল। আমার ভাইঝি খুব ভাল একটি বান্ধবী পেয়েছে ভেবে আমি তখন খুব খুশি হয়েছিলাম।

তেরো

'কিন্তু কিছুদিন না যেতেই শুরু হলো নানান ঝামেলা। মিল্লার্কা অনুযোগ করল তাকে চরম অবসাদে পেয়ে বসেছে। অসুস্থতার পর থেকে এ দুর্বলতা তাকে গ্রাস করে আছে। সে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার অনেক পরেও ঘুম থেকে ওঠে না। সে সবসময় ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমায়। চাকরানি তার সাজসজ্জায় সাহায্য করতে না আসা পর্যন্ত দরজা খোলে না। জানা গেল মাঝে মাঝে ভোরে তাকে তার ঘরে পাওয়া যায় না। ভোরবেলায় দুর্গের জানালা দিয়ে দেখা গেছে সে নিশিপাওয়া মানুষের মত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পুব দিকে হেঁটে চলেছে। আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না মিল্লার্কা রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে। তবে এতেও সমস্যার সমাধান হলো না। কারণ দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। তা হলে সে কী করে বাইরে যায়? জানালা কিংবা দরজা না খুলে তো বেরুনো যাবে না।

‘এসব সমস্যার মধ্যে আবার আরেকটি দুশ্চিন্তা এসে হাজির হলো।

‘আমার ভাইঝি ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল তার। ব্যাপারটি এমনই রহস্যময় এবং ভয়ানক যে আমি রীতিমত আতংকিত হয়ে পড়লাম।

‘প্রথম প্রথম সে ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখতে লাগল। মিল্লার্কার মত দেখতে একটি ছায়ামূর্তি তার বিছানায় উঠে আসছে। কখনও জানোয়ারের চেহারার কেউ তার বিছানার চারপাশে হেঁটে বেড়ায়। তার মনে হয় বুকের ওপর দিয়ে বরফশীতল জলরাশি বয়ে যাচ্ছে। আবার পরে কখনও মনে হতো গলার নীচে কেউ সূচ ফোটাচ্ছে। কয়েক রাত যাওয়ার পরে তার দমবন্ধ করা অনুভূতি হতে থাকে। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।’

জেনারেলের এই কাহিনির প্রতিটি শব্দ আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আমরা এ মুহূর্তে ঘাসে ছাওয়া একটি রাস্তা ধরে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। এটি সেই গ্রাম যেখানে গত অর্ধশতকে কোন বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া দেখা যায়নি।

আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন জেনারেলের গল্পের সঙ্গে আমাদের বাড়ির কারমিল্লার অদ্ভুত সাদৃশ্য চিন্তা করে আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম?

আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামটিতে ঢুকে পড়লাম। ভাঙা দুর্গের টাওয়ার এবং বুরুজ ঘেরা ছাদ দেখতে পাচ্ছি, এখানে-ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গাছ।

দুরুদুরু বুকে গাড়ি থেকে নামলাম আমি। তারপর নীরবে এগোলাম দুর্গের সিঁড়ির দিকে। এখানে বড় বড় ঘর আছে, রয়েছে পেঁচানো সিঁড়ি এবং অন্ধকার সব করিডর।

‘এটি একসময় কার্নস্টাইনদের প্রাসাদ ছিল,’ বললেন বুড়ো জেনারেল। বিরাট একটি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন নীচের

গাঁয়ের দিকে। গ্রামের পরেই প্রশস্ত, বিরাট বনভূমি। 'পরিবারটি ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী স্বভাবের। তাদের রক্তমাখা ইতিহাস লেখা আছে এখানে।' বলে চললেন তিনি। 'তবে মৃত্যুর পরেও যে তাদের রক্ততৃষ্ণা মেটেনি সেটাই বিশ্বাস করা কঠিন। এটা হলো কার্নস্টাইনদের চ্যাপেল। ওই যে ওখানে।'

তিনি গথিক ভবনটির ধূসর দেয়ালে ইঙ্গিত করলেন। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ঢাল থেকে অল্প দূরে। 'কাঠুরের কুড়ালের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন,' বললেন জেনারেল। 'নিশ্চয় লাকড়ি জোগাড় করতে এসেছে। আমি যে খবরের জন্য এসেছি কাঠুরে হয়তো সে ব্যাপারে তথ্য দিতে পারবে। কার্নস্টাইনের কাউণ্টেস মির্কাল্লার কবরটার সন্ধান চাই আমি। স্থানীয় লোকজন বংশপরম্পরায় বড় বড় পরিবারের খবর রাখে।'

'মির্কাল্লা, মানে কাউণ্টেস কার্নস্টাইনের একটি ছবি আছে আমাদের বাড়িতে,' বললেন বাবা। 'তুমি ওটা দেখবে?'

'সেজন্য অনেক সময় আছে,' জবাব দিলেন জেনারেল। 'আমি আসল মানুষটিকে আগেই দেখেছি। আর এখানে এসেছি চ্যাপেলটি খুঁজে দেখার জন্য।'

'কী বলো! কাউণ্টেস মির্কাল্লাকে তুমি দেখেছ!' চেঁচিয়ে উঠলেন বাবা। 'সে তো একশো বছরেরও আগে মারা গেছে।'

'তবে এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়,' বললেন জেনারেল।

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, জেনারেল।' বললেন বাবা।

গথিক চার্চের ভারী খিলানের পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে জেনারেল বললেন, 'আর ক'দিনই বা বাঁচব! তবে মরার আগে আমার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আর তা হলো প্রতিশোধ নেয়া। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখনও তা সম্ভব হতে পারে।'

'কীসের প্রতিশোধের কথা বলছ তুমি?' অবাক হলেন বাবা।

'শয়তানীটার মুণ্ডু কেটে ফেলাই হবে সেই প্রতিশোধ,' ভয়ঙ্কর গলায় বললেন জেনারেল। সজোরে পা ঠুকলেন তিনি। পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল ফাঁপা ধ্বংসস্তূপে। সে সঙ্গে মুঠো শক্ত করে এমনভাবে হাত দোলালেন যেন হাতে কুঠার ধরে আছেন।

'কী!' হাঁ হয়ে গেলেন বাবা। 'তুমি ওর মাথা কেটে ফেলবে?'

'হ্যাঁ। কুড়ুল, কোদাল বা ওরকম কোন অস্ত্র যা দিয়ে হত্যাকারীর গলাটা এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করা যায়।' রাগে কাঁপছেন তিনি। সামনে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমার মেয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ কড়িকাঠটিতে বসে বিশ্রাম নিক। আমি অল্প কথায় আমার গল্প শেষ করছি।'

বেঞ্চি আকৃতির চওড়া এক টুকরো কাঠ পড়ে ছিল মাটিতে। আমি খুশি মনে ওর ওপর বসলাম। জেনারেল গিয়ে কাঠুরেকে ডেকে আনলেন। তার হাতে কুঠার। লোকটি বয়সে প্রৌঢ়।

কবরগুলো সম্পর্কে সে তেমন তথ্য দিতে পারল না। তবে জঙ্গলে এক বুড়ো আছে, বলল সে, বনরক্ষক, এ মুহূর্তে মাইল দুয়েক দূরের প্রিস্টের বাড়িতে রয়েছে, সে কার্নস্টাইন পরিবারের প্রতিটি কবর চেনে। বলল, তাকে একটা ঘোড়া দিলে আধঘণ্টার মধ্যে বনরক্ষককে নিয়ে চলে আসতে পারবে।

বাবা কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ জঙ্গলে তুমি কতদিন ধরে কাজ করছ?'

'আমি অনেকদিন ধরেই এখানে কাঠুরের কাজ করে আসছি।' আঞ্চলিক ভাষায় জবাব দিল সে। 'বনরক্ষকের অধীনে। আমার বাবাও তাই করত। আমরা বংশানুক্রমে এ কাজই করে আসছি। এ গাঁয়ের একটি বাড়িও নেই যেখানে আমাদের বংশধররা বাস করতেন না।'

'গ্রামটা এভাবে পরিত্যক্ত হয়ে গেল কীভাবে?' জানতে

চাইলেন জেনারেল।

'এখানে ভ্যাম্পায়ারের অনেক উৎপাত হয়েছিল, স্যর। তাদের অনেকেরই কবরের হদিশ পেয়ে তাদের মাথা কেটে বুকে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ততদিনে অনেক গ্রামবাসী তাদের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়।

'কিন্তু এভাবে অনেক ভ্যাম্পায়ার হত্যা করার পরেও গ্রাম ভ্যাম্পায়ার মুক্ত হতে পারেনি,' বলে চলল সে। 'তবে মোরাভিয়ার এক ভদ্রলোক, ঘটনাক্রমে এ অঞ্চলে তিনি ঘুরতে এসেছিলেন, সব শুনে ঠিক করেন তিনি সমস্ত ভ্যাম্পায়ার নিকেশ করবেন। তিনি ছিলেন একজন ভ্যাম্পায়ার শিকারী। নিজের দেশেও অনেক ভ্যাম্পায়ার হত্যা করেছেন। এক পূর্ণিমার রাতে, সূর্যাস্তের খানিক বাদে তিনি এই চ্যাপেলটির টাওয়ারে উঠে যান। ওখান থেকে নীচে কবরখানাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেখান থেকে তিনি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ দেখতে পান একটা ভ্যাম্পায়ার উঠে আসছে কবর থেকে। সে কবর থেকে বেরিয়ে এসে গায়ের লিনেনের কাপড়টি খুলে রেখে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যায় তার রক্ততৃষ্ণা মেটাতে।

'তা দেখে ভদ্রলোকটি টাওয়ার থেকে নেমে আসেন। তারপর ভ্যাম্পায়ারটির কাপড়খণ্ডটি তুলে নিয়ে উঠে যান গম্বুজের ওপর। ভ্যাম্পায়ার কাজ শেষে ফিরে এসে দেখে তার পরনের কাপড়খানা অদৃশ্য। সে মোরাভিয়ান ভদ্রলোকের ওপর দারুণ চটে যায়। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। মোরাভিয়ান ভদ্রলোক তখন হাত ইশারায় ভ্যাম্পায়ারটিকে কাছে ডাকেন। ভ্যাম্পায়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। বুরুজের ধারে পৌঁছাতেই ভ্যাম্পায়ারের খুলিতে তরবারির কোপ বসিয়ে দেন মোরাভিয়ান। তাকে লাথি মেরে নীচে ফেলে দেন এবং নিজেও নেমে গিয়ে তার মুণ্ডু কেটে ফেলেন। পরদিন তিনি ভ্যাম্পায়ারের শরীরটা গ্রামবাসীদের দিয়ে

দেন। তারা পিশাচটার বুকে গোঁজ বসিয়ে তাকে পুড়িয়ে ফেলে।

'কাউণ্টেস কার্নস্টাইন মির্কাল্লার কবর সরিয়ে ফেলার অনুমতি পেয়েছিলেন মোরাভিয়ান। তিনি তাই করেন। কিছুদিন পরে সেই লাশের কথা লোকে বেমালুম ভুলে যায়।'

'কবরটা কোথায় ছিল তুমি বলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

মাথা নাড়ল লোকটি। 'এখন কেউ তা বলতে পারবে না। তা ছাড়া মির্কাল্লার লাশ সত্যি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারেও অনেকে সন্দিহান।'

দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে সে চলে গেল। জেনারেল আবার তাঁর গল্প শুরু করলেন।

চোদ্দ

'এদিকে আমার ভাইঝির শরীরের অবস্থা দিনদিন আরও খারাপ হচ্ছিল। ডাক্তার তার কোন কাজেই আসছিলেন না। শেষে তিনি গ্রাটজের এক চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। ইনি নাকি তাঁর চেয়ে ভাল চিকিৎসক। দু'জনে মিলে পরামর্শ করে কোন ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছে তাঁদের। সেই ডাক্তারটি এলেন কয়েক সপ্তাহ পরে। তিনি লোকটি ভাল, দয়ালু এবং শিক্ষিতও বটে। মেয়েটিকে দেখার পরে তাঁরা কথা বলার জন্য লাইব্রেরি ঘরে গেলেন। আমি পাশের ঘরে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন

তাঁরা ডাকবেন সেজন্য। কিন্তু শুনতে পেলাম দু'জনে মিলে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের গলা উচ্চ থেকে ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। তখন আমি গেলাম সেখানে। দেখি গ্রাটজের বৃদ্ধ চিকিৎসক যা বলছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীটি বিদ্রূপের সঙ্গে তার উত্তর দিচ্ছেন। আমাকে দেখে তাঁদের তর্ক বন্ধ হলো।

"'স্যর,'' প্রথম চিকিৎসক বলে উঠলেন, "ওনার ধারণা আপনার একজন জাদুকরের প্রয়োজন, ডাক্তার নয়।''

'শুনে তেতে উঠলেন গ্রাটজের বৃদ্ধ চিকিৎসক। "এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি অন্য সময়ে বলব। তবে দুঃখিত, জেনারেল, আমার চিকিৎসা নৈপুণ্য এবং জ্ঞান আপনার ভাইঝির ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসবে না। তাই আমি আপনার কাজে আসে এমন একটা প্রস্তাব করতে চাই।''

'অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তিনি একটা টেবিলে বসে লিখতে শুরু করলেন। দুই ডাক্তারের সাক্ষাৎকার কোন কাজেই এল না দেখে হতাশ হয়ে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম।

'বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটছি, দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই গ্রাটজের ডাক্তার ধরে ফেললেন আমাকে। বললেন এভাবে পেছন পেছন আসার জন্য তিনি দুঃখিত, তবে কিছুই না করে চলে যেতে তাঁর বিবেকে বাধছে। বললেন তাঁর ভুল হয়নি, এবং আমার ভাইঝির মৃত্যু খুব কাছে, বড়জোর আর দু'একদিন আয়ু তার। তবে তার অসুখের জন্য কোন প্রাকৃতিক কারণ দায়ী নয়। আর একটা আঘাত এলেই ওর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

'ডাক্তার বললেন, "আমার বক্তব্য এখানে লিখে রেখেছি। তবে একটা শর্ত আছে। আপনি কাছাকাছি কোন পুরোহিতকে ডেকে এনে তাঁর সামনে বসে এটা পড়বেন, কোনমতেই তার আগে পড়বেন না। কারণ প্রশ্নটা জীবন-মরণের। তবে পুরোহিত না পেলে তখন পড়তে পারবেন।''

'বিদায় নেবার আগে তিনি একজনের নাম বললেন যিনি ঠিক এ বিষয়েই বিশেষজ্ঞ, চিঠিটি পড়ার পরে যেন আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি, এই বলে তিনি চলে গেলেন।

'পুরোহিত না পাওয়ায় চিঠিটা একাই পড়লাম আমি। অন্য কোন বিষয় হলে আমি সেটাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতাম। ডাক্তার লিখেছেন মেয়েটিকে ভ্যাম্পায়ার হামলা করেছে। গলার দাগগুলোর জন্য দায়ী ভ্যাম্পায়ারের কামড়। অমন দাঁত শুধু ভ্যাম্পায়ারেরই থাকে। এবং রোগীর মধ্যে যে সব লক্ষণ রয়েছে তা সবই ঐ একই কারণে। যাই হোক, ঠিক করলাম ডাক্তারের নির্দেশ মেনেই চলব।

'ড্রেসিংরুমের যে দরজা দিয়ে রোগিণীর ঘরে যাওয়া যায় সেখানে লুকিয়ে রইলাম আমি। ও যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমি একটা ছোট ফাঁক দিয়ে ওকে লক্ষ করে চললাম। রাত একটার একটু পরে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড কালো প্রাণী যেন গুড়ি মেরে বিছানার পায়ের দিকে চলে গেল আর সেখান থেকে চট করে ভাইঝির গলার কাছে পৌঁছে গেল, আর মুহূর্তের মধ্যে ফুলে উঠল।

'কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আমি যেন নিশ্চল হয়ে গেলাম। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে লাফিয়ে উঠলাম তলোয়ার বাগিয়ে ধরে। হঠাৎ করে কালো প্রাণীটি কুঁকড়ে ওর পায়ের দিকে চলে গেল। ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। দেখি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মিল্লার্কা। কী ভয়ানক ক্রূর চাউনি! সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে লক্ষ্য করে তরবারি চালালাম। কিন্তু দেখি সে চট করে দরজার কাছে চলে গেছে, অক্ষত দেহ। ভীত আমি আবার আঘাত হানলাম। কিন্তু সে ওখানে নেই, তলোয়ারের আঘাতটা গিয়ে লাগল দরজায়। অদৃশ্য হয়ে গেছে মিল্লার্কা!

'সে ভয়ঙ্কর রাতটা যে কীভাবে কাটল তা তোমাদেরকে বলে

বোঝাতে পারব না। চিৎকার চেঁচামেচিতে গোটা বাড়ি জেগে উঠেছিল। মিল্লার্কার ভূত উধাও হয়ে গেছে বটে তবে তার শিকারের অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগল। ভোর হবার আগেই সে মারা গেল।'

জেনারেল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বললাম না। বাবা একটু দূরে হেঁটে গেলেন। সমাধিস্তম্ভের গায়ে লেখা ইন্সক্রিপশন পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে সাইড চ্যাপেলের ধারের একটি দরজার কাছে চলে গেলেন। জেনারেল হেলান দিলেন দেয়ালে, হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছলেন। এমন সময় কারমিল্লা এবং মাদামের গলার স্বর শুনতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। ওরা আসছে এদিকেই।

বুড়ো জেনারেল মাটিতে তাকিয়ে আছেন, ভাঙা একটি মনুমেন্টের ভিতের ওপর হাত।

সরু, ঢেউ খেলানো একটি দরজা দিয়ে ছায়াময় চ্যাপেলে প্রবেশ করল কারমিল্লা।

ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠলাম আমি, সিধে হলাম। হাসিমুখে কথা বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ বুড়ো মানুষটা চিৎকার করে কাঠুরের কুঠারটি বাগিয়ে ধরে তেড়ে গেলেন কারমিল্লার দিকে। জেনারেলকে দেখে ভয়ঙ্কর একটা পাশবিক ভাব ফুটে উঠল কারমিল্লার চেহারায়। মুহূর্তে বীভৎস এবং বিকট একটা রূপ ধারণ করল সে, কুঁজো হয়ে পিছিয়ে গেল কদম। আমি চিৎকার দেয়ার আগেই জেনারেল সর্বশক্তি দিয়ে কোপ মারলেন কারমিল্লার গায়ে। সে নিচু হয়ে এড়িয়ে গেল আঘাত, চট করে চেপে ধরল জেনারেলের কব্জি। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন বৃদ্ধ, কী অসীম শক্তি কারমিল্লার গায়ে! জেনারেলের হাত থেকে কুঠার পড়ে গেল। পরমুহূর্তে মেয়েটি গায়েব!

'কোথায় গেলেন মাদমোয়াজেল কারমিল্লা?' মাদাম জিজ্ঞাসা

করল।

আমি বললাম, 'জানি না, ওই দরজা দিয়ে বোধহয় চলে গেছে।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আমি তো ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

তখন মাদাম 'কারমিল্লা', 'কারমিল্লা' বলে অনেকবার চিৎকার করে ডাকল।

জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, 'ও বুঝি কারমিল্লা বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'হুম। ও-ই হলো মিল্লার্কা, বহু আগে যার নাম ছিল কাউন্টেস কার্নস্টাইন মির্কাল্লা। চলো এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে চলে যাই। পুরোহিতের বাড়িতে যাব। তোমরা আগে আগে যাও। আমরা আসা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করবে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেক না। তোমার কারমিল্লাকে এখানে আর কখনও দেখতে পাবে না।'

পনেরো

জেনারেলের কথা শেষ না হতেই একজন লোক ঘরে ঢুকলেন। এমন অদ্ভুত মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বেশ লম্বা, রোগাটে গড়ন, একটু কুঁজো হয়ে ঝুঁকে আছেন সামনের দিকে, কাঁধজোড়া উঁচু, পরনে কালো পোশাক। তাঁর মুখখানা বাদামী, মাথায় অদ্ভুত

আকারের একটি হ্যাট, লম্বা লম্বা চুল ঝুলে আছে কাঁধের ওপর। চোখে সোনার চশমা। হাঁটেন ধীর গতিতে। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করছেন, তারপর আবার তাকাচ্ছেন মাটিতে। লম্বা দু'খানা হাত ঝুলে আছে শরীরের দু'পাশে। মুখে মিষ্টি হাসি।

জেনারেল তাঁকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে আসুন আসুন। আপনাকেই তো এই মুহূর্তে আমাদের দরকার ছিল। প্রিয় ব্যারন, আপনাকে দেখে যে কী খুশি হয়েছি। কল্পনাই করিনি এত তাড়াতাড়ি আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে।' তিনি অদ্ভুতদর্শন মানুষটির সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আগন্তুক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে একটা কবরের উপর মেলে ধরলেন। মনে হলো এটা এই ছোট গির্জাটার নকশা। তিনি একটি পেন্সিল নিয়ে কাগজে কিছু কাল্পনিক রেখা টানলেন। সেই সঙ্গে ভবনটির বিশেষ কয়েকটি দিকে তাকালেন।

যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তার বিপরীত দিক থেকে পা মেপে মেপে এগিয়ে চললেন ব্যারন, তারপর এক জায়গায় পৌঁছে থেমে গেলেন। যেখানে থামলেন তার সামনে একটা পাথরের দেয়াল। দেয়ালটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। সেখানকার আইভি লতার ঝোপ সরিয়ে লাঠি দিয়ে দেয়ালের প্লাস্টার ঠুকলেন বারকয়েক। এবং বেশ চওড়া একটা মার্বেল পাথর দেখতে পেলেন। তাতে কিছু অক্ষর খোদাই করা।

ইতিমধ্যে কাঠুরে লোকটি ফিরে এসেছে। তার সাহায্যে সহজেই ইন্সক্রিপশনের অর্থ উদ্ধার করা গেল। জানা গেল এটাই কার্নস্টাইনের কাউন্টেস মির্কাল্লার কবর।

বৃদ্ধ জেনারেলকে আমি তেমন প্রার্থনা করতে দেখিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, 'কাল কমিশনার এখানে আসবেন,

তারপর এখানে আইন অনুযায়ী ইনকুইজেশন হবে।' এই বলে তিনি সোনার চশমা পরা ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে উষ্ণভাবে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, 'ব্যারন, ব্যারন, জানি না কীভাবে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দেব! যে বিভীষিকা একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলে মহা আতংক সৃষ্টি করে চলেছে আপনি তার কবল থেকে একে মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন।'

বাবা ব্যারনকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। জেনারেল গেলেন ওঁদের পিছু পিছু। আমি জানি বাবা ওঁদেরকে দূরে নিয়ে গেছেন এ কারণে যে আমার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলবেন যেন আমি শুনতে না পাই। আমার সন্দেহই বোধহয় সত্যি কারণ দেখলাম কথা বলার সময় ওরা মাঝে মাঝেই আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

বাবা আমার কাছে ফিরে এসে বারবার চুমু খেলেন। তারপর বললেন, 'চলো এখন বাড়ি যাই। তবে পুরোহিতকেও সঙ্গে নিয়ে যাব–তিনি কাছেই থাকেন।'

সে রাত্রে আমার ঘরে খুব কড়া পাহারা বসল। দুই ভৃত্য আর মাদাম থাকল আমার ঘরে। রাতটা এখানেই কাটাবে। আর পাশের ড্রেসিংরুমে থেকে আমার উপর লক্ষ রাখবেন পুরোহিত আর বাবা।

সে রাতে পুরোহিত কিছু মন্ত্র পড়লেন, যার অর্থ কিছুই বুঝলাম না। তবে এ কথা ঠিক যে কারমিল্লার অনুপস্থিতিতে রাতটা আমার আরামেই ঘুমিয়ে কাটল।

স্টিরিয়া, মোরাভিয়া, সিলেসিয়া, টার্কিশ সার্ভিয়া, পোল্যাণ্ড, এমনকী রাশিয়াতেও যে ভয়ঙ্কর কুসংস্কারের গল্প আপনারা শুনেছেন তা আসলে ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে। আমাদের এ ছোট্ট

গাঁয়েও প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলেছে যে সত্যি ভ্যাম্পায়ার রয়েছে। এ কারণে পরদিনই কার্নস্টাইনের ছোট গির্জায় সভা বসল। কাউন্টেস মির্কাল্লার কবর খোলা হলো। জেনারেল আর বাবা দু'জনেই তাঁদের ভয়ঙ্কর, রূপসী অতিথিকে সনাক্ত করলেন। তার অন্ত্যেষ্টির পরে দেড়শো বছর পার হয়ে গেলেও এখনও তার মধ্যে রয়ে গেছে জীবনের উষ্ণতা। তার চোখ খোলা। কাফন থেকে পচা মড়ার গন্ধ একদমই নেই। ওখানে দু'জন ডাক্তারও এসেছিলেন। তাঁরা লক্ষ করলেন মৃতের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হলেও এখনও চলছে। এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শক্ত হয়ে যায়নি। তার কফিন থকথক করছে রক্তে। রক্তের মধ্যে ভেসে আছে ভ্যাম্পায়ারের জীবন্মৃত দেহ।

তখন প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তার শরীর তুলে এনে একটা তীক্ষ্ণ কাঠের গোঁজ তার কলজে বরাবর ঢুকিয়ে দিতেই সে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল। তারপর তার মাথা কেটে শরীর আলাদা করে ফেলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে বেরুতে শুরু করল রক্ত।

তারপর সেই কাটা মুণ্ডু আর মুণ্ডুহীন ধড় কাঠের একটা স্তূপের ওপর রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল ভ্যাম্পায়ারের শরীর। আর সেই ছাই নদীর জলে ফেলে দেয়া হলো। তারপর থেকে আমাদের ওই অঞ্চলে আর কোনদিনই ভ্যাম্পায়ারের উপদ্রব হয়নি।

আমার বাবা ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ইমপেরিয়াল কমিশনারের কাছে জমা দিলেন। সেই রিপোর্টে ব্যারন ভরডেনবার্গসহ আরও কয়েকজনের ভ্যাম্পায়ার বিষয়ক অভিজ্ঞতার কথা লেখা ছিল।

উপসংহার

এখন আমি শান্ত মনে লেখাটি লিখছি। তবে কয়েক বছর আগের সেই ভয়ানক দিনগুলোর় কথা মনে পড়লে আজও আমার গা ভয়ে শিউরে ওঠে। এখানে ব্যারন ভরডেনবার্গ সম্পর্কে আমি দু'একটি কথা বলব যিনি কাউন্টেস মির্কাল্লার কবর আবিষ্কার করেছিলেন। ব্যারনের বাড়ি গ্রাটজে। ওখানে খুব গরিবি হালে থাকেন যদিও একসময় তাঁর পরিবার বেশ বড়লোক ছিল। তিনি সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে তাঁর প্রচুর লেখা আছে। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভ্যাম্পায়াররা কীভাবে কবরে থাকে এবং কীভাবে মানুষের সঙ্গে মেশে। ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কিত ওই লেখাগুলি পড়লে কাউন্টেস কার্নস্টাইনের সঙ্গে সব মিলে যায়।

তবে ভ্যাম্পায়াররা কীভাবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময়ে বেরিয়ে আসে এবং আবার ফিরে যায় নিজেদের কবরে তা এখনও একটি অব্যাখ্যাত রহস্য। এরা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মানুষের রক্ত খায়। এরা যদি কাউকে টার্গেট করে তবে ছলে-বলে-কৌশলে সেই লক্ষ্য অবশ্যই অর্জন করে।

কারমিল্লা নামের ভ্যাম্পায়ারটির মুখোশ উন্মোচন করার পর ব্যারন ভরডেনবার্গ আমাদের বাড়িতে দু'তিন সপ্তাহ ছিলেন। বাবা

তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে বহুকাল ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা কাউন্টেস মির্কাল্লার কবর তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ব্যারন মুচকি হেসে এক মোরাভিয়ান নোবলম্যানের কথা বলেছেন। তাঁর বাড়ি স্টিরিয়াতেই। এই ভদ্রলোক নাকি মির্কাল্লার প্রেমিক ছিলেন। মির্কাল্লার অকাল মৃত্যু তাঁকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দেয়। একমাত্র তিনিই জানতেন মির্কাল্লার কবরটি আসলে কোথায়। এবং ব্যারন সেই ভদ্রলোকের লেখা পড়েই মির্কাল্লার কবরটি খুঁজে পেয়েছেন।

ব্যারনের কাছ থেকে আমরা জানলাম কেউ যদি আত্মহত্যা করে তা হলে সেও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যেতে পারে। তার আত্মা বাস করে জীবিত মানুষের মধ্যে। কিন্তু এ মানুষগুলো যখন মারা যায় তখন তারাও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। ঠিক এ ঘটনাটিই ঘটেছিল সুন্দরী মির্কাল্লার ক্ষেত্রে। যে শিকার হয়েছিল কোন এক ভ্যাম্পায়ারের। ব্যারন বললেন, 'আমার এক পূর্বপুরুষ, ভরডেনবার্গ, যাঁর পদবী আমি বহন করছি, শীঘ্রি এ বিষয়টি আবিষ্কার করেন এবং এ নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে অনেক কিছু জানতে পারেন। এ পূর্বপুরুষের আইডল ছিলেন কাউন্টেস। তিনি এ অঞ্চলে চলে আসেন এবং মির্কাল্লার লাশ কবর থেকে সরিয়ে ফেলেন। বুড়ো বয়সে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি অনুতপ্ত হন এবং বুঝতে পারেন মির্কাল্লার লাশটি সরিয়ে ফেলে ভুল করেছেন। মির্কাল্লার লাশ ঠিক কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে সমস্ত তথ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন।'

পরের বসন্তে বাবা আমাকে ইটালি নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা এক বছরের বেশি সময় থাকলাম। কারমিল্লার ভয়ানক স্মৃতি মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ত। কখনও সে সেই হাসিখুশি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির রূপ ধরে আমার সামনে আসত, কখনওবা

তাকে দেখতে পেতাম ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জায় তার সেই ভয়াল চেহারায়। তখন আমি চমকে উঠতাম। মনে হতো আমার ড্রয়িংরুমের দরজায় যেন কারমিল্লার হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

জে. শেরিডান লে ফানু

আতংকের দিন আতংকের রাত

এক

বসন্ত

জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়চুড়োয় রুপোলী কয়েনের মত মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে। আলো বিলোচ্ছে অকাতরে। বসন্তের শেষ হাওয়া বইছে। শীতল, ফুরফুরে। বাতাসে অজানা ফুলের গন্ধ।

পাহাড়ের মাথায় একটি বাড়ি ফুটে আছে আকাশের পটভূমে। একটিই মাত্র বাড়ি তবে ওটা খালি নয়। কর্কশ, শক্ত প্লাস্টার করা চার দেয়ালের ঘরের মধ্যে বসে আছেন অ্যাডেলিন বেটস। অপেক্ষা করছেন তাঁর কন্যা, জামাই এবং নাতির জন্য। ওরা সবসময় বৃহস্পতিবার রাতে অ্যাডেলিনের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

অ্যাডেলিনের বয়স তেষট্টি, চেহারা দেখলে মনে হয় ভগ্ন স্বাস্থ্য, তবে তাঁর চোখ দুটো অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। পাহাড়ি এলাকার মানুষজন তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করে তাঁর জ্ঞান এবং বুদ্ধির জন্য। দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসে বৃদ্ধার কাছে তাদের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেতে, ভবিষ্যৎ জানতে। ধূসর চুলের বৃদ্ধাটি সেকেলে মনমানসিকতার বলেই আধুনিক অনেক কিছুই গ্রহণ করতে রাজি হন না। এ বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং পানির লাইন বসানোর জন্য

অ্যাডেলিনকে রাজি করাতে তাঁর মেয়ে এবং জামাইয়ের কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তবে অতীত এবং অতীত সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে তাঁকে ফেরানো যায়নি। তিনি তাঁর ওই চোখজোড়া দিয়ে অনেক কিছুই দেখেছেন...অনেকে বলে অনেক বেশিই নাকি দেখেছেন।

অন্ধকারের নৈশব্দ ভেঙে দিল গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন। একটি পুরানো মডেলের ফোর্ড গাড়ি ধুঁকতে ধুঁকতে এল পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। গাড়ির ভেতরে তিনজন মানুষ। স্বল্প আলোয় তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় তারা যেন কীসের ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল গাড়িটি।

'মা!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, সে এবং তার স্বামী দরজা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকল। 'মা, কোথায় তুমি?'

'এই যে এখানে,' শান্ত গলায় জবাব এল। চুপচাপ বসে আছেন বৃদ্ধা।

'ওহ, লর্ড, মা, ওরা ব্যাপারটা জেনে গেছে!' ঘরের ভেতর একটি মাত্র বাতি জ্বলছে, মেয়েটি ছুটে এল আলোতে। বেশি বয়সে মা হওয়া অ্যাডেলিন তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর কন্যাটি সুশ্রী এবং সুগঠনা। চাঁদপানা মুখ, তাতে লাবণ্য ঝরে পড়ছে। মেয়েটির কোলে চার মাস বয়সের একটি শিশু পুত্র। 'ওঠো...ওই হারামজাদাগুলো আমাদেরকে মেরে ফেলবে!'

ছোট বাড়িটির কাঠের মেঝে থরথর করে কেঁপে উঠল অ্যাডেলিনের জামাই'র পদভারে। সে বিশালদেহী, অত্যন্ত পেশীবহুল শরীর, মাথার চুল পাতলা। সে দড়াম করে বন্ধ করল দরজা।

'মা! ওরা সব জানে!' অ্যাডেলিনের মেয়ে লিণ্ডার চোখে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। সে তার মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

‘আমরা এখন কী করব?’

অ্যাডেলিনের মুখে বলিরেখা। প্রতিটি রেখা তাঁর জীবনের এক একটি অধ্যায়। তিনি শান্ত ভঙ্গিতে মেয়ের কাছ থেকে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। ‘ওরা জানল কীভাবে?’ ঘ্যাসঘেসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

‘জানি না! হয়তো কেউ আজ সকালে আমাদেরকে দেখে ফেলেছিল। গড...! ক্লেটার্স ওয়েবার আর স্টুয়ার্ট ফ্যারন্যাণ্ড সন্ধ্যা নাগাদ একটা জোট বেঁধে ফেলে। তারপর রাতের বেলা ওরা বন্দুক নিয়ে হামলা চালায়...তারপর...ওহ্, ডিয়ার গড!’

‘ওদের সবক’টাকে আমি খুন করব!’ গর্জে উঠল তার স্বামী, যেন গুরুগুরু শব্দে মেঘ ডাকল। ‘গোটা শহর আমি ধ্বংস করে দেব! তুমি জানো আমি তা পারি!’

‘না, বেটা,’ বললেন অ্যাডেলিন। ‘তুমি ওদের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবে না, অন্তত আজ রাতে নয়।’

বৃদ্ধার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, চমকে গেল লিণ্ডা।

‘মা,’ ফিসফিস করল সে। ‘তুমি কি...কিছু দেখতে পেয়েছ?’

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা।

লিণ্ডার কণ্ঠ প্রায় অস্পষ্ট শোনাল, বুজে গেছে চোখ।

‘কী দেখেছ?’

জবাবটা এল যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বরফখণ্ডের মত। ‘মৃত্যু।’

‘আপনি ঠিক জানেন?’ হুংকার ছাড়ল লিণ্ডার স্বামী, উত্তেজনায় শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে বৃদ্ধার কৃশ হাত।

এই প্রথমবার কথা বলতে গিয়ে তোতলালেন তিনি। ‘হ-হ্যাঁ। আজ রাতে।’

‘যীশাস, যীশাস, সুইট যীশাস,’ ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটি, কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

তার স্বামী পাথর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে মুখ। স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে সে আর একটি মাত্র মানুষকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তিনি এই বৃদ্ধা যিনি ম্লান, বিষণ্ন চোখ দিয়ে পর্দার অন্ত রালের সবকিছু দেখতে পান। আর অ্যাডেলিন জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নি। এবং তিনি যা দেখতে পান তার সবই ঘটে। 'আমরা কি সবাই মারা যাব?'

'তুমি এবং লিণ্ডা।'

'বাচ্চাটা?'

'ওকে দেখতে পাইনি আমি।'

'তা হলে ওকে আপনার কাছে রাখুন।' সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়া স্ত্রীকে সিধে করল। লিণ্ডা স্বামীর বুকে গুঁজে দিল মুখ। অ্যাডেলিন বসে রইলেন স্থির, তাঁর জামাতা আবার পশুর মত ভয়ঙ্কর গলায় বলল, 'বাচ্চাটাকে নিন বলছি! গড ড্যামিট! ওরা এখানে আসার আগেই ওকে নিয়ে চলে যান।'

বৃদ্ধাকে দেখে মনে হলো হঠাৎ তাঁর বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর, খাড়া হলেন তিনি, শান্ত বাচ্চাটাকে নীল কম্বলে জড়িয়ে নিলেন। 'লিণ্ডা,' বললেন তিনি।

'চলে যান!' গর্জে উঠল লোকটা।

'গুডবাই, হানি।'

তিনি বাচ্চাটাকে নিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়লেন।

বহু কষ্টে নিজের শরীরটাকে পাহাড়ি জংলা পথ ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন অ্যাডেলিন। ঝোপঝাড় আর বৃক্ষসারির মাঝ দিয়ে সতর্কভাবে পথ চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে তাকালেন। কালো ঝলমল আকাশে লাল টকটকে থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে অগ্নিশিখা, লোভী হাত বাড়িয়ে যেন ছুঁতে চাইছে চাঁদটাকে। তাঁর বাড়িটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে তাঁর মেয়ে এবং জামাইকেসহ।

দুই

মে—পাঁচ বছর পর

'খান আর হুইটলিরা আজ রাতে আসছে,' ঘোষণার সুরে বলল শমিতা হাসান। আরেকটা বাক্স খুলল সে। প্রচুর মালপত্র। ঘর সাজাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী মিলে। এ বাক্সের মধ্যে কাচের তৈজসপত্র, বাড়ি লেগে ঝনঝন শব্দ তুলল।

হলওয়ে থেকে হাঁক ছাড়ল ওর স্বামী আবিদ হাসান। 'কী বললে?'

'বললাম আমাদের পুব দিকের পড়শী খান আর পশ্চিম দিকের পড়শী হুইটলিরা আজ আসছে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে।' একটা ভাঙা পানপাত্র তুলল শমিতা বাক্সের ভেতর থেকে।

আবিদ ঢুকল ঘরে, একটা সোফা আর আলমারী বসাতে গিয়ে ঘেমে গেছে। ভাঙা পানপাত্রটির দিকে চোখ গেল ওর। 'আরি, তুমি তো ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ!'

কপট রাগে স্বামীর দিকে তাকাল শমিতা। ছোটখাট গড়নের, হালকা-পাতলা, কৃষ্ণকেশী শমিতাকে দেখলে মনেই হয় না সে ইতিহাস এবং মনোবিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন করেছে। দেখতে লাগে কলেজ ছাত্রীর মত।

কাচের ভাঙা পানপাত্রটি আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিল শমিতা। বসে পড়ল আবিদের পাশে। আবিদ ওকে বুকে টেনে

নিয়ে চুমু খেল। শমিতা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'এহ্, তোমার গা দিয়ে বিশ্রী ঘামের গন্ধ আসছে। যাও, গোসল করে এসো।'

'এখনই গোসল করতে পারব না, ডার্লিং। এখনও অনেক কাজ বাকি। তোমার ড্রেসিং টেবিল, তোমার রেফ্রিজারেটর, তোমার...

'খালি তোমার তোমার করছ। আমার ইন্টারভিউ যে সকাল এগারোটায় সে খেয়াল আছে? আমার হাতে মাত্র একঘণ্টা সময় আছে।' সিধে হলো শমিতা। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল পেছনে।

'তোমার চাকরিটা করা কি খুব দরকার?' জিজ্ঞেস করল আবিদ।

শমিতা সিরিয়াস গলায় জবাব দিল, 'তুমি তো জানো চাকরি করেই আমার লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছি। আর এখন ঘরে বেকার বসে থাকতে একটুও ভাল্লাগবে না আমার। চাকরিটা যদি পেয়ে যাই, সপ্তাহে মাত্র তিনদিন ডিউটি। কাজেই তোমার খাওয়া-দাওয়ায় কোন সমস্যা হবে না। যথাসময়েই টেবিল রেডি পাবে।'

'কিন্তু ওই নরকে কাজ করার জন্য তুমি এত উতলা কেন?'

'ওটা নরক নয়, আবিদ। হাসপাতাল। ওখানে যারা থাকে তারা মানুষ। তাদের আদর-যত্নের প্রয়োজন আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল আবিদ। 'সেজন্য আমেরিকায় যেন আর কেউ নেই। আমার বউ ওদের আদর-যত্ন করবে। ওই খুনী, ধর্ষণকারী আর বোমাবাজদের...'

মনঃক্ষুণ্ন হলো শমিতা। আর কিছু না বলে দুপদাপ পা ফেলে পাশের ঘরে গেল। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল আবিদ। জানে এ মেয়ে খেপে গেলে তাকে রুখবার ক্ষমতা নেই কারও।

প্রেম করে বিয়ে করেছে ওরা। অসম্ভব ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রী শমিতা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির একটা স্কলারশিপ নিয়ে এ দেশে পড়তে এসেছিল। একটা সুপার মার্কেটে পার্ট-টাইম চাকরি করতে গিয়ে সুদর্শন আবিদ হাসানের সঙ্গে ওর পরিচয়। তবে শমিতা প্রথমদিকে আবিদকে তেমন পাত্তা দিত না। কারণ আবিদের মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করার অভ্যাসটি ওর পছন্দ হতো না। তবে আবিদ হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র ছিল না। টানা এক বছর সে লেগে ছিল শমিতার পেছনে। নিজের আচরণ দিয়ে প্রমাণ করেছে সে বদলে গেছে। শমিতা ছাড়া সে আর কোন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। অবশেষে ধৈর্যের ফল পেয়েছে। শমিতা 'হ্যাঁ' বলেছে। তার এক মাস পরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে দু'জন। বিয়েতে ঢাকা থেকে শমিতার মা এসেছিলেন। আবিদের মা-বাবা নেই। বড় চাচা ওকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। তবে বুড়ো মানুষ তাঁর ভাতিজার বিয়েতে আসতে পারেননি। শমিতাকে নিয়ে বেশ সুখেই আছে আবিদ। তবে দু'জনের কেউই জানে না ওদের এই সুখের সংসারে ঘনিয়ে আসছে অশনি সংকেতের কালো মেঘ।

তিন

ডা. রবার্টসন নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছিলেন। মাথার চুল কালো, মধ্যবয়স্ক, শরীরের

মধ্য প্রদেশে ছোটখাট একটি ভুঁড়িও গজিয়েছে, চাঁদির কাছটা ফাঁকা হতে শুরু করেছে। তিনি উন্মাদ ও পাগলদের জন্য তৈরি বেভিল কাউন্টি হাসপাতালের প্রধান পুরুষ। আগে এটির নাম ছিল বেভিল স্যানাটোরিয়াম, এটি তখন ধনী ও খ্যাতিমান মানুষদের অবসর বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শোনা যায়, কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজনীতিবিদ ওখানে চরম গোপনীয়তার মাঝে 'ছুটি' কাটাতে আসতেন। বর্তমানে ভিনসেণ্ট রবার্টসনের তত্ত্বাবধানে এটি মানসিক হাসপাতাল হিসেবে বেশ নাম কামিয়েছে। এখানে আত্মহত্যার চেষ্টাকারী কিংবা খুনীদের সুচিকিৎসা দেয়া হয়।

হাসপাতালের কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক রবার্টসন এবং খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে তাঁর রয়েছে তীক্ষ্ণ নজর। তিনি চাকরিপ্রার্থীদের সাক্ষাৎকার স্বয়ং নিয়ে থাকেন।

'মিসেস হাসান, এ কাজটির জন্য আপনাকে আমার যথেষ্টই যোগ্য মনে হয়েছে,' ডাক্তার টেবিলের ওপর রাখা একতাড়া কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনার ডিউটির সঙ্গে কোন থেরাপির বিষয় জড়িত থাকবে না। তবে আপনি যেহেতু স্টেট রিটারডেশন সেণ্টারে কাজ করছেন এবং মেণ্টাল হেলথ এডুকেশনেও আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব ভাল কাজেই রোগীদের সঙ্গে আপনার ইণ্টার অ্যাকশনগুলো ভাল হবে বলেই আমাদের ধারণা।'

মাথা ঝাঁকাল শমিতা, গলার স্বরে নার্ভাসনেস ফুটতে দিল না। 'আপনাদের রেগুলেশন সম্পর্কে আমার জানা আছে, ডক্টর এবং সেগুলোর ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমতও নেই। ছাড়া পেতে যাওয়া রোগীদের অ্যাডজাস্টমেণ্ট অ্যাডভাইজর হিসেবে আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে জানি। তবে এক্সপার্ট সুপারভিশন ছাড়া আমি কোন কাউন্সেলিং-এর চেষ্টাই করব না।'

রবার্টসন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ভাবছেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে খাড়া হলেন। 'ওয়েল, মিসেস হাসান, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে যোগ দেয়ার চেষ্টা করুন।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'অবশ্য, এখানে যদি আপনার কাজ করার ইচ্ছে থাকে।'

'আশ্চর্য! আমি কাজ করব বলেই তো অ্যাপ্লাই করেছি।'

'বেভিলে যে-ই কাজ করতে আসুক না কেন, আমি তাদেরকে একটি পার্সোনাল এক্সকারশনে নিয়ে যাই যাকে আমার কর্মচারীরা আড়ালে 'ফ্রিকো ওয়ার্ড' বলে সম্বোধন করে। আসলে তিন নম্বর ওয়ার্ডেই কেবল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির রোগীদের রাখা হয়েছে। এদেরকে সর্বোচ্চ সিকিউরিটি দেয়া হয়। এ মানুষগুলোরই সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রয়োজন। এখানে আদালতের রায়ে দণ্ডিত দু'জন খুনী আছে, রয়েছে একজন শিশু নির্যাতনকারী, একজন আরসোনিস্ট যার কাজই হচ্ছে সুযোগ পেলেই আগুন ধরিয়ে দেয়া, আর রয়েছে তিন-চারজন...ওয়েল, ওদেরকে গেলেই দেখতে পাবেন।'

ডেস্ক ইন্টারকমের একটি বোতাম টিপলেন তিনি। 'বার্লো, আমি তিন নম্বর ওয়ার্ডে যাচ্ছি।' তিনি শমিতার দিকে ফিরলেন। 'যাবেন তো? চলুন।'

প্রথম রোগী, একজন খুনী, সাতাশি বছরের এক বৃদ্ধ। থুত্থুরে বুড়ো হলেও এখনও দিব্যি নড়াচড়া করতে পারে। সে তার ঘরের একটি মাত্র চেয়ারে বসে জীর্ণ একটি বাইবেল জোরে জোরে পড়ছিল। ওরা দু'জন ঘরে ঢুকল না, অবজারভেশন জানালা দিয়ে ভেতরটা তাকিয়ে দেখল। রবার্টসন যখন বললেন কামরার ছোটখাট গড়নের ওই লোকটি কিচেন নাইফ দিয়ে তার স্ত্রী এবং বড় ছেলেকে জবাই করার পরে তাদের রক্ত দিয়ে গোসল করেছে,

শুনে শমিতার শিরদাঁড়া দিয়ে বরফজল নামল।

আর্সোনিস্ট মহিলার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। অবিবাহিতা, রোগা-পাতলা দেহ, মাথায় বাদামী চুল। তার ভাষায় কোন এক শনিবারের রাতে তার নিজেকে খুব 'বোর' লাগছিল এবং মজা পেতে সে ছোট একটি শহরের অর্ধেকটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় 'টেকনিকালার-এর দারুণ দৃশ্য' উপভোগ করার জন্য। তবে বিস্ময়করই বটে সেদিনের আগুনে কেউ হতাহত হয়নি। পরবর্তী কয়েকটি শনিবারও সে লোকের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে কিন্তু আগুনে পুড়ে কেউ দগ্ধ হওয়ার কথা শোনা যায়নি।

আরেক খুনী...এক ব্যর্থ স্নাইপার...এবং পার্ট-টাইম পিপিংটম, সে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মেয়েদের পায়ের আঙুল ভেঙে দিতে খুবই আনন্দলাভ করে। শমিতা এদের কথা শুনল চেহারায় নিরাসক্ত একটা ভাব বজায় রেখে।

রবার্টসন বললেন, 'এরপরে যে তিনজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, মিসেস হাসান, তারা আপনাকে যথেষ্টই আগ্রহী করে তুলবে।' বীজাণু নিরোধক হলওয়ে দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছেন দু'জনে। 'তবে আপনাকে যা বলছি সবই সত্যি। আপনাকে খামোকা ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না।'

কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে একটি সেলের তালা খুললেন ডাক্তার। ভেতরে শুয়ে শুয়ে কমিক বুক পড়ছে ত্রিশোর্ধ্ব এক যুবক। নাম জর্জ জনসন। শমিতার সঙ্গে রোগীর পরিচয় করিয়ে দিলেন রবার্টসন। জনসনকে একটুও মানসিক রোগীর মত দেখাচ্ছে না।

'জনসন আমাদের পলায়ন শিল্পী। এক সপ্তাহ অন্তর সে তার কামরা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।' বললেন রবার্টসন। 'সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও জর্জ জনসনের দেখা মেলে না।'

হাসল জর্জ। শমিতা জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে...মানে দরজায়

তো তালা...বের হয় কী করে?'

'দরজা দিয়ে,' জনসন জবাব দিল। 'এই কামরায় অন্য একটি দরজা আছে, আমি ছাড়া কেউ দেখে না।'

' কোথায় যাও তুমি?' প্রশ্ন করল শমিতা।

'বাইরে থেকে ঘুরে আসি আর কী। কখনও জাপান, কখনও মালদ্বীপ, কখনও ওয়াশিংটন শহর,' জবাব দিল জর্জ।

রবার্টসন বললেন, 'কোথায় যায় কে জানে। যায়, আবার ফিরেও আসে। কখন যায় কখন আসে আমরা বুঝতে পারি না।'

পরের কামরার রোগীও অস্বাভাবিক! তবে ধরনটা অন্যরকম। পনেরো বছর বয়সের এক মেয়ে, তার ওপর নাকি মৃত মানুষের আত্মা ভর করে। আত্মা ভর করলে আসুরিক শক্তি এসে যায় তার শরীরে। রবার্টসনের পেছন পেছন শমিতা ঢুকল মেয়েটির কামরায়। জনসনের কামরা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আর ডেবীর–মানে এই মেয়েটির কামরা নোংরার চূড়ান্ত।

ডেবীকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। রবার্টসন বললেন, 'ডেবী! ইনি শমিতা হাসান। এখন থেকে এখানে কাজ করবেন। এঁকে তোমার ভাল লাগবে আশা করি।'

হা হা করে হেসে উঠল ডেবী। ভয়ঙ্কর হাসি। বলল, 'বাঁধনটা খুলে দাও। ওকে কী রকম ভাল লাগছে একটু দেখাই। এই মাগীর চুল ছিঁড়ে নেব, চোখ উপড়ে ফেলব, কামড়ে মাংস খাব। ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও।' চিৎকার শুরু করে দিল মেয়েটি। ভীষণ ভয় পেল শমিতা।

করিডরে এসে ও জিজ্ঞেস করল, মেয়েটার কোন আত্মীয় স্বজন ওকে দেখতে আসে না?'

'না,' বললেন রবার্টসন। 'কেউ আসে না। ওকে আমরা বেঁধে রাখি। নইলে কত লোক খুন হতো ওর হাতে, কে জানে!'

দু'জনেই ঢুকল আর একটি কামরায়। কামরার মালিক

চেয়ারে বসে ছাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। গলা খাঁকারি দিয়ে রবার্টসন বললেন, 'ডেভিড নেগার?'

ডেভিড দীর্ঘদেহী। ওজন দেড়শো পাউণ্ড। শান্ত স্বভাবের। ছাদের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'বলুন, ডাক্তার।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে একজনকে নিয়ে এসেছি।'

'তা-ই?' চোখ বন্ধ করল ডেভিড। 'পালোয়ান মার্কা পুরুষ নার্স নিশ্চয়।'

'এদিকে তাকাও,' বললেন রবার্টসন, 'দেখ পালোয়ান কিনা।'

তাকাল ডেভিড। বিস্ময় ও ক্রোধে চিৎকার করে উঠল, 'মেয়ে মানুষ? ডাক্তার একটা মেয়ে মানুষকে নিয়ে এলেন এখানে? বের করে দিন ওকে। যান, নিয়ে যান। গেট হার আউট।' চেয়ার থেকে লাফ মেরে খাড়া হলো সে। রাগে কাঁপছে শরীর।

রবার্টসন ওর কাছে গিয়ে বললেন, ' টেক ইট ইজি, ডেভিড।'

'না, নিয়ে যান ওকে,' গর্জে উঠল ডেভিড, 'মেয়ে মানুষ সইতে পারি না আমি। গেট হার আউট, ড্যাম ইট।'

'ডেভিড!' ধমক দিলেন রবার্টসন। জনসনের সঙ্গে তিনি খোলামেলা কথা বলেছেন; ডেবীর সঙ্গে হেসেছেন; এখন তিনি পিতার মত কঠোরভাষী। চোখ পাকিয়ে বললেন, 'চেয়ারে বসো বলছি। বাস্তবতার মোকাবেলা তোমাকে করতেই হবে,' বললেন ডাক্তার। 'পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে যাদের তুমি জানো না, চেনো না। এই কোটি কোটি মানুষের অর্ধেকেই নারী।'

ডেভিড এখন কাঁদছে। গাল বেয়ে নামছে অশ্রু, 'আমি পারি না, ডাক্তার, আপনি তো সবই জানেন।'

'ডেভিড! তুমি একটা ভুল করেছিলে, ওই ভুলটাই জীবন নয়। ঘটনাটা ভুলে যাও। সামনের দিনগুলোকে সুন্দর করে নাও।' রবার্টসনের কণ্ঠস্বর নরম শোনাল।

শমিতা অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।'

ডেভিড শমিতার হাত ধরে ফেলল, 'না, যাবেন না, প্লিজ! আমি, আমি আপনাকে বলতে চাই, মানে...

ডাক্তারের দিকে তাকাল সে। রবার্টসন মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন ওকে কথা বলার জন্য। ডেভিড বলল, 'কী ঘটেছিল আপনাকে বলছি। কসম খেয়ে বলছি, আমি জানি না, কেমন করে জঘন্য কাজটা করলাম...

আবিদের কথাগুলো শমিতার কানে বাজছিল। সে বলেছিল, 'মার্ডারার্স, ধর্ষণকারী...'

ডেভিড বলে চলেছে, 'বাড়ির দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম। বেডরুমে উঁকি দিয়ে দেখি ঘুমিয়ে আছে এক পরমা সুন্দরী। কাছে গিয়ে দেখি আমার বন্ধুর বড় বোন। বিবাহিতা, বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। আমি তাকে জাপটে ধরতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। চিৎকার করতে যাচ্ছিল, আমি ওর টুঁটি চেপে ধরলাম। মরে গেল সে। মৃত্যুর পরও আমি...তারপর কোথা থেকে এসে ওর স্বামী আমাকে হাতে নাতে ধরে ফেলল।'

শমিতা হাসান বেরিয়ে এল ডেভিডের কামরা থেকে। করিডরে দাঁড়িয়ে ও নার্সদের ব্যস্ততা দেখছিল। রবার্টসন তখনও আলাপ করছেন ডেভিডের সঙ্গে।

'তুমি কে?' শব্দটা এল পেছন থেকে। তাকাল শমিতা। ছোট্ট একটা ছেলে। নাদুস নুদুস চেহারা। বয়েস বড়জোর পাঁচ। কিন্তু যেভাবে ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে আছে তাতে মনে হয় প্রবীণ কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। পরনে রোগীর পোশাক নয়। সাদা জামা প্যান্ট পরেছে।

'তুমি কি ওদের মত পাগল?' জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

'না। আমি ওদের মত নই।' হাসতে হাসতে বলল শমিতা

'তোমার নাম কী, খোকা?'

'আমার নাম রোরি। তোমার নাম?'

'শমিতা। শমিতা হাসান। তুমি কি কাউকে দেখতে এসেছ এখানে?'

'না তো! আমি এখানেই থাকি।' চটপট জবাব রোরির।

চুপচাপ শমিতার পেছনে এসে দাঁড়ালেন রবার্টসন। তাঁর গলার শব্দে চমকে ওঠে শমিতা। 'ঠিক বললে না, রোরি।'

'ও, ডাক্তার! কেন, কী ভুল বললাম?' ছেলেটির প্রশ্ন।

'রোরি আসলে এখানে থাকে না। সে ওর নানীকে এখানে দেখতে আসে,' জানালেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ, তা-ই,' হেসে উঠল রোরি।

শমিতা বলল, 'মাফ চাইছি, ডক্টর রবার্টসন। আমি বোধহয় এ প্রতিষ্ঠানে কাজের যোগ্য নই।'

ডাক্তারের কানে যেন যায়নি শমিতার কথা। তিনি রোরির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এই ওয়ার্ডে তোমার আসার কোন দরকার নেই। এটা তো তুমি জানো।'

'হ্যাঁ, জানি,' চটপট বলল ছেলেটি।

'বেশ।' বললেন ডাক্তার, 'একটু পরেই আমি তোমার নানীকে দেখতে যাচ্ছি, বুঝলে? এবার কেটে পড়ো।'

ছেলেটি দৌড় দিল। রবার্টসন বললেন, 'মিসেস হাসান, আপনি অত্যন্ত যোগ্য। ডেভিডের যে উপকার আজ আপনি করলেন তা এক বছর থেরাপি করার সমান। আসছে সোমবারেই জয়েন করছেন আপনি।'

ওরা হাঁটতে থাকে সিঁড়ির দিকে। নীচতলায় রবার্টসনের অফিসে যাবে। 'এই ছোট্ট ছেলেটি কে?' জানতে চায় শমিতা।

'ওর নাম রোরি বেটস। আমরা অন্তত ওকে এ নামেই চিনি। শহরের নদীর পাড়ে ছ'মাস আগে ওকে পাওয়া যায়। দু'দিনের

অভুক্ত। সঙ্গে ওর নানী। বৃদ্ধার মাথা খারাপ। অপুষ্টিতে ভুগছিল, সমানে বকরবকর করছিল। নাম অ্যাডেলিন বেটস। লোকজন ওদের দু'জনকেই ভর্তি করিয়ে দেয় জেনারেল হাসপাতালে। ওখানে এক ডাক্তার আমার বন্ধু। তারপর এখানে...

'ছেলেটি থাকে কোথায়?' শমিতা প্রশ্ন করল।

একটা কামরার সামনে এসে থামলেন রবার্টসন। অল্পক্ষণ কথা বললেন এক সুন্দরী নার্সের সঙ্গে। তারপর শমিতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'নাতিকে না দেখলে বুড়ি ঝামেলা করে। তাই কাউন্টি শেল্টার থেকে সাময়িকভাবে রোরিকে এখানে আনা হয়েছিল দিন কয়েকের জন্য। ঠিক করেছিলাম, বুড়িকে যেদিন রিলিজ করব, সেদিন ছেলেটিকে বিদায় করব। যে নার্সের সঙ্গে কথা বললাম, ওর সঙ্গেই রোরির থাকার ব্যবস্থা। সেই অল্প ক'দিন এখন ছয় মাস হতে চলল। আসলে বৃদ্ধাকে এখানে ঠাঁই দেয়াই উচিত হয়নি। তবে এটাও ঠিক, আমরা যেরকম আশা করি ঘটনা সবসময় সেরকম ঘটে না।'

'তা হলে রোরি এখানেই থাকে বলা যায়,' বলল শমিতা।

'তা বলতে পারেন,' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন রবার্টসন।

হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। একটা ব্যাঙ যেন বিরামহীন চিৎকার জুড়েছে নাকি সুরে। ডেবীর গলা, বুঝতে পারল শমিতা। রবার্টসন ছুটলেন ওদিকে। পেছন পেছন শমিতা।

কামরা খোলা। মোটাসোটা এক পুরুষ নার্স ধমক দিচ্ছে ডেবীকে। মেয়েটা শুতে চাইছে না বিছানায়। ওকে চেপে ধরেছে নার্স। ডেবীর চোখে-মুখে ভয়। সমানে কাঁদছে আর বলছে, 'ওকে খুন কর, ওকে খুন কর, ও একটা জানোয়ার।'

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসছে রোরি। ভয়াত ডেবীর কাণ্ডকারখানা দেখে মজা পাচ্ছিল সে। 'বাচ্চাটাকে কামরা থেকে নিয়ে যাও,' ধমকের সুরে ওয়ার্ড বয়কে বলল নার্স।

চিলের মত ছোঁ মেরে রোরিকে শূন্যে তুলে বাইরে নিয়ে গেলেন রবার্টসন।

ডেবী উঁ উঁ করে কেঁদেই চলেছে। তবে ওর কান্নার তীব্রতা কমে এল ধীরে ধীরে। বলতে লাগল, 'প্লিজ, ওকে আর আমার কাছে আসতে দিয়ো না, প্লিজ।'

করিডরে, রবার্টসন আস্তে করে রোরিকে মেঝেতে নামিয়ে দিলেন। পিটপিট করে তাকিয়ে মুচকি হেসে শমিতাকে সে বলল, 'জানো, ওই মেয়েটা না আমাকে ভয় পায়।'

'তাই তো দেখলাম,' শমিতা হেসে জবাব দিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন তার মনে কাঁটার মত বিঁধল। ফুলের মত ফুটফুটে এই শিশুকে দেখে ভয় পায় কেন ভয়ঙ্কর মেয়ে ডেবী?

চার

খান এবং হুইটলি দম্পতি আবিদদের বাসায় বেড়াতে এসেছে। জোসেফ হুইটলি এবং তার স্ত্রী এলিজাবেথ হুইটলি, দু'জনের বয়স আটাশের কোঠায়। জোসেফ স্থানীয় ল ফার্মের জুনিয়র পার্টনার; এলিজাবেথ গৃহবধূ, গীটার বাজাতে জানে। দম্পতির একমাত্র সন্তান লুসির বয়স চার। মোটাসোটা, বড় বড় চোখ। শুরুতে একটু লাজুক মনে হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবিদদের সঙ্গে দোস্তি করে ফেলেছে।

পাকিস্তানী খান দম্পতি একটু ক্রেজি টাইপের। রেজালা খান বিস্কুট কোম্পানির ম্যানেজার। তার স্ত্রী জার্দানা খান বর্তমানে মহিলা সংঘের নেত্রী। দু'জনেরই বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। দম্পতির মেয়ে রুখসার, বয়স সতেরো। সপ্তদশী রুখসার ইতিমধ্যেই ফ্লার্ট করবার চেষ্টা করেছে আবিদের সঙ্গে। রুখসারের রূপ আবিদকে মুগ্ধ করেছে। তাই রুখসারের ফ্লার্ট করার চেষ্টায় তার খুব একটা আপত্তি নেই। রুখসারের ভাই রকি, এগারো বছর বয়স, ছেলেটাকে পাজি বললেও কম বলা হয়। বারবার সে ছোট্ট মেয়ে লুসিকে নিয়ে বাথরুমে টাবের মধ্যে চুবাতে চাইছে।

জার্দানার তর সইছে না। সে তার প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেছে। টেনিস, সাঁতার, দূরপাল্লার দৌড়ে কলেজ জীবনের কৃতিত্বের কেচ্ছা শুনিয়েও বিস্ময় উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে শেষমেশ জানাল, মানুষের চেহারা দেখে মনের অবস্থা বলে দিতে পারে।

'আজ দুপুরে আমি কোথায় ছিলাম বলুন তো!' শমিতা বলল। ওর গালে হাত ছোঁয়াল জার্দানা, 'হুম, আপনি ছিলেন একজন পুরুষের সঙ্গে। না, না, লজ্জা পাবেন না। খারাপ কিছু মিন করছি না।'

ড্রয়িংরুমের এক কোনায় সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে আবিদ। সেদিকে তাকিয়ে শমিতা বলল, 'আশ্চর্য! ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, বলুন তো জায়গাটা কোথায়?'

'উঁহুঁ! আপনি কিছু বলবেন না। দেখুন জার্দানা কী নিখুঁতভাবে সব বলে দিচ্ছে,' কায়দা করে বলল রেজালা খান। স্বামীর দিকে কড়া চোখে তাকাল জার্দানা। মানে, তুমি মুখ বন্ধ রাখো।

'আপনি গিয়েছিলেন কোন হাসপাতালে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল জার্দানা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানে আমি সোমবারে জয়েন করব,' জবাব দিল শমিতা। 'কিন্তু হাসপাতাল বুঝলেন কী করে?'

চোখ বুজে জার্দানা বলল, 'ভাইব্রেশন! আপনার গালে হাত রাখতেই ভাইব্রেশন এল, তাতেই বুঝে ফেললাম।'

'আপনি ওখানে সত্যিই চাকরি নিচ্ছেন?' কৌতূহল এলিজাবেথের।

সিগারেট ধরাল রেজালা, একটা টান দিয়ে বলল, 'বেভিল মেণ্টাল হাসপাতাল তো? নাকি?'

আবার ক্রূর চোখে তাকাল জার্দানা। দমে গেল রেজালা। জার্দানা মন্তব্য করল, 'ওই আস্তানায় কোন ভদ্রমহিলা চাকরি করে?'

"আস্তানা" শব্দটায় বিরক্ত হলেও হাসল শমিতা। 'আস্তানা বলুন আর হাসপাতাল বলুন, ওখানে যারা থাকে তারাও মানুষ,' গম্ভীর গলায় বলল ও, 'যত শীঘ্রি সম্ভব ওরা যাতে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেই চেষ্টাই আমি করব।'

'ওখানে কোন পাগলের সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?' জানতে চাইল ইঁচড়ে পাকা রকি।

'শাট আপ, রকি,' ধমক দিল রেজালা, 'চুপ থাক বলছি, নইলে মারব এক গাট্টা।'

ধমক খেয়ে উল্টো মাকে ভেংচে দিয়ে ওখান থেকে চলে গেল রকি। একটা মজার জিনিস দেখাবে বলে সঙ্গে নিয়ে গেল ছোট্ট লুসিকে।

'সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, মিসেস হাসান,' এতক্ষণে বলল জোসেফ। 'নষ্ট মানুষগুলোকে সবাই ঘৃণা করলে ওদেরকে সারিয়ে তুলবে কে? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

'উ মা গো,' শিউরে উঠল রুখসার, প্ররোচনার ভঙ্গিতে তাকাল আবিদের দিকে। 'ওই পাগলের আড্ডায় আমি এক মিনিট থাকলেই মরে যাব।'

হঠাৎ লুসির কান্নার শব্দে সবাই চমকে উঠল। বাথরুমে কাঁদছে সে। ওকে বাথটাবে চুবাচ্ছে রকি। সবাই ছুটে গেল

সেদিকে। রুখসার নড়ল না। আবিদও না। রুখসারের দিকে তাকিয়ে ও গুনগুন করে বাংলায় গাইল *রূপে তোমার আগুন জ্বলে, যৌবন ভরা অঙ্গে, প্রেমের সুধা পান করব আজ, আমি তোমার সঙ্গে।*

'তোমার গলা তো চমৎকার, আংকেল!' রুখসার বলল, 'ইংরেজি করে বলো কথাগুলো। আমি বাংলা একদম বুঝি না।' রুখসারের জন্ম আমেরিকায়। মাত্র একবার স্বদেশ পাকিস্তানে গিয়েছিল। ও উর্দুই ভাল বলতে পারে না। বাংলা বোঝার তো প্রশ্নই নেই।

সোফায় কাত হয়ে শুয়ে থেকে আবিদ বলল, 'লেখক তাঁর প্রেমিকার রূপের প্রশংসা করে বলছেন, শুধু তোমার কণ্ঠস্বরে আমার চলবে না, সুন্দরী, টাইম টু টাইম আমার হার্টটাও টাচ করে শান্তি দিয়ো।'

'ইন্টারেস্টিং!' চোখ বড় করে বলল রুখসার, 'লোকটা ক্যাশ অ্যাণ্ড কাইণ্ড দুই-ই চায়। মন চাইছে, ওর কাছে ধরা দিই।'

'তা আর পারবে না,' কটাক্ষ করে বলল আবিদ, 'ওই বুড়ো মরে ভূত হয়ে গেছে। ধরা দেবার লোকের কি আকাল পড়েছে এ দেশে?'

রুখসার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শমিতারা ঢুকল এ ঘরে। সোজা হয়ে বসল আবিদ। অতিথিরা বিদায় নিল। হাঁফ ছাড়ল শমিতা।

'রকি ছোঁড়ার কাণ্ড দেখলে!' বলল শমিতা, 'অতটুকুন মেয়েকে চেপে ধরেছে টাবের পানিতে। আরেকটু দেরি হলে মরেই যেত।'

'আমি দেখছিলাম রকির বোনের কাণ্ড,' হাসে আবিদ। 'তোমরা আসতে আরেকটু দেরি হলে আমিই মরে যেতাম।

যৌবন দেখানো, গায়ে পড়া স্বভাবের রুখসারের বেহায়াপনার

কথা মনে পড়ল শমিতার। স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার তো মনে হয় আমরা তাড়াতাড়ি আসাতেই তুমি বরং আফসোস করতে করতে মরে যাচ্ছ!'

পাঁচ

ঘরে আলো নেই। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ রাতে এয়ার কণ্ডিশনার ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়েছে। বলেছে, 'অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত লাইন অফ করে দিয়ে ঘুমাতে যাবেন। হেল্প আস টু সার্ভ ইউ।' হাসান দম্পতি তাই জুলাই মাসের গুমোট গরমের মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। বাইরে চাঁদ আছে আকাশে। বিমানের গর্জন শোনা যায়।

নীরবতা ভাঙল শমিতা, 'এই আবিদ!'

'ম্‌ম্‌?' আলসেমিভরা কণ্ঠে সাড়া দিল আবিদ।

'ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'মেয়েলোকের মগজ বটে!' ফোড়ন কাটল আবিদ, 'ঘুমোলে কথা বলছি কীভাবে?'

'বল তো, কী চাই আমি?' প্রশ্ন করল শমিতা।

'জানালাটা খুলে দেব?'

'আরে না। আই মীন হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্ট?'

'তা কী করে বলি। জার্দানাকে বরং ডাকো। তোমার চেহারা দেখে সব বলে দেবে।'

অভিমানী কণ্ঠে শমিতা বলল, 'ঠিক আছে, তুমি ঘুমোও।'

'মহা মুশকিল,' অন্ধকারে স্ত্রীর গালে হাত বুলাল আবিদ। 'এত ভণিতা কীসের, বলে ফেল না কী চাও।'

'একটা বাচ্চা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে শমিতা। শুনে দুঃখ পায় আবিদ। দু'জনের শরীরে কোন ত্রুটি নেই। তবু ওদের কোন সন্তান নেই। স্ত্রীকে গভীর মমতায় আদর করল সে, 'আমরা তো বুড়িয়ে যাইনি, শমিতা।'

'দু'বছর পরে আমি হব বত্রিশ,' বলল শমিতা। 'তারপর মা হওয়ার ঝুঁকি দিনদিন বেড়েই চলবে।'

নিশ্চুপ আবিদ। কী বলবে সে, বলার তো কিছুই নেই।

'একটা উপায় অবশ্য আছে,' বলল শমিতা, 'আমরা দত্তক নিতে পারি!'

'তাতে প্রচুর খরচ,' বলল আবিদ, 'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, দালালের বায়না, গভর্নমেণ্টের পারমিশন, অনেক ঝামেলা!'

কোন ঝামেলা নেই। শুধু একটি মৃত্যু। চমকে ওঠে শমিতা। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবছে সে! স্বামীকে বলল, 'ধরো হঠাৎ কোন কারণে একটা বাচ্চা যদি আসে আমাদের সংসারে, অন্য কারও বাচ্চা, মজা হবে তাই না!'

আবিদ জিজ্ঞেস করল, 'তখন চাকরি করবে কেমন করে?'

'বেবী সিটার রাখব,' বলল শমিতা, 'সে-ই বাচ্চার দেখাশোনা করবে। আর তেমন কাউকে না পেলে দরকার হলে চাকরিই করব না। চাকরির চেয়ে আমার কাছে বাচ্চার টেক কেয়ার করাটা অনেক জরুরি।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল,' আবিদ জড়িয়ে ধরল স্ত্রীকে। 'কাঁঠাল আসুক, পরে পাহারার কথা ভাবা যাবে।'

'না গো, এখন থেকেই ভাবতে হবে আমাদের। একটা বাচ্চাকে মানুষ করা কম ঝক্কির ব্যাপার নয়।' ওর ঠোঁটের কোনার

হাসি আবিদ দেখতে পেল না। তার চোখ জড়িয়ে এসেছে ঘুমে।

ডেবী আবার উৎপাত শুরু করেছে। তার ওপর নাকি আত্মা ভর করেছে। ড. রবার্টসন ওকে দেখতে গেলেন। নার্সকে বললেন ইনজেকশন দিতে। ইনজেকশন দেয়ার পরে মেয়েটা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল। ডাক্তারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে লাগল, 'সেভেণ্টি নাইন, সেভেণ্টি এইট, সেভেণ্টি সেভেন, সেভেণ্টি সিক্স, সেভেণ্টি ফাইভ, ও মা গো ও ও ও ও...

চমকে গেলেন রবার্টসন। ঘটনা কী! দেখলেন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রোরি। রেগে গেলেন ডাক্তার, 'রোরি! তুমি আবার এখানে এসেছ কেন? তোমাকে দেখলেই ডেবী ভয় পায়। তবু এসেছ?'

'ডাক্তার,' খুব নরম গলায় বলল রোরি, 'আমার গ্রানির খুব কষ্ট, আপনি চলেন না। গ্রানিকে একটু দেখবেন।'

রাগ পানি হয়ে গেল রবার্টসনের। ছুটে গেলেন অ্যাডেলিন বেটসের কাছে। বৃদ্ধার সত্যি কষ্ট, শ্বাস ফেলতে পারছেন না। নাতিকে বুকের কাছে টেনে নিলেন তিনি। বললেন, 'আমার যাবার সময় হয়ে এল, বাপ। তোকে আমি ডাক্তার রবার্টসনের কাছে দিয়ে যাচ্ছি। ভাল হয়ে থাকিস, সোনা আমার। ঈশ্বর ছাড়া তোর আর কেউ নেই।'

'গ্রানি...' রোরির দু'চোখে টলমল করছে পানি। রবার্টসন, আরও চারজন ডাক্তার এবং শমিতা বসে আছে খাটের কিনারায়।

'কাঁদিস না, সোনা,' বললেন বৃদ্ধা। 'সেই প্রার্থনার কথা মনে আছে? রোজ রাতে শোবার আগে প্রার্থনা করবি। কোন মুসিবত তোর কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

'মনে আছে, গ্রানি,' এবার কেঁদেই ফেলল রোরি। শমিতার চোখেও পানি।

'তা হলে আমার সঙ্গে প্রার্থনা কর,' অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন অ্যাডেলিন, 'মুলতানো সুমালতো...'

'মুলতানো সুমালতো,' উচ্চারণ করে রোরি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'আইনা আন কারপানু...বল বল, সোনা আমার।'

'আইনা আন কারপানু,' কান্না ভাঙা গলায় বলে রোরি।

'সলদি নিক্‌কলি,' বৃদ্ধা মন্ত্রের মত আওয়াজ করেন।

রোরিও বলে, 'সলদি নিক্‌কলি।'

'সাবাস, সোনা, এবার আমায় চুমো খা।'

রোরির দু'চোখের পানি তার নানীর গালে পড়ে। সে তার নানীকে চুমু খায়। ডাক্তার রবার্টসন সঙ্গী ডাক্তারদের হাতের ইশারা করলেন। বুড়িকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো।

সেদিনই বিকেল চারটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে অ্যাডেলিন বেটস মারা গেলেন। টেলিফোনে রবার্টসন সংবাদটা যখন শমিতাকে দিলেন তখন আবিদ টেলিভিশনে অ্যাকশন সিরিজ ম্যাকগাইভার দেখছে।

টেলিফোনে কথা বলে সে স্বামীর পাশে এসে বসল। ওর দিকে এক ঝলক তাকাল আবিদ। মনে হলো মিনি পর্দার নায়িকার চাইতেও শমিতার চোখে-মুখে অনেক বেশি প্রফুল্লতা ঝরছে।

ছয়

নানীর মৃত্যুর পঞ্চম দিনে রোরি এল আবিদ হাসানের বাড়িতে।

তাকে দত্তক নিয়েছে শমিতা। ছেলেটাকে রাতের খাবার খাইয়ে একটা কামরায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে। ড্রয়িং-রুমে বসে গল্প করছে স্বামী-স্ত্রী।

'ছেলেকে নিয়ে এত মাতামাতি শুরু করে দিলে,' বলল আবিদ। 'চাকরি করার ফুরসত তোমার মিলবে কিনা কে জানে!'

'শুধু কি আমার একার? রোরি কি তোমার ছেলে নয়?' সহাস্যে বলে শমিতা, 'ডকুমেন্টে তো বাপ হিসেবে তোমার নামই লেখা হয়েছে।'

'প্রবাদটা জানো তো,' সিগারেট ধরাল আবিদ। 'পর কখনও আপন হয় না।'

এমন সময় একটা শব্দ এল রোরির কামরা থেকে।

শমিতা রোরির ঘরে গেল। ছেলেটা ধবধবে সাদা বিছানায় বসে আছে। বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে শমিতা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, রোরি?'

'ঘুম আসছে না,' বলল রোরি। 'আমার কপালে হাত রেখে গ্রানির মত প্রার্থনা করো।'

'আমার তো সব মনে নেই,' বলল শমিতা, 'তুমি মনে করিয়ে দাও।'

মনে করিয়ে দেয় রোরি। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে, 'মুলতানো সুমালতো আইনা আন কারপানু সলদি নিক্কলি।'

বার পাঁচেক শমিতার সঙ্গে শব্দগুলো উচ্চারণ করল রোরি। ওর এখন ঘুম আসছে। বলল, 'গুডনাইট।'

ছেলের কপালে চুমু দিল শমিতা, 'গুডনাইট, হ্যাভ সুইট ড্রিমস।'

ড্রয়িংরুমে ফিরে এল শমিতা। ওর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল আবিদ।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে শমিতা বলল, 'ওর গ্রানি একটা মন্ত্র

পড়ত। পড়লে রোরির ঘুম আসে তাড়াতাড়ি। ওকে সেই মন্ত্রটা শোনালাম।'

'মন্ত্রের অভাবে এতক্ষণ ওর ঘুম আসেনি?' ভুরু কোঁচকাল আবিদ।

'হুঁ' বিব্রত শোনাল শমিতার কণ্ঠ।

'এই দুনিয়ায় রোরির মত অনাথের অভাব নেই,' বিরক্ত গলায় বলল আবিদ, 'মন্ত্র না শুনেই তারা ঘুমোয়। ওসব মন্ত্র ফন্ত্র আমি কিন্তু বরদাশত করব না।'

'দেখ, ওর নানী মরেছে বেশিদিন হয়নি। অভ্যাসটা কাটিয়ে উঠতে ওকে একটু সময় দেয়া উচিত।'

'তা দাও,' পরিহাস করল আবিদ, 'তবে ওইসব কঠিন শব্দ আউড়িয়ো না। দরকার হলে, কোকাকোলা, পেপসী কোলা, ডিলাক্স, ডিজনী–এসব উচ্চারণ অনেক সহজ।'

'ডাক্তার জানতে চেয়েছে কেমন করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খসিয়েছে সে। ও বলল কী জানেন? বলল, সেটা দেখানোর জন্য কি এখন আরেকটা আঙুল খসাবে! পরিষ্কার বলল, নখ খসে রক্ত বেরুচ্ছে, রক্ত বন্ধ কর। সেটাই তোমার কাজ। কেমন করে কী হলো সেটা জেনে তোমার কী?'

পাজির পা ঝাড়া রকির বীরত্ব বর্ণনা করে হো হো করে হাসল জার্দানা। শমিতা আর এলিজাবেথ মৃদু হাসে। দু'জনের কারোরই আহত রকির জন্য দরদ নেই। কারণ ওরা জানে অকারণে তাদের সন্তানদের মারধর করে মজা পায় রকি।

'আরেকবার গেছি বইয়ের দোকানে,' জার্দানা বলে, 'একধারে আমি বই বাছছি, অন্যধারে রকি। ওর হাতে প্লেবয় ম্যাগাজিন দেখে এক বুড়ি জিজ্ঞেস করল, "তোমার মা কি জানেন যে তুমি এসব পচা জিনিস হাতড়াও?" অমনি রকি বলল, "এই বুড়ি,

তোমার স্বামী কি জানেন যে তুমি বেগানা ব্যাটাছেলের সঙ্গে কথা বল?"'

অবাক হলো শমিতা। এই মহিলা তাঁর ছেলের মাথা খাচ্ছেন। অথচ ভাবছেন ছেলে তাঁর কী বুদ্ধিমান। বেয়াদব ছেলেকে আস্কারা দেয়াটা তাঁর কাছে গর্বের বিষয়!

'গত শুক্রবার, বাগানে খেলছিল লুসি।' বলল এলিজাবেথ। 'হঠাৎ রকি এসে মেয়েটাকে হাঁটু দিয়ে এক গোত্তা মারল। লুসি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। দাঁত দিয়ে রক্ত...'

'বুঝলেন, লিজ, রকির কথা শুনে বুড়ির চেহারাখানা যা হয়েছিল না!' হো হো করে হাসে জার্দানা। ছেলের নামে নালিশ শুনতে সে নারাজ।

এলিজাবেথ থ বনে গেল। শমিতা জানতে চাইল অতিথিদের আরেক প্রস্থ বরফ-চা দেবে কিনা।

'আরে না, না,' গর্বিত মা বলে, 'আমার যাবার সময় হলো। সাড়ে সাতটা বাজে। রেজালা রাগ করবে। আমাকে ফেলে ও কখনও ডিনার খায় না। এলিজাবেথ, আপনি আর জোসেফ আসুন না একদিন ডিনারে।'

'কবে আসব বলুন?' জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

'আচ্ছা, দিনটা আমিই ঠিক করে দেব,' হাসে জার্দানা, 'কষ্ট করে আগামী সপ্তাহে আমায় একটু ফোন করবেন, কেমন! আজ আসি।'

'আগামী সপ্তাহে ফোন করবে,' ভেংচি কাটল এলিজাবেথ জার্দানা চলে যাবার পর। 'চার বছর ধরে ওই এক কথাই শুনছি। আগামী সপ্তাহ সবসময়েই সাতদিন দূরে রাখে জার্দানা।'

'বলেন কী!' বিস্মিত শমিতা। 'লোক দেখানো দাওয়াত?'

'হ্যাঁ,' বলল এলিজাবেথ, 'মহা কিপটা। শুধু খাবে, কাউকে খাওয়াবে না।'

সাত

আবিদ খুব ঘুমকাতুরে। ধাক্কা মারলেও জাগে না। শমিতা কনুইয়ের গুঁতো দিল, 'এই, ওঠো। ড্রয়িংরুমে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে।'

'কী হয়েছে, অ্যাঁ!' বিরক্ত হলো আবিদ। চমকে গেছে।

'ড্রয়িংরুমে শব্দ হচ্ছে।'

চোখ মেলল আবিদ। দেয়াল ঘড়িতে রাত একটা বেজে সাতান্ন মিনিট। কান খাড়া করল সে। ঠিকই তো ওদিক থেকে শব্দ আসছে।

'তুমি কি টিভি অন করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল আবিদ।

'না, টেলিভিশনের শব্দ নয়। ওখানে কেউ হাঁটাচলা করছে।'

'ধ্যাৎ।' রেগে গেল আবিদ। 'আমি শুনছি টেলিভিশনের শব্দ!' শরীরের আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে ড্রয়িংরুমের দিকে এগোল সে। পেছন পেছন শমিতাও গেল।

পা টিপে টিপে কামরায় ঢুকল আবিদ। দেখল অরেঞ্জ সোডা খেতে খেতে সোফায় বসে টিভি দেখছে রোরি।

'এত রাতে এখানে কী করছ?' জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'টিভি দেখছি,' বলল রোরি, 'ঘুম আসে না। খুব হট্টগোল।'

বাতি জ্বেলে, টিভি সেট অফ করল আবিদ। 'আমি কি জোরে নাক ডাকছিলাম?'

'না, তুমি নও। ওরা শুধু আমার সঙ্গে কথা বলে,' সোডায় শেষ চুমুক দিল রোরি।

'ওরা কারা?' জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'ওই যে ওরা। আমার বেডরুমে।'

একটু ভয় পেল শমিতা, তাকাল স্বামীর দিকে। আবিদ বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

রোরির কামরায় গেল স্বামী-স্ত্রী। খাটের ওপর, নীচ, তোষকের তলা সবখানে খোঁজ করল। এমন কিছু চোখে পড়ল না যা ছেলেটির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

'দেখলে তো,' রোরিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে শমিতা বলল, 'তোমার বাবা তন্নতন্ন করে সব দেখেছেন। কেউ নেই। ভয় পাবার কিছু নেই।'

হাই তুলল রোরি, 'কেউ আগেও ছিল না। শুধু গলার আওয়াজ। ওরা বহু পুরানো দিনের ঘটনার কথা বলে।'

'ও কিছু না,' প্রবোধ দেয় শমিতা, 'স্বপ্ন। এখন ঘুমাও। সকালে আবার স্কুলে যেতে হবে।'

'ওকে, মা, গুডনাইট।'

আবিদের পাশে শুয়ে শমিতা বলল, 'মন্ত্র পড়া বন্ধ করা উচিত হয়নি আমার। আগে তো বরাবর ওর ভাল ঘুম হয়েছে। চার মাস আগে মন্ত্র বন্ধ করার পর থেকে ওর ঘুম ভাল হচ্ছে না। আজ নিয়ে তৃতীয়বার ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল।'

'ওর ঘুম আনার জন্য সুমালতো ফুমালতো জপার কোন দরকার নেই,' বলল আবিদ। 'রোরির একটু ওভার অ্যাকটিভ ইমাজিনেশন। ওর নতুন মায়ের মতই।'

আবার কনুইয়ের গুঁতো মারল শমিতা। আবিদ 'উহ্' করে একটু দূরে সরে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

তিন বছর পরে...

'আট বছর বয়স রোরির। আমরা তো অবাক ও এমন জিনিস আঁকা শিখল কোথায়?' টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলল মিস হেলেন, রোরির স্কুলের এক শিক্ষিকা।

'আপত্তিকর কিছু?' জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'আপত্তিকর নয়, বিস্ময়কর,' জানাল হেলেন, 'শুধু আর্ট ক্লাসে নয়, সব ক্লাসে ওর কাজ দেখে শিক্ষকরা তাজ্জব। আচ্ছা, আপনার ছেলের মধ্যে কি কখনও ওভার অ্যাকটিভ ইমাজিনেশন দেখেছেন?'

'না তো!' জবাব দিল শমিতা। 'আপনি এসব জানতে চাইছেন কেন?'

'ফোনে সব বলা যাবে না। আপনাকে ওর কাজের কিছু নমুনা দেখাতে চাই। কখন আসব বলুন। আমরা কথা বলার সময় রোরি বাড়ি না থাকলে ভাল হয়।'

'আজ সন্ধ্যায় আসুন। রোরি ওর বাবার সঙ্গে হকি খেলা দেখতে যাবে।'

মিস হেলেন ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এসে হাজির। বয়স পঁচিশ। সুন্দরী, কাঁধে একটা বড় ব্যাগ। পরিচয়-পর্ব এবং চা পান শেষে ব্যাগের ভেতর থেকে ৮ ইঞ্চি/১০ ইঞ্চি সাইজের কতগুলো আর্ট পেপার শীট বের করল সে। বলল, 'মিসেস হাসান, রোরি সব সাবজেক্টেই খুব ভাল। তবে আমার নজর কেড়েছে ওর আঁকা ছবি। ও যে খুব ভাল ছবি আঁকে, তা জানেন?'

'না। বাড়িতে ওকে মনোযোগ দিয়ে এরোপ্লেন আঁকতে দেখেছি। ওর বাবার ধারণা বড় হলে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে,' হাসে শমিতা। 'তাই উনি ওকে প্লেন, রেলগাড়ি এসব আঁকতে উৎসাহ দেন।'

'স্কুলে গত ক'মাসে ওর আঁকার হাত পাকা হয়ে যায়,' বলল হেলেন। 'একদিন ক্লাসে বললাম, যার যা মন চায় আঁকো তো দেখি। সবাই ফ্রি স্টাইলে আঁকতে থাকে। কিন্তু রোরি যা এঁকেছে তা আপনাকে খুশি করতে বলছি না, কেবল হাই গ্রাজুয়েটের পক্ষেই সম্ভব।' একটা আর্ট পেপার দেখাল হেলেন। তাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের ছবি। গুলি খেয়ে সৈন্যরা পড়ে যাচ্ছে, তাদের শরীর থেকে রক্ত পড়ছে।

'এরকম ছবি ওকে কখনও আঁকতে দেখিনি,' শমিতা যুগপৎ গর্বিত ও বিস্মিত।

'আরেকদিন ক্লাসে ছেলেমেয়েদের দেখা জানোয়ার আঁকতে বললাম। রোরি আঁকল এই ছবি।' ছবিটি দেখাল শিক্ষিকা। পেশীবহুল বিশালদেহী এক প্রাণী, দু'পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে, মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর, নাক ভোঁতা, ঠোঁট সুচালো।

'এটা তো গরিলা, নাকি?'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলল হেলেন, 'ভেবেছি চিড়িয়াখানা বা সার্কাসে দেখে এঁকেছে। কিন্তু রোরি বলল এটা গরিলা নয়, এটা ওহমাহ।'

'মানে বিগফুট? কানাডায় দেখা গেছে যে দৈত্যাকার মানুষ? আই মীন গুজবে শোনা রহস্যময় তুষারমানব?'

মাথা দোলাল হেলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কোন কোন এলাকায় এরকম ভয়ঙ্কর দর্শন প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন। কোথায় সে প্রাণী দেখেছে বলার জন্য ওকে চেপে ধরি আমি। কিন্তু রোরি কিছু না বলে শুধু মুখ টিপে হেসেছে।'

হেলেন আরও কতগুলো ছবি দেখাল: অষ্টাদশ শতাব্দীর সমুদ্র যুদ্ধ, এডমণ্ড হিলারির এভারেস্ট অভিযান, গুহাবাসীদের হাতে আক্রান্ত প্রকাণ্ডদেহী জানোয়ার ইত্যাদি। নিখুঁত আঁকা এসব ছবির

মধ্যে একটা ব্যাপার মন কাড়ে, সেটা হলো ডিটেলের বিষয়ে আঁকিয়ের নিষ্ঠা। ১৭০০ সালের জাহাজ অবিকল সেকালের জাহাজের ফটোগ্রাফের মত।

'খুব সুন্দর এঁকেছে। আমাকে এসব দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' বলল শমিতা। 'কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না ছবিগুলো আপনার চোখে অস্বাভাবিক ঠেকল কেন?'

'আমি নিজেও ঠিক জানি না, শমিতা,' বলল হেলেন। 'সম্ভবত ছবির সাবজেক্ট আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কেবলই মনে হয়, রোরি তার স্মৃতি থেকে এসব আঁকে। আচ্ছা, ও কি বই-পুস্তক বেশি পড়ে?'

'পড়ে বৈকি। বেশিরভাগই কমিক বুক, ওর বাবা এনে দেয়। ওর আঁকা ছবিগুলো ওই বই পড়ার ফল ভাবছেন?'

'হতেও পারে। কিন্তু এই চিঠিটা আমায় ধাঁধায় ফেলেছে। এই যে দেখুন।' হেলেন একটা খাতার পাতা উল্টিয়ে মেলে ধরল শমিতার সামনে, 'প্রতি শুক্রবার বাড়িতে চিঠি লেখা শেখানো হয়। রোরি কী লিখেছে পড়ুন।'

"From worst of other evils, pains and wrongs; but made hereby obnoxious more, to all the miseries of life, life is captivity, among inhuman foes."

স্তম্ভিত শমিতা, 'আমার রোরি লিখেছে এটা?'

'সে এটা উদ্ধৃত করেছে। মিল্টনের স্যামসন এগানিস্টেস-এ এই কথাগুলো আছে, বইটি ছাপা হয় ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।'

'আমি এ বই পড়িনি। আমার স্বামীও ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য খুব একটা পছন্দ করেন না।'

'নিশ্চয়ই কোথাও এসব পড়েছে রোরি। মিসেস হাসান, যদি

অনুমতি দেন তো রোরিকে আমি স্কুলের মনোবিদের কাছে নিয়ে যাব। আমার ধারণা ওর ভেতরের তাড়নাগুলো ও বুঝতে পারছে না।'

'মিস হেলেন,' শমিতা শীতল কণ্ঠে বলল, 'রোরির যদি মানসিক অবস্থার পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয় তা হলে আরও নামকরা বিশেষজ্ঞ দেখানোর সামর্থ্য আমাদের আছে।'

শিক্ষিকা বিব্রত হয়ে ক্ষমা চাইল। লজ্জা পেল শমিতা। হেলেন বিদায় নিতে চাইলে তাকে আরেক কাপ চা পানের অনুরোধ করল শমিতা।

সে রাতে ওর আর সহজে ঘুম এল না।

আট

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। আবিদ আর শমিতা যে যার কাজে ব্যস্ত। আবিদ তার অফিস নিয়ে মেতে আছে। শমিতা তার ছেলেকে নিয়ে। রুটিন মাফিক কাজ করে সে। মুটিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য সকালে ব্যায়াম, বিকেলে মাদক-নিরোধ কমিটির অফিসে হাজিরা দেয় কিংবা লেডিজ ক্লাবে আড্ডা দেয়।

কমিটি মিটিং থেকে রাত আটটায় একদিন বাড়ি ফিরেই শমিতা তার নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রথম আলামত দেখতে পেল।

ঘরে ফিরে ও আবিদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছিল। এক

ফাঁকে রোরিকে দেখার জন্য ওর কামরায় গেল।

'আবিদ,' শান্ত কণ্ঠে ও ডাকল, 'এক মিনিটের জন্য এসো।'

স্ত্রীর মুখে উদ্বেগ দেখে আবিদ জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

'ওর ঘুমোতে যেন কষ্ট হচ্ছে। দেখ না।'

কামরায় ডিমলাইট জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল রোরির কপালে ঘাম জমে গেছে, নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। 'তোমার কি মনে হয়...'

আবিদের কথা শেষ হবার আগেই কিচেনে চিনামাটির জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ হলো।

'আবিদ!' চেঁচিয়ে উঠল শমিতা।

আবারও চুরমার হলো যেন কিছু। যেন কাঁচের গ্লাসগুলো কেউ আছাড় মেরে ভাঙছে। ওরা ছুটে গেল অন্ধকার কিচেনে। বাতি জ্বেলে দেখল, সব স্বাভাবিক। শুধু দুটো গ্লাস মেঝেতে টুকরো হয়ে আছে।

টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে উপুড় হলো শমিতা।

এমন সময় টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানি বিস্ফোরিত হলো। মৃৎপাত্রটা প্রচণ্ড শব্দে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে শূন্যে লাফিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুতবেগে। বিস্ময়ে ওদিকে তাকাতেই শমিতার চোখের নীচে অল্পের জন্য আঘাত হানল না ফুলদানির একটা টুকরো।

দু'মিনিট পরে বিস্ফোরিত হলো মিটসেফের ওপর রাখা চিনির বোয়েম।

ভয়ে চিৎকার দিল শমিতা। বোয়েমের উড়ন্ত টুকরো দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেল।

ওরা দেখল মিটসেফের ওপর ট্রের মধ্যে সাজানো চায়ের কাপ অক্ষত আছে।

তবে পরক্ষণে কাপগুলো বিস্ফোরিত হতে দেখে আঁতকে উঠল

আবিদ। 'আল্লাহ্!'

'খোদা, কী হচ্ছে এসব!' বলল শমিতা।

ভয়ার্ত এবং বিভ্রান্ত হাসি ফুটল আবিদের মুখে, 'ওগুলো...ওগুলো বিস্ফোরিত হচ্ছে।'

ভেতরে রাখা কাঁচের প্লেটের বিস্ফোরণের বেগে এবার খুলে গেল মিটসেফের দরজা। বিস্ফোরিত একটা প্লেটের এক-চতুর্থাংশ জানালার কাঁচ ফুটো করে বাইরে চলে গেল।

খানিক পরে আবার বিস্ফোরণ। এবার বিচূর্ণ প্লেটগুলোর কুচি প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতেই জানালার ফ্রেম ভেঙে গেল।

তারপর, নীরবতা।

আবিদ ক্ষয়ক্ষতি দেখতে থাকে সাবধানে। কিচেনে যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। কাঁচের সব জিনিস ভেঙে চুরমার।

'রোরি?' শমিতার চোখে ভয়, 'ভয়ে ছেলেটার কী দশা হয়েছে ঈশ্বরই জানেন।'

ছেলের বেডরুমে এসে ওরা থমকে দাঁড়ায়। রোরি প্রশান্ত চেহারা নিয়ে ঘুমাচ্ছে। মুখে মৃদু হাসি।

ঘরের ভেতরে ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরও শমিতা কী করে সেই রাতে ঘুমাতে পেরেছে, বিস্ময় প্রকাশ করে এলিজাবেথ। রোরি নিরাপদ আছে, এটা নিশ্চিত হতে পেরেই শমিতা স্বাভাবিক থেকেছে বলে জানায়।

'কাউকে ঘটনাটা বলবেন না যেন,' ওয়াশিং মেশিনে ঢোকানোর জন্য ময়লা কাপড়-চোপড় বাছতে বাছতে অনুরোধ করল শমিতা। 'আবিদ তো ব্যাপারটাকে কিছুতেই ভুতুড়ে বলে স্বীকার করছে না।'

'আবহাওয়ার তারতম্যের কারণেও হঠাৎ করে কাঁচের জিনিসপত্র ফেটে যায়, একটা বইতে পড়েছি আমি,' কাপড় বাছার

কাজে শমিতাকে সাহায্য করে এলিজাবেথ, 'আরি, এটা কী! রোরির পাজামায় এত কাদা লাগল কোত্থেকে?'

'তা তো জানি না...' জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল শমিতা। রোরির পাজামার দিকে তাকাল। 'গেল সোমবারে কিনেছি পাজামাটা। দেখুন, ছিঁড়েও ফেলেছে দুষ্টটা।'

ও চট করে ছুটে গেল রোরির বেডরুমে।

জানালার কাছে কার্পেটে কাদার দাগ! বাইরে, বাড়ির চত্বরে নরম মাটিতে পায়ের দাগ; লাফ দিয়ে পড়লে যেমন দাগ পড়ে। চমকে গেল শমিতা।

'কী দেখছেন?' এলিজাবেথের প্রশ্ন। সে ইতিমধ্যে কামরায় ঢুকেছে। ইশারায় ঘরের ভিতর-বাইরের দাগগুলো দেখাল শমিতা।

'রোরির পায়ের দাগ এগুলো?'

'ও রাতের বেলায় ঘর থেকে বেরোয়,' চিন্তিত শমিতা, 'বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডায়, খালি পায়ে ছেলেটা কেন বের হয়!'

'সেই যে পণ্ডিতেরা বলেন, মাঝে মধ্যে প্রকৃতির কাছে ধরা দেয়া ভাল,' রসিকতা করে এলিজাবেথ, 'হয়তো আকাশের চাঁদ দেখতে সাধ জাগে ছেলেটার।'

রসিকতা কানে যায়নি শমিতার। 'এভাবে বাইরে বেরুলে ওর নির্ঘাত নিউমোনিয়া হবে!'

ঘণ্টাখানেক পরে স্কুল থেকে ফিরল রোরি। ততক্ষণে এলিজাবেথ চলে গেছে। ছেলেকে দুধ আর বিস্কুট খেতে দিয়ে শমিতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পাজামায় কাদা লাগল কোত্থেকে?'

'সকালে আছাড় খেয়েছি বাগানে,' বলল রোরি।

'রোরি! তোমায় না বলেছি মা-বাবার সঙ্গে কখনও মিথ্যে বলতে হয় না,' বলল শমিতা।

লজ্জা পেল রোরি। মাথা নিচু করে বলল, 'মা, গতরাতে আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম।'

'কেন বেরিয়েছ?' জানতে চাইল শমিতা।

'মন চাইল তাই,' গলা খাঁকারি দিল রোরি, 'একটু আশেপাশে চক্কর দিয়ে এলাম।'

'শোন, রোরি! তাকাও আমার দিকে,' বলল শমিতা। 'কখনও আর এমন করবে না। তোমার অসুখ করবে। তোমার অসুখ করলে আমাদের খুব কষ্ট হবে, বুঝলে, সোনা!'

নয়

সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেই আবিদ বাথরুমে ঢুকল গোসল করতে। সেখানেই স্বামীকে রোরির বাইরে যাওয়ার কাহিনি শোনাল শমিতা। আবিদ শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে গুনগুন গান গাইছে।

'আমার কথাগুলো কি শুনলে?' জিজ্ঞেস করল শমিতা। 'কী করবে ঠিক করেছ?'

'ছোট্টবেলায় গরমকালে কতদিন আমি চুপি চুপি ঘর থেকে রাতে বেরিয়ে বিলে মাছ ধরতে গেছি,' বলল আবিদ, 'এতে দোষের কী?'

'তা হলে ছেলেকে তুমি কিছুই বলবে না?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল শমিতা।

'অবশ্যই বলব,' হাসল আবিদ। 'ওকে বলব, বৃষ্টি বাদলার মধ্যে যেন না বেরোয়। গরমকাল আসুক, তখন আপত্তি করব না।'

কাঁচের জিনিসপত্র বিস্ফোরিত হবার আটদিন পরের শনিবার। সকালে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে আবিদ। হঠাৎ, ওর বুকের ওপর রোরি লাফ দিয়ে পড়ল। আবিদের দম বন্ধ হবার জোগাড়! আনন্দে হাসছে রোরি।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে লুসি। মেয়েটাকেও লাফ দিতে বলে রোরি।

'দেখাচ্ছি মজা,' বলে আবিদ দু'জনকে ঘাড় ধরে এনে জোর করে কম্বল চাপা দিল। বলল, 'চুপটি করে থাকো। দেখছ না বই পড়ছি?'

ওরা দু'জনেই কম্বল থেকে বেরুতে চাইছে, হাসছে খিলখিল করে। আবিদও একহাতে চেপে ধরে রাখে ওদের।

'নাশতা রেডি,' জানাল শমিতা। 'তবে নিয়ে আসতে পারব না। ডাইনিং-এ গিয়ে খেতে হবে।'

'চমৎকার,' কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে রোরি। 'আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'লুসি, তুমি আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবে?' পড়শীর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'কী নাশতা বানিয়েছ, মা?' জানতে চাইল রোরি।

'হ্যাম, ডিম, টোস্ট আর ফলের রস।'

'না, ধন্যবাদ,' বলল লুসি। 'আমি খেয়ে এসেছি। এখন যাই। আবার পরে আসব।' রোরির দিকে ফিরল সে। তারপর লাফ মেরে নামল বিছানা থেকে। শমিতাকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডান কাঁধে ছেলেকে তুলে নিল আবিদ।

রোরির এক পায়ের পাজামা একটু উপরে উঠে গেল। ওর পায়ের গোড়ালি থেকে উরু পর্যন্ত সোনালি পশম নজরে পড়ল আবিদের; বিস্মিত হলো সে।

নাশতা সেরে রোরি খেলতে গেল। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে খোশগল্প করছিল স্বামী-স্ত্রী।

আবিদ কায়দা করে প্রসঙ্গ তোলে, 'ছেলেরা কত বছর বয়সে সাবালক হয় বল তো?'

'তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে। কেউ কেউ আরও দেরিতে।'

'তা-ই তো জানতাম,' বলল আবিদ, 'কিন্তু রোরির তো আট বছর বয়সেই দেখছি বড় বড় পশম গজিয়েছে পায়ে।'

'সব বাচ্চারই পশম হয়। ওর যদি দাড়ি গজাত সেটাই বরং অস্বাভাবিক ব্যাপার হতো।'

'সোয়া ইঞ্চির মত লম্বা ঘন পশম রোরির,' বলল আবিদ। 'ঠিক আমার মত।'

'এটা কি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আলোচনা করার মত বিষয়?'

'তা হলে কোথায়? বাথরুমে বসে আলোচনা করব?'

'না, কখনোই আলোচনা করব না,' বলল শমিতা। 'ছেলেমেয়ের সাবালকত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনায় থাকবে মা, আর বাপ চিন্তা করবে ছেলেটা ফুটবলে চৌকশ হবে কদ্দিনে।'

'বাহ্, কী সুন্দর মুক্ত-বুদ্ধি, আমার পোলার মা।'

'শাট আপ!' কপট ধমক মারে শমিতা, 'ফিনিশ ইওর কফি।' টেবিল ছেড়ে সে স্টোররুমের দিকে পা বাড়াল।

শনিবারের মধ্যাহ্ন শনিবারের সকালের মতই দুর্লভ। কর্মব্যস্ত মানুষ এদিনটা উপভোগের জন্য ছ'দিন ধরে অপেক্ষা করে। যারা করে না, তারা টেরই পায় না কখন রোববার এসে পড়ে।

কিটি নামের বিড়ালছানার কাছে সবদিনই শনিবার। রিচার্ড লেভিন নামে বীমার দালালের পাঁচ বছরের মেয়ে বেটির প্রিয় বেড়াল কিটি। খুবই নিরীহ।

সে কুকুর দেখলে পালায়, বড় বড় বিড়াল দেখলে ভয়ে কাঁদে এবং দু'পেয়ে শত্রুর গন্ধ পেলেই দৌড়ে গিয়ে বেটির বুকে আশ্রয় নেয়।

সেদিন শনিবার সকালটা ছিল উত্তপ্ত। দুপুরে গরম পড়ছিল একটু বেশি। কিটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। লাফালাফি করছে ফুলবাগানের এখানে-সেখানে।

হঠাৎ ওর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে; চিৎকার করে মনিবকন্যা বেটিকে ডাকার চেষ্টা করেছে, কোন শব্দ বেরোয়নি গলা দিয়ে।

উহ্ কী কষ্ট! সে যতই চেষ্টা করে শ্বাস নেবার জন্য, ততই প্রবল থেকে প্রবলতর হয় একটি হাতের চাপ, ওর কণ্ঠনালি বন্ধ হয়ে আসে।

ঈশ্বরের এই জগতে, শনিবারের সেই মধ্যাহ্নে ছোট্ট একটি প্রাণী মারা গেল। শনিবারে কোন প্রাণীর মৃত্যু এটাই প্রথম নয় এবং শেষও নয়।

দশ

ক্লাবের নাম গোল্ডেন মাস্ক। সদস্যরা মধ্যবিত্ত, ধনী, রাজনৈতিক কর্মী, মাঝারি চাকুরে এবং গৃহবধূ। সব ক্লাবের মত এ ক্লাবেরও

বড় একটা সময় ব্যয় হয় পরচর্চায়। ক্লাবের লক্ষ্য হলো, বন্যপ্রাণী রক্ষা করা। তাই সুযোগ পেলেই সদস্যরা বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে। যুক্তি আছে এদের। যেসব প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটে দ্রুতগতিতে তাদের সংখ্যা না কমালে বিরল প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

ইদানীং গোল্ডেন মাস্ক ক্লাব বিতর্কিত তুষারমানব আদতেই তিব্বতে আছে কিনা, কিংবা 'ওহমাহ' নামক বিশালকায় প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আফ্রিকার কোন কোন এলাকায় 'তাজেলউর্ম' নামের প্রকাণ্ড জলজপ্রাণী দেখা যায় বলে যে ঘটনা আছে সে বিষয়েও ক্লাবের কিছু কিছু সদস্য নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে।

শুধু তাই নয়, আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চলে এক ধরনের 'বন মানুষ' ঘুরে বেড়ায় এবং কেউ কেউ সেই বন মানুষ দেখেছে বলে দাবি করা হয় বই-পুস্তকে, তাও সদস্যদের মনোযোগ কেড়েছে।

গত ক'মাসে এ ক্লাবে অন্তত জনা পাঁচেক প্রাণিবিজ্ঞানী এসে বিরলপ্রায় অদ্ভুত প্রাণীর উৎস, বিকাশ এবং বিনাশ সম্পর্কে বক্তৃতা করে গেছেন।

আরও একজন আসছেন কানাডা থেকে; ইনি বক্তৃতা করবেন আদি মানুষ সম্পর্কে। ভদ্রলোকের নাম ইয়েন ট্যানার। বয়স একান্ন বছর; প্রাণিতত্ত্বের ওপর বিস্তর পড়ালেখা ও অভিজ্ঞতা তাঁর। ঠিক হয়েছে, সুপণ্ডিতটি গোল্ডেন মাস্ক ক্লাবের সভাপতি রেজালা খানের বাড়িতেই উঠবেন।

ডান হাতের থাবা দিয়ে টেলিফোনের মাউথপিস ঢেকে আবিদ তার স্ত্রীকে বলল, 'রেজালা খানকে বলে দিই যে, ব্যাটার বকবকানি শুনলে আমার বমি আসে।'

'কেন, কী হয়েছে?' ভোটার তালিকা পড়ছিল শমিতা। তাদের

এলাকায় পৌর নির্বাচন দু'সপ্তাহ পরে। 'ও কেন দাওয়াত দিচ্ছে?'

'বলছে, কোন্ এক মহাপণ্ডিত এসেছে ওর বাড়িতে। সন্ধ্যায় ফিল্ম দেখাবে আর জ্ঞান দেবে আদি মানব প্রজাতি কোথায় আছে, কেমন করে আছে।'

'এর আগেও একবার গেস্টের অজুহাতে তুমি যাওনি,' বলল শমিতা। 'আজও সেই পুরানো অজুহাত দেখাবে?'

'তুমি বলছ, সপরিবারে দাওয়াত কবুল করব?' আবিদ তাকাল শমিতার চোখে, 'হরর উপন্যাস পড়েই ঘাবড়ে যাও, তুমি দেখবে ওইসব বিতিকিচ্ছিরি জুলজিক্যাল ফিল্ম? ওর মধ্যে তো হরর টাইপের অনেক জীবজন্তু দেখাবে।'

'হ্যাঁ, দেখব,' বলল শমিতা। 'ভয় কী, সঙ্গে তো তুমি আছই!'

রেজালা আর তার স্ত্রী জার্দানার সঙ্গ আবিদ ও শমিতার কাছে বিরক্তিকর। তবু ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য যাওয়া। রেজালা খানের মেয়ে রুখসারের বয়স এখন কুড়ি; নিজের যৌবন বিজ্ঞাপিত করতে ভালবাসে সে।

খুবই অমায়িক মানুষ ইয়েন ট্যানার। পাণ্ডিত্যের বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। দীর্ঘদেহ, হালকা-পাতলা গড়ন, কথাবার্তায় রসিকতা ও বুদ্ধির দীপ্তি। অতিথিদের মাঝে তিনি আলো হয়ে আছেন।

আবিদকে দেখে প্রথমে অভ্যর্থনা জানায় রুখসার; খুব সাজগোজ করেছে। দেখে মুগ্ধ আবিদ। রুখসারের ভাই চোদ্দ বছরের রকিও উপস্থিত। ছেলেটার চেহারাসুরত গুণ্ডার মত। শমিতাকে বলল, 'আন্টি, তুমি আবার রোরিকে আনলে কেন? বাচ্চা ছেলে, ও কি কিছু বুঝবে?'

ইয়েন ট্যানার সংক্ষেপে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সুমাত্রা, জাভা, মাদাগাস্কার এবং কেনিয়ার জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কত

রকম জন্তু জানোয়ার দেখেছেন জানালেন।

কানাডার পশ্চিমাঞ্চলে যৌবনে আট ফুট লম্বা লোমশদেহী যে প্রাণী তিনি দেখেছেন তাকে অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক নেকড়ে বলে অভিহিত করে বললেন, এরা কালের বিবর্তনে আস্তে আস্তে মানবগোষ্ঠির অবয়ব পেয়ে গেছে। তাই বলে, সবাই বিলুপ্ত হয়েছে এটা ঠিক নয়।

'হাইব্রিডের সমস্ত গুণ নিয়ে মানুষের অবয়বে বেঁচে আছে কেউ কেউ। এদের রয়েছে প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তি। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাব ও্দেরকে অবদমিত করে রেখেছে,' বললেন ইয়েন।

'আপনি যাকে দেখেছেন সে কোন্ প্রজাতির?' প্রশ্ন করে রেজালা খান।

'পাহাড়ের বাঁকে পলকের জন্য আমি ওই নেকড়েমানবকে দেখি,' হাসলেন ইয়েন। 'ভেবেছি, দৃষ্টি বিভ্রম। বহু বছর পরে নিশ্চিত হই যে আমার দেখায় ভুল ছিল না। আপনাদের একটা ফিল্ম দেখাব, দেখলে আপনারাও অবাক হয়ে যাবেন।

'ওয়াশিংটনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক কৃষি খামারের মালিক এই ফিল্মের নির্মাতা। ভদ্রলোক কখনোই নেকড়েমানবের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। কিন্তু তিনি নিজের খামারেই অবিশ্বাস্য এ প্রাণীর সাক্ষাৎ পান এবং মুভি ক্যামেরায় তাকে ধরে রাখেন।'

ঘরের বাতি নিভিয়ে প্রজেক্টর চালু করা হলো, দেয়ালে পড়ছে ফোকাস। বড় বড় গাছ, দূরের আকাশ, ফসলের ক্ষেত, ক্ষেতের উড়ন্ত পাখি দ্রুত ধাবমান, জীপ থেকে ছবি তোলা হয়েছে বোঝা যায়। খামারের সীমানায় লাগানো কাঁটাতারের বেড়া দেখা যাচ্ছে।

'দেখুন, জীপ চলছে চক্কর দিয়ে, খামার মালিক ফসল কেমন হয়েছে দেখছেন। এমন সময় জীপের ড্রাইভারের নজরে পড়ল অদ্ভুত কিছু একটা;' বলেন ইয়েন, 'মনিবের নির্দেশে ড্রাইভার

দক্ষিণমুখো হলো। জীপ যাচ্ছে অদ্ভুত প্রাণীটির কাছে। ...নিরাপদ দূরত্বে থেমেছে জীপ। ছ'ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ছে প্রাণীটি, যেন পাতলা কাগজ ছিঁড়ছে। বেড়ার উচ্চতা তার কাঁধ সমান।'

ক্যামেরা জুম করা হয়েছে। প্রাণীটির মুখ দেখা যায়, তার নাক ভোঁতা। ভয়াল চক্ষু, বড় বড় ধারালো দাঁত, চমকে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। বোঝা যায়, জীপের গর্জন শুনেছে।

'খামার মালিকের নির্দেশে জীপ ছুটছে সেখানে, যেখানে প্রাণীটি বেড়া ছিঁড়েছিল। একটু অপেক্ষা করুন, পরের ঘটনা দেখবেন,' বললেন ইয়েন।

আবার সেই পুরানো দৃশ্য দেখা গেল। ইয়েন বললেন, 'জীপটি ঘটনাস্থলের দিকে এগোয়। প্রাণীটা টের পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফের ছুটে আসে। ভয় পেয়ে খামার মালিক আর ড্রাইভার জীপ ফেলে পালায়। তারা দূরে গিয়ে আবার ক্যামেরা চালু করে। এবার দেখুন...'

লোমশদেহী প্রাণীটি লম্বায় প্রায় দশ ফুট। লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে। দাঁত বের করে যেন চিৎকার করছে। শমিতার কোলে বসে ছবি দেখছে আর দুলছে রোরি, ওর মুখ দিয়ে 'উঁ উঁ' মৃদু শব্দ বেরুচ্ছে।

সেই অদ্ভুত নেকড়েমানব পরিত্যক্ত জীপের কাছে এল। প্রচণ্ড ঘুষি মারল জীপের গায়ে। 'আ...আ...আ...উ' বলে চিৎকার করে উঠল রোরি। শমিতা ছেলের কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে। রুখসার বসেছে আবিদের পেছনের চেয়ারে; সে আবিদের গলা জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে।

জীপের সামনের বাম্পারে হাত রাখল লোমশ প্রাণীটা; তারপর মাটি থেকে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারল সজোরে।

চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল জীপ।

রোরি 'আউফ' বলে জোরে চিৎকার করতেই অন্ধকার ঘরে ভারী কিছু পতনের শব্দ হলো।

'লাইট জ্বালাও,' চিৎকার দিল রেজালা খান, 'রকি, জলদি লাইট।'

ছবি শেষ। রকি অন্ধকারে হাতড়ে সুইচ খুঁজে জ্বেলে দিল বাতি। আলো জ্বালাবার পরেও কারও মুখে কোন কথা নেই।

ড্রয়িংরুমের প্রকাণ্ড দরজা কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

'কে ভাঙল, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল রেজালা, 'আরে, আমার জানালার সব কাঁচও তো দেখছি চুরমার।'

'ঠিক আমাদেরও এমনি চুরমার হয়েছিল,' শমিতা ফিসফিস করল স্বামীর কানে।

রেজালা খান ব্যাজার হয়ে আছে। আবিদকে বলল, 'আপনার ছেলে ভেঙেছে। ও চিৎকার দিতেই তো দড়াম করে শব্দ হলো!'

'এই, খোকা, তুমি অমন চিৎকার করেছিলে?' চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করলেন ইয়েন ট্যানার।

'হ্যাঁ, আমি করেছি,' রোরি জবাব দিল।

'মি. হাসান,' বললেন ইয়েন, 'চিৎকারটা খুবই অস্বাভাবিক লাগল। কোথায় যেন আগে এরকম শব্দ শুনেছি।'

'বাচ্চা মেয়েদের মত নাকি সুরে চিৎকার করেছে রোরি,' রকি ঠেস দিয়ে বলে।

'ওই চিৎকার তুমি কোথায় শুনেছ, রোরি?' জানতে চান ইয়েন।

'কোথাও শুনিনি তো!' রোরি বলে, 'নিজে থেকেই দিলাম। দিতে ভাল লাগল।'

'আবিদ, চলো আমরা যাই,' ফিসফিসিয়ে বলল শমিতা।

তাকে বিব্রত ও ভীত দেখাচ্ছে।

আবিদ বলল, 'রেজালা, আপনাকে ধন্যবাদ। সন্ধেটা চমৎকার কাটল। মি. ইয়েন, আপনাকেও ধন্যবাদ। চলি তাহলে।'

'কিন্তু আমার দরজা-জানালা?' রেজালা খান ক্ষতিপূরণ দাবি করল। হাসল আবিদ। হাড়কিপটা পড়শীকে বলল, 'কাল আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। ভাল মিস্ত্রীর টেলিফোন নম্বর দেব। ওরা কাজ করে ভাল, চার্জও কম।'

'এক মিনিট, মি. হাসান,' হাসান দম্পতিকে বাধা দিলেন ইয়েন, 'আমি রোরির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

ভয় পেল শমিতা। তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ছেলের সকালে স্কুল আছে। তা ছাড়া এখন ওর ঘুমের সময়। আরেক দিন কথা বলবেন।'

বেরিয়ে এল ওরা। আবিদ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে তবে কিছুটা মজাও পেয়েছে। শমিতা সন্ত্রস্ত। তার বারবার মনে হচ্ছে অজানা কোন সংকট ধেয়ে আসছে। রোরি হাসছে আর 'মজাদার লোমশ নেকড়েমানব' সম্পর্কে আবিদকে নানান প্রশ্ন করছে।

রেজালা খান দাঁড়িয়ে আছে তার ভাঙা দরজা আর জানালার কাছে, কাকে দোষ দেবে ভেবে পাচ্ছে না বোধহয়।

সূত্রগুলো জড়ো হতে শুরু করল, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে পরিণত হচ্ছে বেদনা, বিভীষিকা আর উন্মত্ততায়। সব মিলিয়ে যা তৈরি হলো, তা যুক্তি বর্জিত একটি ব্যঞ্জনা।

হাইব্রিড এসেছে। এসেছে নেকড়েদের মত দেখতে দো-আঁশলা অতিমানব। শুরু হতে যাচ্ছে আতংকের দিনরাত্রি।

এগারো

খানদের বাড়িতে রোরির আচরণ, ইয়েন ট্যানারের কৌতূহল; শিক্ষিকা হেলেনের রোরি সম্পর্কিত মন্তব্য ঘুরপাক খাচ্ছে শমিতার মাথায়। এখন মাঝ-দুপুর, শমিতা ভাবছিল রোরিকে দত্তক নেবার পর হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে দেয়া ভুল হয়েছে। আবিদের কত মজা, সে নিজের অফিসের কাজে ডুবে আছে। কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই।

'যাননি ভালই করেছেন,' আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল শমিতা, 'ফিল্মটা দেখলে লুসি ভয় পেত।'

'তা-ই! মি. খান আমাদের দাওয়াত দিলে তো যাব! উনি আমাদের দাওয়াতই করেননি,' বলল এলিজাবেথ।

ঘরোয়া কাজে শমিতাকে সাহায্য করছে সে। সুযোগ পেলেই মেয়ে লুসিকে নিয়ে শমিতাদের বাড়িতে দুপুরে আড্ডা দেয় এলিজাবেথ।

বাড়ির বাগানে খেলা করছে লুসি আর রোরি। কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসে রোরি। বলল, 'মা, গোসল করব।' ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করল শমিতা। এলিজাবেথেরও মনে পড়ে গেল মেয়েকে গোসল করানো দরকার।

বাথরুমে ছেলেকে নিয়ে যাবার পথে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শমিতা বলল, 'লুসি! চলে এসো। তোমার মা বলছেন...'

বাক্যটা শেষ করতে পারল না সে। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শরীর।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিল এলিজাবেথ, 'লুসি কোথায়, শমিতা? ও কি বাড়ি চলে গেছে? কী ব্যাপার, কথা বলছেন না যে!'

জানালার কাছে এগিয়ে আসছে লুসির মা।

'প্লিজ, ড্রয়িংরুমে চলুন। অ্যাম্বুলেন্স ডাকব।' কোন রকমে বলল শমিতা। এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরল।

'ছাড়ুন আমাকে,' এলিজাবেথ জানালার কাছে ছুটে গেল। 'লুসি!' চোখের পলক পড়ে না তার। বিকট আর্তনাদ করে দরজা খুলে বাগানে দৌড়ে গেল।

তার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে ছ'ফুট লম্বা একটা খুঁটির ডগায় ঝুলছে, গলায় পেঁচিয়ে আছে চিকন লোহার শিকল। দম আটকে মরে গেছে লুসি।

আসছে শনিবার ৪ মার্চ লুসির শেষকৃত্য। আবিদ আর শমিতা গেল শোকসন্তপ্ত বাড়িতে, জোসেফ আর এলিজাবেথকে সান্ত্বনা দিতে। বাড়ি ফেরার পথে শমিতা বলল, 'আমার কেবলই মনে হচ্ছে রোরিই ওই মেয়েকে ফাঁসিতে লটকিয়েছে।'

'তোমার মাথায় কি মগজ বলে কিছু নেই?' রেগে গেল আবিদ। 'অত উপরে একটা বাচ্চাকেও তো রোরি নিয়ে যেতে পারবে না। ছেলেকে তুমি খুনী ভাবছ, ছিঃ!'

শনিবার আসতে আরও ছ'দিন বাকি। ঘুম হয় না শমিতার। বড়ি খেয়ে তাকে বিছানায় যেতে হয়। খেপে যায় আবিদ, 'আচ্ছা মুশকিলে ফেললে দেখছি, এতই যখন দুশ্চিন্তা, যাও না ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার খালার বাড়িতে গিয়ে বেড়িয়ে এসো।'

শহর থেকে ৭৫ মাইল দূরে গোরস্তানে দাফন হবে লুসির। গাড়ি

চালিয়ে নিয়ে আবিদ আর শমিতা জায়গাটা দেখতে গেল। আসলে, জোসেফ আর এলিজাবেথ জায়গাটা দেখতে গিয়েছিল।

ওদেরকে সঙ্গ দেয় হাসান দম্পতি। যাবার সময় ওরা রোরিকে রেখে যায় রেজালা খানের বাড়িতে, রুখসারের জিম্মায়।

ফেরার পথে ছেলেকে তুলে নেবার জন্য খানদের বাড়িতে এল আবিদ। দেখে সোফায় ঘুমাচ্ছে রোরি। পাশে বসে বই পড়ছেন ইয়েন।

রাত তখন সাড়ে দশটা। রুখসার ডেট করতে বেরিয়েছে, এখনও ঘরে ফেরার নাম নেই। এমন বজ্জাত মেয়ের হেফাজতে রোরিকে রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি, ভাবে আবিদ।

'মি. অ্যাণ্ড মিসেস হাসান। আপনাদের ছেলে খুবই ইন্টেলিজেন্ট। ওর বেশ কিছু অসাধারণ আইডিয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে,' বললেন ইয়েন।

আবিদ তার ঘুমন্ত ছেলেকে কাঁধে তুলে নিল। 'দোয়া করবেন যেন মানুষ হয়।'

ইয়েন হাসলেন। তাঁর চোখে দুষ্টুমি। হাসিটা শমিতার নজর এড়াল না। গাড়িতে উঠে স্বামীকে বলল, 'এই লোকটা যেন কেমন। ওকে দেখলে আমার অস্বস্তি লাগে।'

বারো

মেয়ের শোকে অর্ধ-উন্মাদ এলিজাবেথকে হাওয়া বদলের জন্য

বারমুডায় নিয়ে যাবে ওর স্বামী জোসেফ। এক মাস সেখানে থাকবে ওরা। গোরস্তানে লুসির দাফন হয়ে যাবার পর আবিদকে সিদ্ধান্তটা জানায় জোসেফ।

শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষে ঘরে ফিরে আবিদ দেখল বসে আছে রোরি। হ্যাঁ, রুখসারও আছে, এবার সে তার 'কর্তব্য' ঠিকমত পালন করায় আবিদ খুশি হবার আগেই দেখল, প্রাণিবিজ্ঞানী ইয়েন ট্যানার এবং আরেকটি মেয়ে বসে আছে। মেঝেতে মুভি ক্যামেরাসহ নানান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।

অচেনা মেয়েটির পরনে জিনস আর শার্ট, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পায়ে টেনিস জুতো, চুলের রং তামাটে। শমিতা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমার নাম ইভ টমাস,' চুয়িং গাম চিবোতে চিবোতে মেয়েটি জবাব দিল, 'কেন?'

'তুমি এখানে কী করছ?' প্রশ্ন করল শমিতা। স্ত্রীর কাঠখোট্টা কথাবার্তায় বিব্রত হলো আবিদ। মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ও বোধহয় রুখসারের বান্ধবী। দুই বন্ধু মিলে গল্প করছিল আর কী।'

'না, ওর সঙ্গে এখানেই আমার পরিচয়,' বলল ইভ, 'আমি সিনেমা আর্টস নিয়ে পড়ছি। এখন প্র্যাকটিকাল কাজ করছি মি. ইয়েনের সঙ্গে।'

ইয়েন বললেন, 'মি. অ্যাণ্ড মিসেস হাসান। আমি আপনাদের ওয়াণ্ডার বয়ের ওপর একটা ফিল্ম তৈরি করছি।'

'সত্যি, আংকেল!' খুশিতে বাগ বাগ হয়ে বলে রুখসার, 'রোরি মজাদার কাণ্ড করেছে। ওকে প্রশ্ন করে মি. ইয়েন সুন্দর সুন্দর কথা বের করেছেন।'

রোরি বসে আছে ফ্লোরে, কার্পেটের ওপর। তারও চেহারা খুশি খুশি।

'স্কুলে পড়ার সময় ভাল অভিনয় করতাম আমি,' বলে

আবিদ। 'আমার ছেলেও অভিনয় কম জানে না।'

'মি. হাসান,' বললেন প্রাণিবিজ্ঞানী, 'আমরা ওর অভিনয় প্রতিভায় আগ্রহী নই। আমরা ওর বর্তমান অবস্থা ফিল্মে ধরে রাখছি, যাতে ভবিষ্যতে ওর মাঝে যে পরিবর্তন আসবে তার সঙ্গে এখনকার অবস্থাটার তুলনা করতে পারি।'

শমিতার কণ্ঠস্বরে ইস্পাতের ধার, 'পরিবর্তন? হোয়াট ডু ইউ মীন?'

ইয়েন একটু ভেবে বললেন, 'আপনারা বসুন। আমি যা বলব তাতে শকড হবার সম্ভাবনা আছে।'

কেউ বসল না। 'আরে বলেই ফেলুন না,' বলল আবিদ, 'ভণিতা ছাড়ুন। ভণিতা ভাল্লাগে না।'

'বলছি, এই যে আপনাদের ছেলে রোরি,' একটু বিব্রত কণ্ঠে বলেন ইয়েন, 'সে পুরোপুরি মানুষ নয়।'

'কী?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শমিতা বলে, 'কী যা-তা বলছেন?'

'গুছিয়ে বলতে পারিনি,' বললেন ইয়েন। 'বংশগত স্মৃতি বলে একটা কথা আছে, শুনেছেন কখনও? খুলেই বলি তা হলে। একটা প্রজাতি যা জানে বা শেখে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করাকে বলে বংশগত স্মৃতি। কথাটা এতদিন একটা তত্ত্ব হয়েই ছিল। গেল বৃহস্পতিবার রোরির সঙ্গে আলাপ করার সময় ঘটনাক্রমেই আমি ব্যাপারটা আবিষ্কার করি। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফিল্ম শো দেখার সময় কেন সে অস্বাভাবিক চিৎকার করেছে, অমনি সে তার জন্মের বহু বছর আগেকার নানান ঘটনার স্মৃতিচারণ শুরু করে।'

বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল আবিদ। 'রোরি, এই ভদ্রলোককে ঘোল খাওয়াবার জন্য কীসব আজগুবি কথা বলেছিস, অ্যাঁ?'

রোরি স্মিতহাস্যে বলল, 'আমি আগেকার কথা বলেছি।'

'তুই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এ বাড়িতে আসার আগের

কথা?’

‘আমি কোথাও না আসার আগেকার কথা। ওই যে তোমাকে বলেছি–আওয়াজ। সেই আওয়াজের কথা।’

‘হ্যাঁ, ভয়েস,’ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন ইয়েন, ‘ভয়েসেস অভ এজেস পাস্ট। রোরির পূর্বপুরুষরা হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে বাস করছে। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, এমনকী আফ্রিকায়। রোরি এসব জায়গায় ১৮৫০ সালে, ১৭০০ সালে এবং তারও আগে কী কী ঘটেছে তা বলে দিয়েছে। এবং যা বলেছে সবই ইতিহাস-সত্য।’

‘মি. ইয়েন,’ তিক্ত কণ্ঠে বলল শমিতা। ‘একটা বাচ্চা ছেলে কী বলল না বলল, তাকেই বংশগত স্মৃতির প্রমাণ ধরা চলে না। পুনর্জন্মের আজগুবি কেচ্ছা বিশ্বাস করেন আপনি?’

‘এটা পুনর্জন্মের ব্যাপার নয়।’

‘বাদ দিন ওসব! রোরি, তোমার রুমে যাও।’

‘আউ, মা!’ আবদার করে রোরি মায়ের কাছে থাকার জন্য।

‘রোরি,’ বলল আবিদ। ‘তোমার মা যা বললেন তাই কর। আমরা মি. ইয়েনের সঙ্গে কথা বলব। কাজেই ভাগো।’

‘ইয়েস, স্যর,’ বাবার সঙ্গে মশকরা করে রোরি, ‘সরি টু ডিস্টার্ব ইউ।’ নিজের কামরায় চলে যায় ও।

‘এখন বলুন, কেন আপনি আমার ছেলেকে অমানুষ বললেন?’ প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল শমিতা।

‘আপনাকে দুঃখ দেবার জন্য বলিনি, ম্যাডাম,’ ইয়েন এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, ‘আমি কেবল এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে আপনার ছেলের মধ্যে এমন কিছু আছে যা এসেছে বুদ্ধিমান অ-মানবীয় প্রাণী থেকে।’

‘ইউ আর ক্রেজি!’ বলল আবিদ। ‘শমিতা, এ লোকটার মাথায় ছিট আছে।’

'হুম, ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বুঝতে পারছি।' বললেন ওয়েন। 'রোরির ইতিহাস তো আপনাদের জানা নেই। কি ঠিক বলিনি?'

'কী বলতে চান আপনি?'

'ওকে আপনারা দত্তক নিয়েছেন, রুখসার আমায় বলেছে...'

'হ্যাঁ, নিয়েছি,' শমিতা চিৎকার করে উঠল, 'তাতে আপনার কী?'

'ওকে যে দত্তক নেয়া হয়েছে সেকথা ও জানে?'

'জানে। কিন্তু সেটা তো আলোচনার বিষয় হতে পারে না। ওর আগের জীবন এখনকার জীবনের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলছে না।'

'খুব ভাল কথা। তবু আমি বলব, অ-মানব জাতিগোষ্ঠির কারও উত্তরসূরি এই রোরি। হতে পারে তার বাবা বা মা কেউ ওই গোষ্ঠী থেকেই এসেছে।'

'দৃষ্টান্ত হিসেবে বলুন না,' টিটকিরি দেয় আবিদ। 'ওর বাবা মা ফ্লাইং সসার থেকে এসে পৃথিবীতে আত্মগোপন করেছে?'

ইয়েন শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার ধারণা হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে বাস করছে আমাদের মধ্যে অথচ কেউ ধরতে পারছে না এরকম বুদ্ধিমান অর্ধ-মানবীয় বা অতিমানবীয় নেকড়েমানবদের একটি প্রজাতিরই বংশধর রোরি।'

'হাস্যকর!' বলল শমিতা। 'বায়োলজির ক্লাসে আপনি কি কিছুই শেখেননি? মানুষ আর জানোয়ারের প্রজনন অসম্ভব। ওই চেষ্টা সফল হয় না। প্রাচীনকালে গ্রীক রাখালেরা ওটা করতে গিয়ে ভেড়া থেকে যৌন রোগই অর্জন করেছে, আর কিছু না।'

'ম্যাডাম, ভেড়া কিন্তু অর্ধ-মানব নয়। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সমাজে প্রচুর কিংবদন্তী আছে। শোনা যায় জঙ্গল থেকে এক ধরনের লোমশ বিরাটকায় মানুষ এসে ধর্ষণ করায়

ওদের সন্তান জন্মেছে। তিব্বত এবং সাইবেরিয়ায়ও এরকম কিংবদন্তী রয়েছে।'

'মূল কথা তা হলে কিংবদন্তী,' ঠেস দিয়ে বলে আবিদ, 'কিংবদন্তীতে তো প্রতিশোধপরায়ণ আত্মার কেচ্ছাও আছে।'

'তেমন আত্মা যে নেই, তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারেন?'

'হুঁ? না, তা পারি না। তবে যুক্তির দিক থেকে...'

'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মৌমাছির উড়বার কথা নয়। তবু তো তারা ওড়ে।'

'বুঝলাম সেকথা,' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলে শমিতা, 'রোরির বয়স আট বছর। তর্কের খাতিরে তাকে হাইব্রিড ধরনের কিছু একটা সাব্যস্ত করলেও তার বংশগত স্মৃতি জাগতে আট বছর সময় লাগল কেন? আর চেহারা এবং মানসিকতায় স্বাভাবিক হলে সে মানুষ নয় কেন?'

'প্রথমত আমি রোরির সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি মন্ত্রের মত কিছু একটা প্রয়োগ করা হতো তার ওপর।'

'ঘুমানোর সময় যে মন্ত্র...' শমিতা কথা শেষ করতে পারে না, ভয়ার্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকায়।

ইয়েন বলতে থাকেন, 'হ্যাঁ, ওই মন্ত্র। ওই মন্ত্র তাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। মন্ত্র পড়া বন্ধ করে দিতেই ধীরে ধীরে তার বংশ-স্মৃতি জাগতে শুরু করেছে। হাইব্রিড নেকড়েমানবদের অবশ্য মানুষের মত দৈহিক কাঠামোর অধিকারী হবার দরকার নেই। মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্যটা লুকিয়ে রাখার সামর্থ্যের দরকার নেই। মানে, মানসিক শক্তি দিয়ে দেহকে নিয়ন্ত্রণ...

'মি. ইয়েন, আপনি সায়েন্স ফিকশন লিখছেন না কেন?' ঠাট্টার সুরে বলল আবিদ। 'এত গোবর আপনার মাথায় যে আপনার সঙ্গে কোন সুস্থ মানুষের কথা বলা বোকামি। এখন

কেটে পড়ুন, নইলে আমার গিন্নী আপনার চোখ উপড়ে নেবে।'

'আমি কালই চলে যাচ্ছি। রোরির সঙ্গে আমি আরেকটু কথা বলতে চাই,' অনুনয় করেন ইয়েন।

'এখনই বেরোন,' বলল আবিদ, 'আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে।'

যাবার আগে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে ইয়েন বললেন, 'রেজালা খানের বাড়িতে ফিল্ম শোতে আপনার ছেলের চিৎকার শুনেই আমার খটকা লেগেছিল। এরকম চিৎকার আমি ১৯৫৭ সালে পশ্চিম কানাডায় একবার শুনেছি। শব্দটা যেখান থেকে আসছিল সেখান থেকে ৫০ গজ দূরে দেখেছি রক্তমাংসের এক আধা মানব আধা নেকড়েকে।'

সুন্দরী ইভ টমাস আর ইয়েন চলে যাবার পর আবিদ তাকাল রুখসারের দিকে। সোফায় বসে আছে সে। বেবী সিটিং বাবদ তার ১০ ডলার পাওনা হয়েছে। মানিব্যাগ থেকে একটা নোট বের করে আবিদ।

'থ্যাংক ইউ, আংকেল,' নোটটা হাতে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল রুখসার। প্রতিটি পদক্ষেপে ওর নিতম্ব ছন্দ তোলে, সেদিকে তাকিয়ে শমিতা মন্তব্য করল, 'ফিলদি বটম!'

তেরো

ইয়েনের মাথায় ছিট আছে, তার সঙ্গে মজা করাই উচিত হয়নি।

পাগলরা সবাইকে পাগল মনে করে। তামাশা করে কেউ কিছু বললে সেটাকে ব্যাখ্যা করে নানাভাবে। এরকম লোকের সঙ্গে কোন কথা বলাই অন্যায়, ছেলেকে বলছিল আবিদ। রোরি স্মিত হেসে বাবার লেকচার শোনে।

রাতে শমিতা প্রায়-ভুলে যাওয়া মন্ত্রটা পড়ে শোনাল রোরিকে, রোরি অবাক হয়ে বলল, 'তুমি তো মন্ত্র ভুলে গেছ, মা। আমি এমনি এমনি ঘুমিয়ে পড়ছি। যাও, আমার ঘুম আসছে।'

রোববার আর সোমবার কেটে গেল। সবই স্বাভাবিকভাবে চলছে। তবে আবিদ লক্ষ করেছে, রোরির হালকা গোঁফ গজাচ্ছে; শমিতা দেখেছে ছেলেটার খিদে বেড়েছে খুব এবং ভোরে ঘুম থেকে সহজে উঠতেই চায় না।

এক সপ্তাহ পর। অফিস থেকে ফিরে শমিতার সঙ্গে গল্প করছে আবিদ এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। রোরির চুল আঁচড়াচ্ছিল শমিতা। বলল, 'ফোনটা ধরো, প্লিজ!'

'হ্যালো, মি. হাসান,' অপর প্রান্তে ইয়েন ট্যানার।

'আপনি? আবার?' আবিদ বলল, 'প্লিজ, একটু শান্তিতে থাকতে দিন। কানাডায় গিয়েও...'

'আমি যাইনি। এ শহরেই আছি।' জানালেন ইয়েন। 'আপনারা মত পাল্টাবেন এই আশায় যাইনি এখনও।'

খেপে গেল আবিদ। 'আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।'

'প্লিজ, আরেকবার একটু ভাবুন। রোরির বিকৃতির ওপর একটা বই লিখব আমি। নৃতত্ত্বের ওপর শতাব্দীর সেরা বই হবে। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হবে।'

'শোনেন,' ঘাউ করে উঠল আবিদ। 'আমাদেরকে একা থাকতে দেন।'

'জাস্ট গিভ মি আ চান্স!' মিনতি করেন ইয়েন, 'রোরির সঙ্গে

আলাপের রেকর্ডিং থেকে হুবহু লিখেছি। ওগুলো পাঠাচ্ছি। একবার পড়ে মনস্থির করুন।'

'ইয়েন, যথেষ্ট হয়েছে। আমাদেরকে এভাবে বিরক্ত করা বন্ধ না করলে কিন্তু আমি এসে এক ঘুষিতে আপনার সবক'টা দাঁত ফেলে দেব।'

আছড়ে রিসিভার রেখে দেয় ও। শমিতা বলল, 'তুমিও তো পাগলামি করছ। ইয়েনকে পাত্তা না দিলেই হয়।'

'কিন্তু হারামজাদা তো আমাদেরকে ছাড়বে না।' গর্জে ওঠে আবিদ। 'জোঁকের মত লেগে আছে। বলে কিনা রোরির বিকৃতির ওপর বই লিখব!'

রাতের খাবার শেষে টেলিভিশন দেখছিল আবিদ আর শমিতা। এমন সময় হোটেল থেকে এক লোক এসে টাইপ করা কিছু কাগজ দিয়ে গেল। ইয়েন ট্যানার পাঠিয়েছেন টেপ রেকর্ডিং-এর ট্রান্সক্রিপশন। ইজি চেয়ারে গিয়ে বসল আবিদ। কাগজগুলো পড়তে লাগল। লুসির শেষকৃত্য থেকে ওদের ফেরার আগে রোরির সঙ্গে সংলাপের বিবরণ।

রেকর্ডিং এ-১

বিষয়: রোরি হাসান। বয়স: ৮ বছর। মি. অ্যাণ্ড মিসেস হাসানের পুত্র; দত্তক।

ক্যাটাগরি: নেকড়েমানবের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্ক। হাইব্রিড?

টীকা: আর এইচ (রোরি হাসান), ওয়াই টি (ইয়েন ট্যানার), আর কে (রুখসার খান), ই টি (ইভ টমাস)।

শুরু

ওয়াই টি- কেমন আছ, রোরি?

আর এইচ- ভাল। এটা কী?

ওয়াই টি- এটা? মাইক্রোফোন। আমাদের কথাবার্তা টেপ রেকর্ড করতে লাগবে।

আর এইচ- বাহ্, চমৎকার। আমার কথা রেকর্ড করবেন?

ওয়াই টি- হ্যাঁ। আচ্ছা, রোরি...সেদিন রুখসারদের বাড়িতে...

আর এইচ- বাতি নেভান। উঃ কী আলো!

ওয়াই টি- ইভ মুভি ক্যামেরায় তোমার ছবি তুলছে। এজন্য এই বাতি। ভয়ের কিছু নেই।

ই টি- একটু হাস তো, রোরি।

ওয়াই টি- আহ্! মিস ইভ!

ই টি- সরি, মি. ট্যানার।

ওয়াই টি- রুখসারদের বাড়িতে ফিল্ম শো দেখার সময় একটা বিরাট জানোয়ার দেখে চিৎকার করেছিলে তুমি, মনে পড়ে?

আর এইচ- চিৎকার করিনি। শব্দ করেছি।

ওয়াই টি- হ্যাঁ, শব্দ করেছ। শব্দটা তুমি কোথায় শুনেছিলে?

আর এইচ- কোথাও শুনিনি।

আর কে (হাসতে হাসতে)- মার্ভেলাস, রোরি। তুমি সত্যিই পাক্কা কমেডিয়ান।

ওয়াই টি- আহ্! রুখসার, প্লিজ! শব্দটা আগে কোথাও শোননি?

আর এইচ- না, সত্যিই শুনিনি।

ওয়াই টি- তোমার মাথা থেকে এসেছে?

আর এইচ- হ্যাঁ। আওয়াজ থেকে পেয়েছি।

ওয়াই টি- আওয়াজ? কীসের আওয়াজ?

আর এইচ- আমার বালিশে। ঘুমোলে নানারকম গলার

আওয়াজ শুনতে পাই।

ওয়াই টি- কতদিন থেকে আওয়াজ আসছে তোমার মাথায়?

আর এইচ- কয়েক মাস হবে। মা মন্ত্র পড়া বন্ধ করার পর।

ওয়াই টি- মন্ত্র? কীসের মন্ত্র?

আর এইচ- আমার মন্ত্র। মন্ত্র শুনে আমি ঘুমাতাম। এখন বাথরুমে যাব। হিসু করব।

ওয়াই টি- আচ্ছা, যাও।

(পাঁচ মিনিট বিরতি)

ওয়াই টি- আচ্ছা, রোরি, ওই যে গলার আওয়াজের কথা বললে, আওয়াজ কার? মেয়ে মানুষের নাকি পুরুষের?

আর এইচ- ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই। নানা জায়গা থেকে আসে ওই আওয়াজ।

ওয়াই টি- রোরি, আওয়াজ শুনে তুমি ভয় পাও না?

আর এইচ- না। ওরা তো আমার মতই। ভূতের গলার আওয়াজ তো নয়। ডেবীকে ভূতে ধরেছিল। ওই ভূত আমাকে ভয় পেত।

ইয়েন তাঁর কথা রেখেছেন, ট্রান্সক্রিপশন থেকে কিছুই বাদ দেননি, বাকি পাতাগুলো পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে একটু চমকে ওঠে আবিদ।

ওয়াই টি- যে আওয়াজ তুমি শোন, সেই আওয়াজ কি তোমাকে তোমার বর্তমান জীবন থেকে নিয়ে যেতে চাইছে?

আর এইচ- কী বললেন বুঝতে পারলাম না। আওয়াজ শুনতে আমার ভালই লাগে। না শুনতে পেলে খারাপ লাগে।

ওয়াই টি- আওয়াজগুলো কী বলে, কোথায় থাকে তারা?

আর এইচ- হ্যাঁ। বলে। ওরা কেউ থাকে জঙ্গলে। কেউ শহরে।

ওয়াই টি- আওয়াজ যারা করে, তারা কি জানোয়ার?

আর এইচ- হ্যাঁ, কেউ কেউ। কেউ কেউ মানুষ। আমি আর কথা বলব না।

ওয়াই টি- আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি কি আওয়াজ?

আর এইচ- শিগ্‌গিরই হব।

ওয়াই টি- তুমি কে?

আর এইচ- রোরি হাসান।

আবিদ ভাবছিল ট্রান্সক্রিপশনটা যে-কোন মনোবিদের সমীক্ষণের উপযোগী বটেই। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এগুলোতে গল্প শোনাতে এক বালকের আগ্রহ এবং গল্প শুনতে এক বয়স্ক মানুষের ব্যাকুলতাই ফুটে উঠেছে। কাগজগুলো রান্নাঘরের পেছনে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল আবিদ। প্রাণিবিজ্ঞানীর গবেষণা পুড়তে লাগল।

চোদ্দ

১২ই জুলাই। সকালের নাশতা রেডি। আবিদ দাড়ি কামাচ্ছে। খিদে পেয়েছে শমিতার। স্বামীকে বলে সে আগেই খেতে শুরু করেছে ফিরনি আর পাউরুটি। হঠাৎ ও বমি শুরু করল। ওয়াক ওয়াক শব্দ শুনে ছুটে এল আবিদ।

'কী হলো?' জানতে চাইল সে। দেখে শমিতার হাতে ছোট্ট বলের মত কী যেন। 'ফিরনির গামলার মধ্যে ছিল। বিড়ালছানার

মাথা। রান্না হয়ে গেছে,' ফুঁপিয়ে উঠল শমিতা। 'ও, গড! আমি ভেবেছি খেলনা বল। রোরির হাতে ছিল!'

স্ত্রীকে ধরে এনে সোফায় বসাল আবিদ। শমিতা তখনও কাঁপছে আর কাঁদছে।

'তুমি শিওর? রোরির সঙ্গে বিড়ালছানা ছিল?' জিজ্ঞেস করল আবিদ।

'আমি শিওর। ওর হাতেই ছিল বিড়ালছানার মাথা। আমি ভেবেছি রাবারের বল।'

'ঠিক আছে। ওকে ডাকছি।' আবিদ বাগানের দিকে পা বাড়ায় ছেলেকে ডাকার জন্য। রোরি ওখানে খেলছে।

দুর্বল কণ্ঠে শমিতা বলল, 'আবিদ, ওকে ডেকো না। ডাকো ডা. রবার্টসনকে। তাঁর পরামর্শ নিতে হবে আমাদের।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আবিদ। 'ঠিকই বলেছ। কিছু একটা করা দরকার।'

তিন বছর কম নয়। ডা. রবার্টসন ফোনে দীর্ঘদিন পর শমিতার গলা শুনে বেশ খুশি হলেন। তবে খুশিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। মোটামুটি যা শুনলেন, তাতেই বুঝলেন খুব ভেঙে পড়েছে শমিতা। বললেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। অ্যালিস আর আমি আজ সন্ধ্যায় আসছি আপনাদের ওখানে।'

রবার্টসনের স্ত্রী অ্যালিস বাড়িতে দিনভর খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটান। স্বামী কাজ-পাগলা মানুষ। ঘরে কথা বলেন কম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গালগল্প তেমন একটা জমে না। মহিলা শমিতাদের বাড়ি এসে গল্পে মেতে উঠলেন। লাখ লাখ আমেরিকান যেখানে বেকার সেখানে দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলোর গণবিরোধী সরকারদের পেছনে টাকা ঢালাটা যে কত বড় অন্যায় তা ব্যাখ্যা করছিলেন।

‘অ্যালিস, তুমি যা বলছ ঠিকই আছে। তবে আমার ধারণা হাসানরা ওদের ছেলে সম্পর্কে কথা বলতেই এখন বেশি আগ্রহী,’ বললেন ডা. রবার্টসন।

বাধা পেয়ে মিসেস রবার্টসন চুপসে গেলেন। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন ঘন ঘন। আবিদ আর শমিতা সব ঘটনা খুলে বলল ডাক্তারকে। সুকৌশলে রোরির সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় তার শোবার ঘরে গেলেন রবার্টসন।

ঘণ্টাখানেক পরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাইপে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

রোরির যথেষ্ট শারীরিক পরিবর্তন ঘটেছে এই তিন বছরে। মুটিয়ে গেছে সে। বুকের ছাতি আর কাঁধ চওড়া। হাতের পেশী বয়স্কদের মত। তবে কণ্ঠস্বর শিশুদের মতই। ওর আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি রবার্টসন। প্রশ্ন শুধু একটাই বিড়ালছানার মাথা ছিঁড়ে নিয়ে ফিরনির হাঁড়িতে সে ফেলেছিল কেন?

আবিদ বুঝতে পারছিল, রোরির সামনে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাইছেন না রবার্টসন। ছেলেকে সে ড্রয়িংরুমে পাঠিয়ে দিল টিভিতে বাচ্চাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য। রবার্টসন স্বস্তি পেলেন।

‘কালই ডা. জ্যাক গারবারের কাছে ছেলেকে নিয়ে যান আপনারা।’ বললেন রবার্টসন। ‘কাল তো সোমবার। জ্যাক সোমবার বিকেলে গলফ খেলে তাই তখন রোগী দেখে না। বেলা একটার মধ্যেই ওর সঙ্গে দেখা করবেন। আমার চিঠি নিয়ে যাবেন, নইলে এক সপ্তাহের মধ্যে দেখানোর সুযোগ পাবেন না।’

শহরের নামি শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জ্যাক গারবার। বয়স ৪৫।

শমিতা চেম্বারে ঢুকতে হাতের ইশারায় চেয়ারে বসতে বললেন। ক্লিপবোর্ডের কাগজ পড়তে পড়তে বললেন, 'রবার্টসন গতরাতে আমায় ফোন করেছেন। আপনার পরিচিত নিশ্চয়?'

'জি। আমি ওনার হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করেছিলাম,' বলল শমিতা, 'সেই সুবাদে তিনি আমার মুরুব্বি।'

'রবার্টসন বলেছেন, আপনার ছেলের শরীরে অস্বাভাবিক রকম লোম গজিয়েছে যা আট বছরের ছেলের জন্য বেমানান।'

শমিতা চুপ করে থাকে। গারবার বললেন, 'প্রকৃতির খেয়াল কে রুখতে পারে! দু'বছরের ছেলের দাড়ি উঠেছে, গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে এরকম কাহিনি পত্রিকায় পড়েছি আমি।'

'রোরি, তোমার শার্টটা একটু খুলবে?' জ্যাক গারবার বললেন ক্লিপবোর্ড একপাশে রেখে দিয়ে।

'শুধু শার্ট? নাকি গেঞ্জিও?' চটপট বলে রোরি।

'দুটোই প্লিজ।'

নিঃশব্দে ফুলহাতা শার্ট ও গেঞ্জি খুলল রোরি। ডা. গারবারের চোখে বিস্ময়। এতটুকুন ছেলের বুকে আর হাতে বড় বড় লোম!

'মাই গড!' অস্ফুটে বলে উঠলেন জ্যাক গারবার।

'কিছু বললেন?' জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'না, না, কিছু না।' বিব্রত কণ্ঠে বললেন ডাক্তার, 'কতদিন থেকে ওর লোম বড় হচ্ছে?'

'এক মাস আগে আমার স্বামী ব্যাপারটা লক্ষ করেন। দেখেন ওর পায়ে বড় বড় লোম।'

'আপনাদের ফ্যামিলিতে মানে আপনার স্বামীর বংশে কারও কি হাইপারট্রিকোসিস ছিল?'

'কী?' প্রশ্ন করে শমিতা।

'হাইপারট্রিকোসিস। এটা হলো এক ধরনের উত্তরাধিকার

রোগ। পূর্বপুরুষ কারও সারা শরীরে লোম থাকলে পরবর্তী বংশধরের কারও ওটা হতে পারে।'

'না, তেমন কিছু শুনিনি। শুনলেও কিছু যেত আসত না।' ফিসফিস করে বলল শমিতা, 'রোরিকে আমরা দত্তক নিয়েছি।'

'আমার মাসল দেখবে?' রোরি প্রশ্ন করে ডাক্তারকে।

'হুম! এরকম কেস আমি কখনও দেখিনি।' জ্যাক গারবার এবার রোরিকে বলেন, 'দেখি মাসল।'

কায়দা করে মুঠি পাকিয়ে হাতের পেশী স্ফীত করে রোরি। হাসেন ডা. জ্যাক, দু' আঙুল দিয়ে পেশী টেপেন। তাঁর হাসি বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে।

ছেলেটির বাহুর পেশী লোহার মত কঠিন।

'মিসেস হাসান, আমি আপনার ছেলের পুরো ফিজিক্যাল টেস্ট করতে চাই। ব্লাড টেস্ট, প্রেসার, এক্স-রেসহ অন্যান্য সব। ওর রক্তের গ্রুপ কী?'

'জানি না। ওর রক্ত পরীক্ষা করতে হয়নি কখনও। কারণ ও কখনোই অসুস্থ হয়নি।'

ফিজিক্যাল টেস্ট করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগল। ডা. গারবার রিপোর্ট পড়ে যা বললেন, তাতে ভয়ানক শকড হলো শমিতা। তবু ও স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বাড়ি এসে সোফায় ঢলে পড়ল শমিতা। রোরি খেলতে গেল মহল্লার ছেলেদের সঙ্গে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে আবিদ দেখে, শমিতা কপালে হাত রেখে সোফায় বসে আছে। দু'তিনবার ডাকার পর সংবিৎ ফিরে পেল।

'আবিদ, ডা. গারবার বলেছেন...' কথা শেষ করতে পারে না শমিতা। কান্নায় ওর গলা জড়িয়ে যায়।

'কী হয়েছে, শমি? রোরি অসুস্থ?' আবিদ স্ত্রীর কাঁধে হাত

রাখল।

'না, অসুস্থ নয়।' বলল শমিতা, 'রোরির রক্ত পরীক্ষা করে জ্যাক গারবার বলেছেন, 'ওর রক্ত মানুষের মত নয়।'

'মাই গড! ইয়েন ট্যানারের কথাই সত্য হলো?' আর্তনাদ করে উঠল আবিদ।

দশ মিনিট পরেই রবার্টসনের ফোন এল। বললেন ডা. গারবারের সঙ্গে আলাপ করেছেন। সব শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি, জ্যাক এবং একজন নৃতত্ত্ববিদ অর্থাৎ তিনজনের একটি টিম আজ রাতেই রোরিকে পরীক্ষা করবেন। শমিতা শুধু বলল, 'ঠিক আছে, আসুন। আটটার পরে আসুন।'

সন্ধে সাড়ে ৬টা। শমিতা আর আবিদ বিষণ্ন মুখে বসে আছে। বাড়িতে খাবারের আয়োজন করার মানসিকতা কারওই নেই। রোরি খেলাধুলা করে ঘরে ফিরলে আবিদ বলল, 'যাও, মা'র কাছে যাও। জামাকাপড় পাল্টে এসো। আজ আমরা বাইরে যাব, চাইনীজ খাব!'

খুশি হলো রোরি। মায়ের কামরায় গেল। ছেলেকে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে হঠাৎ বুকে চেপে ধরল শমিতা। ওর গালে নিজের গাল ঘষতে ঘষতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'না, খোদা! তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না।'

রোরি মা'র মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। একসময় শমিতার চোখের পানি মুছে দেয় নিজের হাতে।

পনেরো

রবার্টসন, জ্যাক গারবার এবং দেড়শো মাইল দূর থেকে নৃতত্ত্ববিদ ড. স্টিফেন রনসন রাত সোয়া আটটার মধ্যে চলে এলেন। শমিতাকে রনসন বললেন, 'এরা বলছেন, আপনার ছেলের শরীরে নাকি অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটছে।'

শমিতা মাথা নিচু করে রইল। কিছুই বলল না।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন,' বলল আবিদ। 'তবে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তিনজনই গেলেন ড্রয়িংরুমে। ওখানে টিভি দেখছে রোরি। গারবার বললেন, 'এই যে, খোকা, চিনতে পেরেছ আমায়?'

'হ্যাঁ, তুমি তো সেই টেকো ডাক্তার। ঘন ঘন শুধু নিজের নাক চুলকাও!' সপ্রতিভ জবাব রোরির।

সবাই হেসে ফেলল ওর কথা শুনে। শুধু চুপ করে রইল শমিতা। সে জানে ছেলে বুদ্ধিমান, রসবোধ আছে তার। কিন্তু এইমাত্র রোরি যে মন্তব্য করল তা আট বছরের ছেলের মুখে মানায় না।

'হ্যাঁ, আমিই সেই টেকো,' বললেন জ্যাক গারবার, 'ডা. রবার্টসনকে তো চেনো। আর ইনি হলেন ড. রনসন।'

'আমরা তোমাকে দেখতে এসেছি, রোরি,' বললেন রনসন, 'মি. ট্যানারের মতই তোমার সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলব।'

‘কীসের কথা বলবে?’

‘তোমার স্মৃতি সম্পর্কে!’

দ্রুত টিভি অফ করে দিয়ে টেপ রেকর্ডার চালু করলেন গারবার।

‘আচ্ছা, রোরি, বংশগত স্মৃতি মানে কী জানো?’ প্রশ্ন করেন রনসন।

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল রোরি, ‘মি. ট্যানার আমাকে বলেছেন। এর মানে হলো, আমার জন্মের আগে পৃথিবীতে আমার বংশের লোকদের জীবনে যা যা ঘটেছিল তা স্মরণ করা।’

‘তোমার কি সেরকম কোন স্মৃতি আছে?’

‘আছে! ইচ্ছে করলে আমি সেইসব স্মৃতির কাছে পৌঁছে যেতে পারি। অন্য লোকদের স্মরণে যেসব ঘটনা-গাথা, তার সবই বলে দিতে পারি!’

এ কি আমার ছেলে...আবিদ নিজেকে প্রশ্ন করে...শান্ত গলায় বলছে মরা মানুষের স্মৃতি থেকে উপড়ে এনে দেবে অতীত কাহিনি!

রবার্টসন প্রশ্ন করেন, ‘রোরি, তুমি কি সবার স্মৃতির কথা মনে করতে পারো? ধরো, ডাক্তার গারবারের দাদুর কথা?’

‘না, আমি শুধু আমার লোকদের স্মৃতি...’

‘তোমার লোক কারা?’

চমকে ওঠে আবিদ। আল্লাহ্! রোরি এখন যে জবাব দেবে তা যেন শমি না শোনে।

‘আমার লোক?’ রোরি কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, ‘অন্যরাই আমার লোক।’

‘একটু খুলে বলো, রোরি,’ বললেন রনসন।

‘সত্যি বলতে কি, আমরা মানুষ নই। এ দুনিয়ায় আমরা মানুষের মত বাস করি বটে, তবু আমরা আলাদা,’ হাসে রোরি,

'আমরা আসলে এক ধরনের ওয়্যারউলফ। তবে সিনেমায় যেভাবে ওয়্যারউলফদের দেখানো হয় আমরা সেরকম না। আমরা চাঁদ উঠলেই ওয়্যারউলফ হয়ে যাই না এবং আমাদের রক্ততৃষ্ণাও জাগে না। আমরা ছোট হলেও শক্তিশালী। আমাদের গায়ে বড় বড় লোম হয়। আমাদের চিনে ফেললে পাছে সত্যিকারের মানুষরা ভয় পায়, সেজন্য লোম ছেঁটে ফেলে মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকি।'

'তোমার লোকেরা কি মানুষের মত আচরণ করে?' জানতে চান রবার্টসন ।

'আমাদের মধ্যে যারা পিওর ব্লাড, তারা খুব বুদ্ধিমান। লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে থাকে। ওরা কাউকে আক্রমণ করে না। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত হানে,' বলতে থাকে রোরি, 'আমাদের মধ্যে যারা "ওহমাহ" তারা বনবাদাড়ে লুকিয়ে থাকে, মানুষ দেখলে দৌড় দেয়। ওদেরকে মানুষ বিগফুট বলে ভুল করে। হয়তো চেহারায় খানিকটা বিগফুটের আদল আছে কিন্তু ওহমাহরা ভিন্ন জাতের ওয়্যারউলফ। আর আমরা পিওর ব্লাডরা দেখতে মানুষের মতই, তাই আমাদের চেনা মুশকিল।'

'ওরা কি সংখ্যায় একশো হবে?'

'আরও বেশি।'

'এক হাজার?'

'না, আরও বেশি।'

রনসন বিস্মিত হয়ে বলেন, 'পাঁচ হাজার?'

'না! অত বেশি হবে না। দু'তিন হাজার হতে পারে।'

'রোরি, তুমি কি পিওর ব্লাড?'

'হ্যাঁ, আমার বাবাও ছিলেন পিওর ব্লাড।'

'হাইব্রিড?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাইব্রিড। আমার বাবা ছিলেন হাইব্রিড।'

রবার্টসন জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার এখনকার অবস্থাটা কী?'

'মন্ত্র পড়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখা হতো। তারা চাইত আমিও যেন লুকিয়ে থাকি মানুষের মধ্যে। মন্ত্রে এখন আর কাজ হয় না। আমার মাথায় ফিরে আসছে পুরানো দিনের ঘটনাবলী। অনেক পুরানো সব ঘটনা।'

আবিদের খুব রাগ লাগছিল। তার ইচ্ছে করছে এই পাগলদের তাড়িয়ে দেয়।

'তুমি কি মানুষের সঙ্গে বাস করতে চাও না?' রনসনের প্রশ্ন।

'তা জানি না। আমি যখন স্মৃতিতে ডুব দিই, তখন একটি মেয়েকে দেখি। নিউ ইয়র্কে থাকে সে। আমার বয়েসী। সে বদলে যাচ্ছে আমার মতই। কিন্তু বুঝতে পারছে না। ওকে আমার খুঁজে বের করতে হবে।'

'তুমি চাও তোমার লোকেরা সবাই একত্রিত হোক?'

'হ্যাঁ। আমি চাই সবাই এক জায়গায় এসে বাস করুক। প্রকৃতি যেভাবে তৈরি করেছে ঠিক সেভাবে।'

'লোমশ শরীর নিয়ে?'

'হ্যাঁ, অবিকলভাবে। আমরা তো কারও কোন ক্ষতি করি না। একটা মহল্লায় আমরা বাস করলে তাতে আপত্তি কীসের?'

'তোমাদের দেখে মানুষ যদি ভয় পায়, যদি তোমরা দেখতে আলাদা বলে তোমাদেরকে ঘেন্না করে?'

রোরি ঠোঁট ওল্টাল। 'তখন আমরা ফাইট করব।'

'কিন্তু তুমিই না বললে পিওর ব্লাডরা মারামারি করে না।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'রোরি, আর কয়েকটা প্রশ্ন...'

'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমাব।'

'আবিদ!' চেঁচিয়ে উঠল শমিতা। এতক্ষণ সে একটু দূরে

থেকে সব লক্ষ করছিল। 'এঁদেরকে যেতে বলো। আমার ছেলেকে একা থাকতে দাও, প্লিজ!'

গৃহকর্ত্রীর রাগ দেখে রবার্টসন তাঁর সঙ্গীদের ইশারায় জানিয়ে দিলেন, আর এগোনো ঠিক হবে না।

রনসন বললেন, 'মি. হাসান, আমার মতে রোরিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো উচিত। গারবারের রিপোর্ট এবং স্বচক্ষে আপনার ছেলের যে অবস্থা দেখলাম তাতে ওকে চব্বিশ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নজরে রাখা দরকার।'

আবিদ বলল, 'ওর মধ্যে যা ঘটছে তার মোকাবেলা করার কোন উপায় কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আছে?'

কেউ কোন জবাব দিলেন না।

তিন বিশেষজ্ঞ দ্রুত বিদায় নিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে, ঘুমানোর সময় শমিতা বলল, 'আবিদ, তুমি কি ওঁদের কথা বিশ্বাস করো?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবিদ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, করি।'

'ওদের সবকথা?'

'হ্যাঁ, সবকথা। রোরির কথাবার্তা তো তুমি শুনেছ। একটা আট বছরের ছেলের পক্ষে ও ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া কি সম্ভব? শমি, আমি নিশ্চিত, রোরি বদলে যাচ্ছে। শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও!'

পরদিন। বেলা এগারোটা বাজার পরেও রোরির ঘুম ভাঙছিল না। শমিতা ওকে কাতুকুতু দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করেছে বেশ কয়েকবার। তবু ঘুমে অচেতন রোরি। গতরাত সাড়ে আটটায় ঘুমিয়েছে ছেলে, এখনও জাগছে না। ভয় পেল শমিতা। একটানা পনেরো ঘণ্টা কি কোন বাচ্চা ছেলে ঘুমোয়?

'রোরি! ওঠো, সোনামণি,' কাঁপা গলায় ডাকে শমিতা, 'ওঠো,

মানিক আমার!' তবু ওঠে, না ছেলে। কেঁদেই ফেলছিল প্রায় হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠায় সামলে নিল নিজেকে।

'হেলেন বলছি, রোরির শিক্ষিকা,' অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল গলা।

'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। কী মনে করে?' শমিতার কণ্ঠে উৎসাহের অভাব।

'রোরি গতকাল স্কুলে আসেনি। আজও এল না। ঘটনা কী?'

'ও একটু অসুস্থ,' জানাল শমিতা। 'মিস হেলেন, কয়েক মাস আগে আমার সঙ্গে আপনার যেসব আলাপ হয়েছে মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। ওর অসুস্থতা কি ওসব ব্যাপার থেকে?'

'অনেকটা তা-ই,' বলল শমিতা। 'এখন তিনজন বিশেষজ্ঞ ওকে দেখছেন।'

'ওর পরীক্ষা আগামী সপ্তাহে। ততদিনে সেরে উঠে স্কুলে আসতে পারবে?' জানতে চায় হেলেন।

কান্না চেপে রেখে শমিতা বলল, 'ছেলে আদৌ আর স্কুলে যেতে পারবে কিনা ওপরওয়ালা জানেন!'

'ওর চিকিৎসা কেমন চলছে আমায় জানাবেন। যদি কোন সাহায্য লাগে...'

'থ্যাংক ইউ, মিস হেলেন।'

'গুডবাই। আমি রোরির জন্য প্রার্থনা করব।'

ষোলো

ড. স্টিফেন রনসন তাঁর গলার টাই নেড়েচড়ে ঠিক করে বেল টিপলেন। আজ তিনি দামি সুট পরে এসেছেন। দরজা খুলে শমিতা বলল, 'ও আপনি! আচ্ছা, আপনি কি হেলথ ট্রিটমেন্ট করতে পারেন?'

'আমি ডাক্তারিও পাশ করেছি। তবে রোগী দেখা আমার পেশা নয়। নৃতত্ত্ব নিয়ে আমার কারবার।'

'থ্যাংকস, গড! আপনি এসেছেন। নইলে এক্ষুণি আমি আমার স্বামীকে ফোন করতাম।'

'কেন কী ব্যাপার?' বিস্মিত রনসন।

'রোরি এখনও ঘুম থেকে জাগছে না। ওর মুখে বরফ-পানি দিয়েছি, তবু বেহুঁশের মত শুয়েই আছে।'

ঝড়ের বেগে রোরির কামরায় ঢুকলেন রনসন। পেছন থেকে শমিতা বলল, 'কত কাতুকুতু দিলাম তবু জাগে না।'

ঘুমন্ত রোরির বুকের ওপর ডান কান চেপে ধরলেন রনসন। হার্টবিট ঠিকই আছে। কপালে হাত দিলেন। জ্বর নেই। রোরির ঊরুতে চিমটি কাটলেন। নৃতাত্ত্বিকের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে সব দেখছিল শমিতা, 'ও ঠিক আছে তো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বললেন রনসন, 'ওর ঘুম কি একটু বেশি গভীর?'

'না তো! কখনও এমন গভীর ঘুম ঘুমায় না।'

রনসন কিছু বললেন না। তাঁর চিমটি কাজে দিয়েছে। রোরি নড়াচড়া শুরু করেছে।

'ওহ্, গড!' ফিসফিসিয়ে বলল শমিতা, 'থ্যাংক ইউ, ডক্টর জনসন।'

'জনসন নয়, আমার নাম রনসন।'

ঘুম ঘুম চোখ মেলে মুচকি হাসে রোরি।

'গুড আফটারনুন, মি. রোরি হাসান,' ঠাট্টা করেন ড. রনসন। 'আপনি দেখালেন বটে।'

সোজা হয়ে খাটে বসল রোরি। বলল, 'মা, এই লোকটা না দারুণ জোকার।'

খুশি হয়ে শাসায় শমিতা, 'ছিঃ ওভাবে বলে না। ইনি মস্ত বড় পণ্ডিত।'

শমিতা দারুণ স্বস্তি পেয়েছে। কৃতজ্ঞ হয়ে সে ওইদিন বিকেলেই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তিন বিশেষজ্ঞকে আসতে দেয়। কারণ, রনসনের মন্তব্য সত্য বলেই মনে হচ্ছে। রনসন বলেছেন, রোরির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটছে খুব দ্রুত, তাই ঘুম বেড়ে গেছে। ওর খিদেও হতে পারে প্রচুর। দেখা গেল, সেই দুপুরে রোরি প্রচুর খেয়েছে। যা খেয়েছে তা পূর্ণবয়স্ক তিনজন মানুষের একবেলার খাবার।

আবিদ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে তিন বিশেষজ্ঞ মিলে গল্প করছেন শমিতা আর রোরির সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর সে ফোন করল 'ডিউড্রপ' হোটেলে ইয়েন ট্যানারের কাছে।

'আমি মাফ চাইছি, মিস্টার ইয়েন।'

'মাফ? রোরির ব্যাপারে?' জানতে চান ইয়েন।

'হ্যাঁ। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলছেন, ও বদলে যাচ্ছে।'

'ওয়াণ্ডারফুল! আমি কি আসব আপনাদের ওখানে?'

'কয়েকজন ডাক্তার আজ রাতে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। চাইলে আপনিও আসতে পারেন।'

'চাই মানে? ডাক আসবে, এই আসাতেই তো এখনও আমি এ শহর ছেড়ে যাইনি। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। ফিল্ম করব। কিন্তু ইভ মেয়েটাকে কি এখন পাব? বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কোথায় কোথায় আড্ডা মারে! নিজেও ক্যামেরা চালাতে শিখিনি। কী যে করি!'

ইয়েনের উদ্দীপনা দেখে আবার মেজাজ খিঁচড়ে যায় আবিদের। ব্যাটা আছে টাকা বানানোর ধান্দায়। বিস্ময়কর বিষয় ফিল্মে বন্দি করে বাজার গরম করার মতলব তার।

ঠকাশ করে রিসিভার রেখে দিল ও।

রাতে চারজন বিশেষজ্ঞ টনকে টন প্রশ্ন করে কেড়ে নিলেন রোরির টিভি দেখার সময়টুকু। যেসব জবাব তাঁরা পেলেন, তা পরে খুব সাবধানে পর্যালোচনা করবেন ঠিক করলেন। এতে সময় লাগবে।

চিনেমাটির জিনিসপত্র আর গ্লাস ভাঙার রহস্যময় ব্যাপারটা আলোচনায় আসতেই রোরি হুট করে বলল, 'ওটা আমি করেছি। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওটা করে ফেলেছি।'

তাজ্জব বনে যায় আবিদ, জটিল শব্দ 'একান্ত' 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও' বলছে রোরি, যেন প্রাজ্ঞ কোন ব্যক্তি উচ্চারণ করছে শব্দগুলো।

'কেমন করে ভাঙলে?' প্রশ্ন করেন রবার্টসন।

'আমার মনের জোর দিয়ে। আমি হাইব্রিড। খুব জোর দিয়ে কিছু চাইলে ওসব ঘটে যায়,' বলে রোরি, 'এই দেখুন না!'

বলেই রোরি দেয়ালের দিকে তাকাল। ওখানে টাঙানো আছে ফ্রেমে বাঁধানো তার নিজের ছবি। সেদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকে সে। অমনি ফ্রেমের কাঁচ বিস্ফোরিত হলো। টুকরো টুকরো কাঁচ ঝরে পড়ল মেঝেতে।

ভয়ে স্বামীকে আঁকড়ে ধরল শমিতা, 'ও কী!'

'একে বলে টেলিকাইনেসিস,' মন্তব্য করেন গারবার, 'রোরির এক ধরনের মানসিক প্রতিভা। ভৌতিক কোন ব্যাপার নয়।'

বিশেষজ্ঞদের অধিবেশন শেষ হলো রাত সাড়ে এগারোটায়। রবার্টসন, গারবার আর ইয়েন চলে গেলেন। হোটেলে রুম বুক করতে ভুলে গিয়েছিলেন রনসন। এত রাতে ১৫০ মাইল দূরের বাড়িতে তাঁকে আর যেতে দিল না হাসান দম্পতি। এ বাড়ির গেস্ট রুমেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো।

সতেরো

চুপিসারে খাট থেকে নেমে অন্ধকারে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল আবিদ। বাতি জ্বালাবার জন্য সুইচ টিপলে শব্দ হবে, তাতে স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বেচারী! ছেলের জন্য অবিরাম দুশ্চিন্তা ওর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই বেলা একটু শান্তিতে ঘুমোক!

বাথরুমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে ওঠে আবিদ। তার চেহারাতেও যে দুশ্চিন্তার ছাপ! চোখের নীচে কালো দাগ। কপালে কুঞ্চন। গোসল করে একটু তাজা লাগল। সকাল ছ'টা বাজে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চমকে উঠল আবিদ। কিচেনের পাশে

ডাইনিং স্পেসে আলো জ্বলছে কেন? কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে শমিতা। চুল এলোমেলো। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আবিদ বলল, 'তোমার ওঠার কোন দরকার ছিল না। ব্রেকফাস্টের জন্য কিছু একটা করে নিতাম!'

'তোমার ব্রেকফাস্ট তৈরি করার জন্য উঠিনি,' শীতল কণ্ঠস্বর শমিতার।

'তবে?'

'ঘুমাতে পারছিলাম না,' মৃদু কণ্ঠে বলে শমিতা।

'একটুও ঘুম হয়নি? ঘুমের বড়ি তো খেয়েছিলে।'

'খেয়েছি। তবু গাঢ় ঘুম হয়নি। তোমার নিশ্চয়ই ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি,' কথাটা শমিতা বলল ঠেস দিয়ে। তবে আবিদ শ্লেষটা ধরতে পারল না।

'ঘুম নিয়ে কোন প্রবলেম আমার কোন কালেই ছিল না। এখনও নেই। ক্লাস টেনে পড়ার সময় আমার মেজ বোনের বিয়ে হয়। সারা বাড়িতে অতিথি গিজগিজ করছে, গান বাজনা হৈ চৈ চলছে। আমি ঠিক রাত দশটায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা দেখে বাবা যে মন্তব্য করেছিলেন ওটা তোমাকে...'

'বলেছ। অন্তত পাঁচ-ছ'বার। এক কথা বারবার বলে কোন্ বাহাদুর সাজতে চাও বুঝি না।'

ব্রেড স্লাইসে মাখন মাখানো বন্ধ করে আবিদ বিস্মিত চোখে তাকাল। 'কী ব্যাপার, শমিতা?'

'কী?'

'তুমি খেপে আছ আমার ওপর। কারণ কী...'

'কে খেপে আছে? আমি কনফিউজড। নিজের ছেলের এমন অবস্থায় একটা লোক কেমন করে অফিসে যেতে পারে সেটাই ভেবে পাই না।'

স্ত্রীর রাগ কমানোর জন্য আবিদ বলল, 'আরে অফিসে না

গেলে টাকা পাব কোত্থেকে? টাকা না পেলে সংসার চলবে কীভাবে?'

'তা-ই! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি আমাদের এড়িয়ে চলার ফন্দি করেছ।'

'খোদা! তুমি দেখছি সত্যিই একটা ঝগড়া বাধানোর তালে আছ! তোমার কি ধারণা, রোরির এই অবস্থা আমাকে এফেক্ট করছে না?'

'তা হলে এত অফিসে যাওয়ার দরকার কী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আবিদ। না, বিতণ্ডা বাধানো ঠিক হবে না। স্ত্রীর মন ভাল নেই। মানসিক চাপে আছে বেচারী। স্বাভাবিক পন্থায় ওকে সামলানো উচিত। বলল, 'শোন, শমি, আসছে সোমবার থেকে দু'সপ্তাহের ছুটি নিচ্ছি। শনিবার থেকে চব্বিশ ঘণ্টা তোমার আর রোরির সঙ্গে কাটাতে পারব।'

'রোরি আগামী শনিবার পর্যন্ত আমাদের মাঝে থাকবে, তুমি কী করে জানো?'

শমিতা সহজ ভঙ্গিতে বললেও কথাটার মধ্যে হুল ছিল।

'ঠিকই বলেছ, আমি বুঝতে পারিনি,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে আবিদ। 'অফিসে তা হলে বলে দিচ্ছি, আমি অসুস্থ তাই যেতে পারব না।'

শমিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'থাক, রোরিকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার অফিসে যাও! গো টু ইওর ড্যাম জব!'

'আরে! কী চাও তুমি? ঘরে বসে থাকি এটাই তো চেয়েছিলে তুমি। কি, চাওনি?'

জবাব না দিয়ে উঠে যায় শমিতা। একটা মাত্র রুটি খেয়েছিল আবিদ। আরেকটা টেবিলে রেখে উঠে পড়ল। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বাইরে। গাড়ির শব্দ শোনা গেল। অফিসে যাচ্ছে সে।

আটটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে গোসল করে ফিটফাট হলেন ড. রনসন। কিচেনের দিকে আসছিলেন, দেখলেন ডাইনিং টেবিলের পাশে বসে আছে শমিতা।

'মর্নিং, মিসেস হাসান,' বললেন তিনি, 'আশা করি ভালই বিশ্রাম করেছেন।'

'আসলে বলতে কি, ঘুম আমার সামান্যই হয়েছে,' বলল শমিতা। তারপরেই খেয়াল হলো সৌজন্য প্রকাশ করছে না ও। তাই চটজলদি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঘুম হয়েছে তো?'

'জি, বেশ আরাম করে ঘুমিয়েছি।'

'ব্রেকফাস্ট দেব আপনাকে? হ্যাম অ্যাণ্ড এগস?'

'না, ধন্যবাদ। আমি দুপুরের খাবারের আগে কদাচিৎ কিছু খাই,' বললেন রনসন। শমিতার হাতে খালি পেয়ালা দেখে বললেন, 'তবে একটু কফি হলে মন্দ হয় না।'

উঠল শমিতা। সিংকে গিয়ে কফি পট পরিষ্কার করতে করতে বলল, 'আজকের আলোচ্য সূচীতে কী আছে?'

'বুঝলাম না, ম্যাডাম!'

'রোরির ব্যাপারে আজ আপনাদের প্ল্যান কী?'

টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে রনসন বললেন, 'কোন প্ল্যানই আমরা করতে পারছি না। মেডিকেল হিস্ট্রিতে এরকম কিছু তো কখনও ঘটেনি। তাই আমরা মূলত পর্যবেক্ষণ করব আর নোট লিখব।'

'তা হলে রোরিকে কোন সাহায্য করছেন না?'

'তাকে সাহায্য মানে?'

'ওকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।'

রনসন হাসলেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না আপনি। আদতে রোরির মধ্যে গোলমেলে কিছুই নেই। ও তার স্বাভাবিক

আকৃতি ধারণ করছে মাত্র। অ্যাজ আ রেগুলার হিউম্যান, হি ওয়াজ অ্যাবনর্মাল।'

শমিতার নীরব কান্না দেখতে পেলেন না রনসন। শুধু শুনলেন, ও বলছে, 'এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের কি ডেকে আনা উচিত নয়? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটি।'

'ডা. গারবার আর আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু ডা. রবার্টসনের চিন্তা অন্যরকম। তিনি বলেছেন, আপনি আর আপনার স্বামী প্রাইভেসি আশা করেন। তিনি এ কথাও বলেছেন ব্যাপারটা হাইব্রিড থিয়োরির সঙ্গে খাপ না-ও খেতে পারে। অন্তত বর্তমান পর্যায়ে এটাই ধরে নেয়া উচিত।'

'আমার ছেলে বদলে গিয়ে ওয়্যারউলফ না-ও হতে পারে?' ক্ষোভ এবং আশার মিশেল ঝরে পড়ে শমিতার প্রশ্নে।

'না-ও হতে পারে। রবার্টসনের সেটাই বিশ্বাস। ইয়েন ট্যানারের সাথে আলাপ করে আমারও তাই মনে হয়েছে। তবে এখনও এটা সম্ভব, কোন একটা মনস্তাত্ত্বিক মৌলিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।'

শমিতা আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, দোরগোড়ায় রোরিকে দেখে থেমে গেল। ছেলের গায়ের পশম আরও লম্বা হয়েছে একরাতের মধ্যেই। ওর মুখমণ্ডল ও বাহুতে নতুন পশম উঠেছে।

'মানিক আমার। কখন উঠলে?' মুখে হাসি ফোটায় শমিতা।

'মা, তোমায় আমি খুঁজছি...আরে মিস্টার রনসনও আছেন দেখছি!' মৃদু গলায় বলল রোরি।

'খিদে পেয়েছে, সোনা?'

'আমি পানি খাব,' বলল রোরি, 'আইস ওয়াটার।'

'দিচ্ছি,' পরিষ্কার একটা গ্লাস তুলে নিল শমিতা, বলে, 'পানি খেয়ে এরপর নাশতা, কেমন?'

'না। আমার খিদে পায়নি, এখন আমি ...আমি...ও, গড!'

কুঁজো হয়ে নিজের পেট খামচে ধরল রোরি, ব্যথায় মুখ বিকৃত।

'রোরি!' চিৎকার দিল শমিতা।

মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে রোরি, 'মা মাগো, যন্ত্রণা হচ্ছে, মা। খুব যন্ত্রণা!'

রনসন আর শমিতা মিলে ধরাধরি করে যন্ত্রণাকাতর ছেলেটিকে সোফায় নিয়ে শুইয়ে দিল। ব্যথা কিছুটা কমলেও রোরির শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল। মেডিকেল ব্যাগ আনার জন্য গেস্টরুমে গেলেন রনসন। ফোন তুলে হাসপাতালে ডায়াল করল শমিতা।

'মা!' রোরি গোঙাতে গোঙাতে বলে, 'হাসপাতালে খবর দিয়ো না, প্লিজ!'

'তুমি অসুস্থ, রোরি।'

'না, আমার এরকমই হবে। আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ো না।' কষ্ট হচ্ছে ওর কথা বলার সময়।

দ্বিধায় পড়ে গেল শমিতা। কামরায় ফিরে এসে রোরির বুকে স্টেথোস্কোপ বসালেন রনসন। ছেলেটা এখনও তার মাকে অনুনয় করে চলেছে যেন হাসপাতালে ফোন না করে।

'ড. রনসন?' উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকল শমিতা।

'হার্টবিট ঠিকই আছে। লাংসেও কোন জটিলতা নেই।'

'মা, আমি সুস্থই আছি। এরকম হয়তো আবারও হবে। আমি ব্যথা পাব, কিন্তু...' কথা শেষ করতে পারল না রোরি, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। এক হাতে সে পেট খামচে ধরল, অন্য হাতে ধরল সোফার পাশে রাখা ফ্লোরল্যাম্পের স্ট্যাণ্ড। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ঠক করে ভেঙে গেল ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড। হাসল রোরি, 'আমার ব্যথা আর নেই।'

ইস্পাতের তৈরি ল্যাম্প স্ট্যাণ্ডের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে শমিতা। দুই-তিনজন সমর্থ পুরুষ মিলেও এই স্ট্যাণ্ড হয়তো বাঁকা করতে পারবে না। আর আট বছরের একটি ছেলে তার বাম হাতের চাপ দিয়েই ধাতব স্ট্যাণ্ডকে ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলেছে।

আঠারো

সকালে আর কিছু ঘটল না। বেলা একটায় প্রচুর খেয়ে-দেয়ে রোরি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে আবিদ দেখে, ছেলে গভীর ঘুমে অচেতন। সকালের ঘটনা শুনে সে ঠিক করল, আর একদিন অপেক্ষা করবে। এরপরও রোরির পেটে ব্যথা উঠলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেশের সেরা ডাক্তারদের ডেকে আনবে।

রবার্টসন ও গারবার এলেন সন্ধ্যায়, তাঁরা যতক্ষণ ছিলেন তখনও রোরি ঘুমিয়ে। তিন বিশেষজ্ঞ চলে যাবার আগে গারবারকে জিজ্ঞেস করল শমিতা, 'আবার রোরির ব্যথা উঠলে ওকে কোন বড়ি খাওয়ানো যাবে?'

'না, বড়ি খাওয়ানো ঠিক হবে না,' বললেন ডা. গারবার।

'কেন, খাওয়ালে সমস্যা কী?'

'বড়ি খেলে ওর ক্ষতি হতে পারে,' বললেন গারবার, 'ওর সিস্টেম বদলে গেছে। এরকম অবস্থায় শরীরে ওষুধের প্রভাব

কেমন হবে সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নেই। অ্যাসপিরিনের চাইতে কড়া যে কোন বড়ি মারাত্মক হবে। এমনকী অ্যাসপিরিনও ক্ষতিকর হতে পারে।'

তিন বিশেষজ্ঞ বেশিক্ষণ থাকলেন না। শুধু রয়ে গেলেন রনসন। যে কোন মুহূর্তে একজন ডাক্তার দরকার হতে পারে ভেবে রবার্টসন পরামর্শ দিয়েছেন, 'আপনি থেকে যান, মি. রনসন। বলা তো যায় না কখন কী হয়!'

রনসন চলে গেলেন গেস্টরুমে। ছেলের কামরায় ঢুকল শমিতা। ঘুমন্ত ছেলের এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে মনে হলো ওর শরীর থেকে যেন অস্বাভাবিক একটা তাপ আসছে। অস্বাভাবিক? কোন্‌টা অস্বাভাবিক কে বলতে পারে?

এগিয়ে গিয়ে রোরির মাথায় আলতোভাবে হাত বুলায় শমিতা। কান্না আসছে ওর। ফিসফিস করে বলে ও, 'কী হলো, মানিক আমার? তোমার কী হলো?'

রাত পৌনে বারোটা। ফারবোকলেন এলাকার বাড়িঘরে তেমন আলো জ্বলছে না। অকাল উষ্ণ হাওয়া সবাইকে ঘুমকাতুরে করে তুলেছে। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে,' বলেছে রেডিও আবহাওয়া বুলেটিন, 'কেননা মার্চ মাসে এরকম অস্বাভাবিক মেঘের আনাগোনা বহু বছর পর দেখা যাচ্ছে।' সবাই ঘুমে। কেউ জানে না আবিদ হাসানের বাড়িতে কী ঘটছে।

ইরা কলিন্স নিঃসন্তান, বয়স ঊনচল্লিশ। আবিদের বাড়ি থেকে ইরার বাড়ি আধ মাইল দূরে। আসলে এ বাড়ির সরাসরি পেছনেই ও বাড়ি, মাঝখানে দুটো রাস্তা তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। আবিদ ও শমিতা সামান্যই জানে ইরা সম্পর্কে, কারণ তাকে কেউই ভালভাবে চেনে না।

আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন ইরা, তবে ধনী নয়। নিজেকে

নিয়েই আছে। বুদ্ধিমতী, দেখতেও সুন্দরী তবু কারও সঙ্গে ডেট করতে নারাজ। শুধু আগস্টের দু'সপ্তাহ ছুটি কাটানোর জন্য ফ্লোরিডার সাগর সৈকতে যায়, একা। বর্ধিষ্ণু শহরতলীর কোলাহলের মাঝে নিজস্ব একটা বৃত্ত গড়ে তুলেছে ইরা।

রাত সোয়া বারোটা। টেলিভিশনে সিনেমা চলছে। ইরা তেমন আগ্রহ নিয়ে দেখছে না, উপন্যাস পড়তেই ভাল লাগে। সিনেমা মানে ঢিসুম ঢুসুম, ফাইট; বিরক্তিকর। একা একা থাকলেও ইরা সহজে ভয় পাবার মেয়ে নয়, তার বাড়িতে একটি মাত্র বাতি জ্বলছে।

বাড়ির পেছনের দরজায় ঘষটানোর মত শব্দ হলো। ইরা কোন বিড়াল বা কুকুর পোষে না। ভাবল, পাশের বাড়ির বিড়াল ভুল করে চলে এসেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হাসির শব্দে কান খাড়া করল ইরা। হাসিটা নরম অথচ তীব্র; মহিলা কিংবা বাচ্চার হাসি। বেডরুমে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে একটা পিস্তল আছে ইরার, গত পাঁচ বছর ওটা বের করা হয়নি। হাসির শব্দটা অনেকটা গানের মত মনে হতেই ও পিস্তল আনতে গেল, কিন্তু ড্রয়ারের সামনে গিয়ে মত পাল্টাল।

বাচ্চা কোন ছেলেমেয়ে দুষ্টুমি করছে হয়তো।

ইরা কোমর থেকে লম্বা একটা বেল্ট খুলে নিয়ে ভাঁজ করল। তারপর নিঃশব্দে খুলল দরজা। আকাশে চাঁদ আছে। মেঘের জন্য তেমন আলো ছড়াতে পারছে না। উঠোনে লাফাচ্ছে একটা প্রাণী। বেশ বড়সড়, সাদা লোমশ দেহ।

কিচেনের তাক থেকে টর্চ নিয়ে উঠোনে নামল ইরা।

টর্চের আলোয় দেখল, ঘন, সাদা লোমশ পিঠের প্রাণীটি উবু হয়ে দুলছে। ওটার গায়ে বেল্টের বাড়ি মারল ইরা। সপাং শব্দে আঘাতটা গলার কাছে লাগল। আঁউ করে চিৎকার করল প্রাণীটা। ইরা চাবুকের মত বারবার আঘাত হেনে চলল।

প্রায় মানুষের মত আর্তচিৎকার করে প্রাণীটা তার মাথা বাঁচাতে চাইছে, আঘাতের পর আঘাতে কাবু হয়ে সে ঘরের দেয়ালের কাছে সরে গেল। পালাবার সুযোগ পাচ্ছে না। ইরা আরও উত্তেজিত হয়ে বাড়ি মারতে থাকে। জানোয়ারটাকে সে আচ্ছা করে শিক্ষা দেবে যাতে আর কখনও এদিকে পা না বাড়ায়।

'লেডি! লেডি, থামুন!' অবশেষে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলে উঠল ওটা। শুনে তো তাজ্জব ইরা। তারপর ভয় পেল ও, ভীষণ ভয়। আরও প্রচণ্ড শক্তিতে বাড়ি মারতে লাগল। টর্চের সীমিত আলোয় কুকুর না মানুষ বুঝবার কোন উপায় ছিল না।

'প্লিজ! থামুন! খোদার দোহাই।'

থামল না ইরা। এবং ভুল করল সেখানেই। কোণঠাসা, আঘাত খাওয়া ক্ষিপ্ত প্রাণীটি তার ডান হাত উঁচু করল। হঠাৎ, ইরা তার বাম পাঁজরের নীচে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করল। টর্চ লাইট আর বেল্ট পড়ে গেল হাত থেকে। জানোয়ারের মুষ্টাঘাত যেন সেঁধিয়ে গেছে তার শরীরে।

রোরির প্রচণ্ড ঘুষিতে ইরার বুকের কয়েকটা হাড় চুরমার হয়ে গেছে। ঘুষি মেরেই আবছা আলোয় ভল্লুকের মত লাফ মেরে দ্রুতগতিতে পালিয়ে গেল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চিন্তা করল ইরা। ব্যাপারটা কী? তারপর মাতালের মত দুলতে দুলতে ঢুকল ঘরে। যন্ত্রণায় চোখে ধোঁয়াশা দেখছে। ফোন করতে হবে হাসপাতালে।

'ঈশ্বর, সইতে পারছি না।' কাঁদছে ও। ফোনের পনেরো ফুট দূরে পড়ে গেল। কার্পেটের ওপরই মরে যাব আমি? হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় সে। ঠোঁট কামড়ে ব্যথা কমাতে চাইছে।

যন্ত্রণায় পৃথিবীর সবকিছু ভুলে গেল ও। মূর্ছা গেল ইরা। তখন ভোর ছ'টা। মার্চ ১৫।

জীবনে নিজেকে এত অসহায় কখনও মনে হয়নি আবিদের। সিদ্ধান্ত নিল, আজ এবং কাল ও অফিসে যাবে না। গতকাল স্ত্রীর মেজাজ সে দেখেছে। কিন্তু বাড়িতে থেকেই বা করবে কী? শমিতার সঙ্গে বসে বসে কাঁদবে?

খোদা, একটা উপায় করে দাও। বিশেষজ্ঞরা যেন কিছু একটা করেন...ওষুধ, সম্মোহন বা সার্জারি যা-ই হোক, রোরি স্বাভাবিক হয়ে গেলে বেচারী শমিতা স্বস্তি পাবে। ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকায় আবিদ।

কিছুক্ষণ পরে রোরির কামরায় গেল সে। দেখে, ছেলে পোশাক পাল্টাচ্ছে।

'বাবা, আমার খিদে পেয়েছে,' বলল রোরি।

ঝটিতি ছেলেকে কাঁধে তুলে নিল সে। ডাইনিং টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে। কেক, হ্যাম, মাখন, বনরুটি এনে দিল।

'বাবা, ধরো গতরাতে কোন ঘটনা ঘটলে, সেটা কি আজকের পত্রিকায় উঠবে?'

'কখন সেটা ঘটল তার ওপর নির্ভর করে, পত্রিকায় উঠবে কিনা। বেশিরভাগ পত্রিকার কাজ রাত দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।'

'ধরো রাত বারোটায় ঘটল?'

'তা হলে না ছাপানোর সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে পরদিন সকালে রেডিওর খবরে ঘটনাটি জানা যাবে।'

'তা-ই?' খুশি হয় রোরি, 'এসো, নাশতা খেতে খেতে আমরা রেডিও শুনি।'

'হ্যাঁ, শুনব।' আবিদ রেডিওর নব ঘোরায়। সকাল সোয়া সাতটার সংবাদ শোনে ওরা। আবিদ জিজ্ঞেস করে, 'বিশেষ কোন খবর শুনতে চাইছিস তুই?'

'কিছু না, এমনি আর কী!' হাসে রোরি।

ওরা নাশতা খেয়ে কফির পেয়ালায় মুখ দিতেই সংবাদ সম্প্রচার শেষ। না, তাদের এলাকায় কোন চুরি বা রাহাজানির খবর নেই।

উনিশ

রবার্টসন অফিসে একা বসেন। বেলা দুটো। অফিসের কাজ অনেকটা শেষ করে এনেছেন। রোরির ব্যাপারটা আবার তাঁর মনে পড়ল। শমিতা হাসানের বিষণ্ন চেহারা ভেসে উঠল চোখে। একজন মা, অতিশয় ভদ্র এক মহিলা, যিনি আমায় মুরুব্বি জ্ঞান করেন, তাঁর কঠিন সমস্যাটির সমাধানে এখনও আমি কিছুই করতে পারলাম না, ভাবলেন রবার্টসন।

দাড়িতে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে, কফির শেষ তলানিটা গলায় ঢেলে দিলেন রবার্টসন। সকালের দৃশ্যটা এখনও ভুলতে পারছেন না। অ্যালিস সুস্বাদু খাবারগুলো ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজিয়েছেন রোজকার মত। কিন্তু অন্যদিনের মত কোন খোশগল্পই করলেন না অ্যালিস। স্বামীর কথার উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' 'হুঁ' করলেন। গত কিছুদিন ধরে প্রত্যেক রাতে তিনি শমিতার বাড়িতে যান, কেন যান সেটা স্ত্রীকে বলেননি। এটাই অ্যালিসের গোস্বার কারণ।

শমিতা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তার সঙ্গ অ্যালিসের খুবই পছন্দ। এমন মহিলাকে অ্যালিস ঈর্ষা করতে পারেন, রবার্টসনের

কল্পনাতেও আসেনি। 'আমি ওর ছেলের চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে যাই,' বলতে পারতেন রবার্টসন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন অ্যালিস, শমিতা তাঁর মেয়েরই বয়সী, এমন মেয়েকে বেহুদা সন্দেহ করা অন্যায়। স্ত্রীকে কোন কৈফিয়ত না দিয়ে অফিসে চলে এলেন রবার্টসন। এসেও স্বস্তি পেলেন না।

'শুনলাম আপনার স্যানাটোরিয়ামে রোগীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়। তাই দেখতে এলাম,' বলল অ্যানিটা ওয়াটসন, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার।

অ্যানিটা মেয়েটা খুবই স্মার্ট, জিনসের প্যান্ট আর সিল্কের শার্ট গায়ে। উদ্ধত বুকের অনেকটাই দৃশ্যমান। পূর্ব-পরিচিত না হলে রবার্টসন বলতেন, 'দেখতে এসেছ? নাকি দেখাতে?'

'গো অ্যাণ্ড সি ইয়োরসেলফ,' কিছুটা রূঢ় গলায় বললেন রবার্টসন। ইন্টারকম টিপে টিম নামে এক অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে বললেন, 'এঁকে ওয়ার্ডগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসো।'

অ্যানিটা একটা ওয়ার্ডে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। যোশেফ নামে এক রোগী চেয়ার দিয়ে পেটাচ্ছে দু'জন অ্যাটেনডেন্টকে। অনেক কষ্টে রোগীকে শান্ত করার পর আলাদা এক কামরায় তাকে ঢুকিয়ে তালা মারা হলো।

'সরি, ডক্টর! মনে হলো রোগীরাই অমানবিক আচরণ করছে,' ফিরে এসে বলল অ্যানিটা।

রবার্টসন এবার হাসলেন, 'এটা আবার রিপোর্ট করবেন না প্লিজ! অন্যায় করছে বুঝতে পারলে কি এখানে ওরা আসত?'

'তুমি ড্রাগস খাও? মারিজুয়ানা, কোকেন?' প্রশ্ন করে রোরি।

ইভ টমাস ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। এতটুকুন ছেলের পাকামো প্রশ্নে রাগ হলো তার। ইয়েন ট্যানারের সঙ্গে হাসান দম্পতির বাড়িতে এসেছে সে দুপুরের আগে। দুর্দান্ত একটা ব্যাপার, যা

দেখে-শুনে মানুষ চমকে যাবে, তারই সন্ধানে এসেছেন ইয়েন। ফিল্ম করবেন।

'রোরির প্রশ্নের জবাব দাও, মিস ইভ,' নির্দেশ দিলেন ইয়েন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইভ বলল, 'কে না খায়? আমি কিছুটা চেখেছি বৈকি।'

'আর কখনও খেয়ো না,' বলে রোরি, 'জানো? কুয়োর মধ্যে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার? ড্রাগস খেত। একদিন ভুল করে ড্রাগস মনে করে ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে পটল তুলেছে। তোমার যদি অমন হয়, তোমার বয়ফ্রেণ্ড হেনরি বেচারার কী হবে?

লজ্জায় লাল হয় ইভ। কিছু বলে না। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য ইয়েন বললেন, 'যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনাটা আবার বলো তো, রোরি। বিপথগামীদের তিনি বলেছিলেন...

বেলা সাড়ে এগারোটায় ইরা কলিন্সের জ্ঞান ফিরে এল। তার শরীর পাথরের মত ভারী। বাম চোখে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে। মাথা তোলার চেষ্টা করল। মনে হলো, মাথাটার ওজন একশো পাউণ্ড। 'বাঁচাও,' বলে চিৎকার দিল ইরা। কোন সাড়া পেল না। কাঁদতে শুরু করল শেষ পর্যন্ত, 'গড, প্লিজ নট দিস ওয়ে।'

ঠিক সেই সময় রোরিকে বলছে আবিদ, 'তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'কী ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করে রোরি।

'তোর ব্যাপারে।'

ছেলের পাশে বসে সিগারেট ধরাল আবিদ। ওর কাঁধে সস্নেহে হাত রাখল। রোরিও সাড়া দিল। মাথাটা ঘষে বাবার পেটে। আবিদ বলল, 'খোকা, সত্য কথাটা খুলে বল আমায়।'

'আমার বদলে যাবার কথা জানতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল রোরি।

'হুঁ।'

'হ্যাঁ, বাবা, সত্যি আমি বদলে যাচ্ছি। দুই/এক সপ্তাহের মধ্যে আমি বিলকুল বদলে যাব। শরীর এবং মন দু'দিক থেকেই।'

'বদলে যাবার পর?'

একটু চুপ করে থেকে রোরি বলল, 'কিছুদিনের জন্য বোধহয় তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। পাহাড়ে গিয়ে অন্যদের খুঁজতে হবে। পৃথিবীতে আমিই একমাত্র হাইব্রিড ওয়্যারউলফ নই, তবে আমিই সম্ভবত একমাত্র ওয়্যারউলফ যে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়।'

'পাহাড়ে যেতে হবে কেন?'

জবাবে আবিদের চোখে চোখ রেখে রোরি ঠোঁট ওল্টায় যার অর্থ, 'আমি কী জানি?'

'আমরা তোকে ভালবাসি, রোরি। তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি এটাই আমরা চাই।'

'আমি জানি।'

'বদলে যাওয়া কি বন্ধ করতে পারিস না? আবার আগের মত হতে পারিস না?'

'পারব হয়তো...'

দুজনেই চুপ করে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, গলা খাঁকারি দিয়ে আবিদ বলল, 'কুয়োর ব্যাপারটা কী বল তো?'

'কুয়ো আছে, সেখানে গেলে অনেক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়।'

'কীরকম লোক তারা?'

'হাজার হাজার বছর আগের লোক। একশো বছর আগের লোক। এমনকী বর্তমান কালের লোক। ওখানেই রোলির দেখা

পাই।'

'রোলি আবার কে?'

'রোলি একটা মেয়ে ওয়্যারউলফ। বয়েস চোদ্দ বছর। ওর বাবা গেল বছর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এখন থাকে এতিমখানায়। কিছুদিনের মধ্যেই ওকে ওর খালা এসে নিয়ে যাবে। ওখানে গেলে ওর ক্ষতি হবে। ওকে রক্ষা করা দরকার।'

আবিদ আর বিস্মিত হয় না। তার ছেলের অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতা আছে কোন সন্দেহ নেই। ও যা-ই বলুক আর করুক, এখন পরিষ্কার যে রোরি ওদের ছেড়ে চলে যাবেই।

দুপুরের খাবারের আগ পর্যন্ত রোরি এ কামরা থেকে ও কামরায় ছুটোছুটি করল। তামাশা করল। প্যারোডি গাইল। ওর চাঞ্চল্য আর ফুর্তি দেখে গত ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম শমিতার বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল।

বিশ

টেলিভিশন অন করা ছিল গতরাতে, এখন আজ বেলা বারোটায় তেমনি আছে। ধাঁধার আসরে সুন্দর হাসি উপহার দিয়ে বিষয় উপস্থাপনা করছে এক যুবতী। আর এদিকে ইরা কলিন্স নিজের লিভিংরুমে শুয়ে কাতড়াচ্ছে।

ডোরবেল বাজল। দরজার ওপাশে পুরুষ কণ্ঠ, 'মিসেস কলিন্স, আপনার একটা প্যাকেট ছিল।' হ্যাঁ, ডাকে অর্ডার দেয়া হয়েছিল

পরচুলার জন্য। পরচুলা তার জীবন বাঁচাবে, আশান্বিত হয় ইরা।

'আমি এখানে,' চিৎকার করল সে। কিন্তু গোঙানির মতই শোনায় সেটা। কার্পেটের ওপর কাত হয়ে আছে সে। ডাকপিয়ন ম্যাক কি টেলিভিশনের শব্দ শুনেও বুঝতে পারছে না ঘরে লোক আছে?

জানালার পর্দা ফেলা। নইলে ডাকপিয়ন দেখতে পেত, গৃহকর্ত্রী মরণাপন্ন।

'বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে,' প্রাণপণে চিৎকার করে ইরা। কিন্তু শব্দ হয় খুবই ক্ষীণ। এত নিচু যে টিভির শব্দের তুলনায় কিছুই না।

আবার ডোরবেল বাজল। ম্যাক ঠিক করল, প্যাকেটটা দোরগোড়ায় রেখে দেবে। কারণ, টিভির শব্দই জানান দিচ্ছে মিসেস কলিন্স ঘরেই আছেন। হয়তো তিনি বাথরুমে, তাই দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে।

তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর প্যাকেটটা দোরগোড়ায় রেখে চলে গেল ম্যাক।

বিকেল পাঁচটায় ইরা আবার চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তার গলা থেকে ফিসফিসে আওয়াজ বের হলো শুধু। আবারও সে চেষ্টা করল 'বাঁচাও,' বলার জন্য। এবার রক্ত বেরুতে থাকল তার মুখ থেকে। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথা। ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না এখন কোথায় আছে! শুধু অনুভব করল, ওর সারা শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে আছে এবং সে শুয়ে আছে পৃথিবীর কঠিনতম বিছানায়।

ইয়েন ট্যানার চলে গেছেন ঘণ্টাখানেক আগে। গারবার, রবার্টসন আর রনসন এখনও আছেন। তাঁরা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছেন হাসান দম্পতির সঙ্গে। সোফায় এক কোণে বসে টিভি দেখছে রোরি।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই রোরির রক্ত-বমি শুরু হয়ে গেল। ওর শার্টের সামনের দিক ভিজে গেল রক্তে। বিশেষজ্ঞ তিনজনই 'ও, গড' বলে রোরির কাছে ছুটে গেলেন।

রোরি দৌড়ে ঢুকল বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকেই দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। তারপর ধীরেসুস্থে বাথরুমের প্লাস্টিক বাকেট তুলে নিল। থু থু করে আটটা দাঁত ফেলল বাকেটে। রাত তখন আটটা।

সে রাতে শমিতাকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে বিছানায় নিয়ে গেল আবিদ। নইলে ঘুমাতে পারত না তার স্ত্রী।

রাত আটটা একান্ন মিনিটে আবার জ্ঞান ফিরল ইরার। সে প্রার্থনা করল, 'যীশু, রক্ষা করো। যীশু, যীশু...' প্রার্থনা করল।

রাত এগারোটার দিকে আবিদ হাসানের বাড়িতে নেমে এল অস্বাভাবিক নীরবতা। একটু আগে গারবার আর রবার্টসন চলে গেছেন। রোরি ঘুমোচ্ছে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন সে। আবিদ আর রনসন টিভির সামনে বসে আছে। একটা জাপানী হরর ছবি চলছে। ছবিটা দেখার ভান করছেন দু'জনেই। কিছুক্ষণ পরে রনসন সাহিত্য আর ইতিহাস নিয়ে আবিদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

রাত একটা চল্লিশ মিনিটে মারা গেল ইরা কলিন্স।

একুশ

গরম আরও বেড়েছে। বৃষ্টির দেখা নেই। মার্চের ১৭। দিনটি কাটল ঘটনাবিহীন। শমিতা ঘুমিয়েছে বিকেল পর্যন্ত। রোরি দিনভর ঘুমিয়েছে, মাঝে বিকেল তিনটা ও ছ'টার সময় উঠে প্রচুর খেয়ে নিয়েছে। রনসন চলে গেছেন আগেই। গারবার ও রবার্টসন ফোন করে জানিয়েছেন, তাঁরা আজ আর আসছেন না, কাল সময় করে আসবেন। ইভ টমাস আর ইয়েন ট্যানার বেলা একটায় এসে চল্লিশ মিনিট পর চলে গেছে। ফলে আবিদের একাই কেটেছে দিনের বেশিরভাগ।

প্রথমে সে গেরস্থালী কাজ করার চেষ্টা করল, এমনকী থালা-বাসনও মেজেছে। শেষমেশ ড্রয়িংরুমে এসে বসেছে টিভির সামনে।

রাত ন'টায় বাবা-মা যখন টিভি দেখছে, রোরি তার কামরার জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল।

রেজালা খান ও জার্দানার পুত্রধন রকি খুবই স্বার্থপর স্বভাবের। তার চাইতে কম বয়সের যেসব ছেলেমেয়ে পাড়ায় আছে তাদের সবাইকে ঠেঙ্গিয়ে 'গুণ্ডা' হিসেবে নাম কিনেছে সে। এখন কারাতে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্রশিক্ষণে নিষ্ঠা ছিল, যদিও এতে করে রকি কোন মানসিক উৎকর্ষ অর্জন করেনি। অচিরেই সে 'ব্রাউন বেল্ট' পেয়ে গেল। অর্থাৎ কারাতের মারাত্মক কায়দাগুলোর বেশ কিছু

তার আয়ত্তে।

এই রকি শুক্রবার রাতে বাড়িতে আছে, এটা অস্বাভাবিক ঘটনা। নিজের মতই 'গুণী' ছেলেদের সঙ্গে চক্কর না দিয়ে সে যে ঘরে বসে রয়েছে, তার কারণ, বাবা-মা নাটক দেখতে যাবার সময় ছেলেকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বড় বোন রুখসারকে সঙ্গ দিতে রাজি করিয়েছে।

রুখসার লিভিংরুমে ব্যায়াম করছে। পরনে ব্যায়ামের পোশাক। দীঘল চুল চুড়ো করে বেঁধে ঘরের মেঝেতে যোগব্যায়াম অনুশীলন করছে। চিকন ঘাম মুখে।

চেয়ারে বসে বই পড়ছে রকি। সামনের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

'রকি,' নব্বই ডিগ্রী কোণ বরাবর পা টানটান করা অবস্থায় রুখসার বলল, 'দ্যাখ তো কে?'

'তুমি দেখ না,' বিরক্ত হয়ে বলল রকি।

'আহ্, রকি! দ্যাখ না প্লিজ!'

'দ্যাখ না! শালার খালি ঝামেলা।' বোনকে ভেংচিয়ে রাজ্যের গোস্বায় মুখ বিকৃত করে চেয়ার ছেড়ে উঠল রকি। দরজা খুলে দেখে রোরি দাঁড়িয়ে। গায়ে কোট, মাথায় হ্যাট। খান পরিবারের কেউই গত দু'সপ্তাহ রোরিকে দেখেনি। কোট আর হ্যাট না থাকলে ওরা ছেলেটির পরিবর্তন দেখে চমকে উঠত। ওর লোমশ মুখ বাইরের আলো কম বলে নজরে পড়ল না।

'কী চাস তুই, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল রকি।

'আমি রুখসার আপুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' জবাব দিল রোরি।

'যা বাড়িতে যা বলছি।' কথাটা বলেই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল উঠতি মাস্তান রকি।

রোরি এক হাতে দরজার একটি পাল্লা ধরে রাখল। দরজাটা

এক ইঞ্চির মত নড়ে থেমে গেল। 'আমি রুখসার আপুর সঙ্গে দেখা করবই।'

যোগব্যায়ামে ব্যাঘাত ঘটল রুখসারের। হাতের তালুতে ঘাম মুছে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার, রোরি? তুমি এখানে কী মনে করে?'

মুখ হাঁ করা রকির সামনে দিয়ে দরজা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল রোরি, 'তোমায় দেখতে এলাম।' মাথা থেকে হ্যাট খুলে কায়দা করে সে কাছের একটি চেয়ারে ছুঁড়ে দিল।

রুখসার ওর পাকামো দেখে বিস্মিত হলো।

'ইঁচড়ে পাকার মত কথা বলছিস! তোর মতলবটা কী? ভাল চাস তো বাড়ি চলে যা। গেট আউট!' ধমকায় রকি।

স্মিত হেসে রোরি বলল, 'চুপ!'

কারাতে কোপ মারার জন্য ডান হাতটাকে তলোয়ারের মত করে উঁচু করেছিল রকি, চট করে হাতটা ধরে ফেলল রোরি। হাত ধরে রেখেই রকিকে ও ছুঁড়ে দিল দেয়াল বরাবর। উড়ে গিয়ে পড়ল রকি পলকা ঘুড়ির মত।

ধপাস করে দেয়ালে আঘাত খেয়েই কারাতে প্রশিক্ষিত রকি লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। 'আ-আ' করে বিকট চিৎকার করে সে ডান হাতের ঘুষি চালাল রোরির মাথা বরাবর কিন্তু টার্গেট বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সরে যাওয়ায় তাল হারিয়ে রকি গিয়ে পড়ল সোফার ওপর। ভুস করে ওর বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল।

সোফার কাছে এগিয়ে গিয়ে রোরি পাকড়াও করল রকিকে। ওর বুকের কাছে শার্ট মুঠো করে ধরে বাম হাতে, ডান হাতে চড় মারতে লাগল। রকি চিৎকার করে ঘুষি এবং লাথি মারল। কোন লাভ হলো না, কারণ, রোরি দক্ষ লড়াকুর মত ঘুষি আর লাথি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। শেষে

অনেকটা যেন বিরক্ত হয়েই ঝট করে মাথার ওপরে রকিকে তুলে নিয়ে চালের বস্তার মত পনেরো ফুট দূরে ছুঁড়ে মারল রোরি। অবাঞ্ছিত এই অতিথি আসার আগে রকি যে চেয়ারে বসে বই পড়ছিল সেই চেয়ারেই পড়ল ধপাস করে। পড়তেই চেয়ারটা উল্টে গেল। ব্যথায় ককাতে লাগল রকি। লড়বার ইচ্ছা বেমালুম উবে গেছে।

'ওখানেই চুপচাপ বসে থাক্,' আদেশ করল রোরি। 'নইলে তোর দুটো ঠ্যাংই আমি ভেঙে দেব বুঝলি?' সে আবার মনোযোগ দিল রুখসারের দিকে।

চোখের সামনে যে লড়াই রুখসার দেখল তা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। হাসতে হাসতে রোরি এখন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে রুখসার। আতংক ভরা চোখে চেয়ে আছে রোরির দিকে। যেন ভয়ানক কিছু দেখছে।

রুখসার দৌড় দিল। বিদ্যুৎগতিতে ওর ডান উরু খামচে ধরে রোরি। কাপড় ভেদ করে সেখানে ঘ্যাচ করে পাঁচ আঙুলের ধারালো নখ চেপে বসায় রক্ত বেরুতে লাগল। ব্যথায় কাঁদছে মেয়েটা। রোরি ওকে টেনে এনে মেঝেতে ধাক্কা মেরে চিত করে শুইয়ে দিল।

'আমায় মেরো না। প্লিজ!' চেঁচিয়ে ওঠে রুখসার।

রোরি হি হি করে হেসে বলে, 'তা হলে ভিক্ষা চাও।'

'আমায় মেরো না,' কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করে রুখসার।

বিড়াল যেভাবে জ্যান্ত ইঁদুর কামড়ে ধরে ঝাঁকুনি দেয় তেমনি মেয়েটির চুলের মুঠিতে ঝাঁকুনি দিয়ে রোরি বলল, 'আরও জোরে বলো।'

'প্লিজ!' কান্নায় ভেঙে পড়ে রুখসার বলে, 'আমায় মেরো না, রোরি, প্লিজ!'

বাইশ

আবিদ ফোনটা কানে চেপে ধরে জোরে, 'কী বলছ তুমি?'

'...বাঁচান আমাদের...দানবের মত...কী সাংঘাতিক...জলদি...ওরে, বাপ রে...' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর অপর প্রান্তে।

'কী বলছ বুঝি না। তুমি কে?...ও, রকি? বলো...কী হয়েছে?' উঁচু গলায় জানতে চায় আবিদ।

'কী হয়েছে, আবিদ?' প্রশ্ন করল শমিতা।

'আহ্ প্লিজ!' স্ত্রীকে বাধা দিল আবিদ। রকির উদ্দেশে বলল, 'জোরে বলো, বুঝতে পারছি না!'

'জোরে বললে ও শুনতে পাবে!'

'কে শুনতে পাবে?' কৌতূহলী আবিদ।

'রোরি! ও আমাদের বাড়িতে। রুখসার আপুর ওপর চড়াও হয়েছে,' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, 'ও উন্মাদের মত যাচ্ছেতাই করছে।'

ফোন এক হাতে চেপে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকাল আবিদ। 'রোরি কি ঘুমাচ্ছে?'

'তাই তো মনে হয়। কেন?' জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'দেখ তো একটু!'

কিছুই বুঝতে না পেরে শমিতা স্বামীর কথা মত ছেলের কামরায় গেল। বাতি জ্বেলে দেখে, খাট ফাঁকা। রোরি নেই। আলমারী খোলা, মেঝেতে ওর ঘুমের পোশাক পড়ে রয়েছে।

ড্রয়িংরুমে এসে স্বামীকে শমিতা ফিসফিস করে বলল, 'ও তো ঘরে নেই।'

আবিদের মুখ কালো হয়ে গেল। রকিকে প্রশ্ন করল, 'ও এখন কোথায়?'

'আমাদের লিভিংরুমে। আমি অন্য কামরা থেকে ফোন করছি। ও আমার কনুই ভেঙে দিয়েছে, আংকেল।'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

'জলদি আসুন, আংকেল। ও আপুকে মেরে ফেলছে!'

'রক্ষে কর, আল্লাহ্।' রিসিভার রেখে দিয়ে বলল আবিদ।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল শমিতা।

'রোরি এখন খানদের বাড়িতে। রুখসারের ওপর চড়াও হয়েছে।'

'বলো কী!' আঁতকে উঠল শমিতা।

দৌড় দিল আবিদ। পায়ের ধাক্কায় একটা টুল উল্টে গেল। স্বামীর পিছু নিল শমিতা। রেজালা খানদের বাড়িতে এসে স্বামী-স্ত্রী তাদের ছেলেকে দেখার আগেই খানকন্যার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল।

রুখসার মেঝের ওপর শুয়ে আছে। নীলচে দাগ পড়েছে শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। নাকে, ঠোঁটে রক্ত। চোখ বুজে কাঁদছে, পানি গড়াচ্ছে চোখের কোল বেয়ে।

রোরি কাছেই দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে। ওদেরকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'বাবা, তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

'শাট আপ!' বলল আবিদ, 'রোরি, এ কী করেছ তুমি?'

'বেশি কিছু না,' হাসে রোরি।

বিড়বিড় করে কাঁপা গলায় রুখসার বলল, 'আমায় বাঁচান।'

পা বাড়াল আবিদ। ডাইনিং রুম থেকে উঁকি মেরে রকি দেখল, রোরি এখনও তার বোনের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

'রোরি! চলে এসো বলছি!' কড়া গলায় বলল আবিদ।

রোরি সামান্য দূরে একটা চেয়ারের দিকে সরে গেল।

'ওকে তুলে এনে সোফায় শুইয়ে দাও,' স্বামীকে বলল শমিতা।

পিঠের তলায় হাত ঢুকিয়ে যুবতী শরীর আগলানোর সময় কপালে ঘাম ফুটল আবিদের।

আস্তে করে সোফায় শুইয়ে দিতেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রুখসার। প্রবলতর হয়ে উঠল তার কান্না। মেয়েটা যে খুবই নির্যাতিত ও অপমানিত সেটা বোঝা যায় স্পষ্ট।

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকব?' জানতে চাইল আবিদ। কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

রোরি বলল, 'বড় কিছু তো ঘটেনি, এই ধরো ছড়ে গেছে কোন কোন জায়গায়। নখের দাগ লেগেছে একটু আধটু...'

শমিতার গলা শুকিয়ে গেছে। ছেলের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ওকে হতবাক করে দিয়েছে। কোনরকমে বলল, 'মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই চলো।'

'ধুত্তোরি! বলছি তো পরীক্ষা-টরিক্ষার কোন দরকার নেই,' বলল রোরি।

রোরির কথায় কান দিল না আবিদ আর শমিতা। এদিকে কামরায় ঢোকার সাহস সঞ্চয় করেছে রকি। সে রোরির দিকে সাবধানী চোখ রেখে নিজের ভীষণ ফুলে ওঠা ডান কনুই দেখাল। 'এটা ভেঙে ফেলেছে,' করুণ কণ্ঠে বলে কারাতে পাশ করা রকি, 'খুব ব্যথা করছে।'

'মিথ্যা বোলো না,' শুধরে দেয় রোরি, 'ভাঙেনি, মচকে গেছে। পানি পট্টি দিলে সেরে যাবে।'

'হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে ওকে,' বলল শমিতা, 'আচ্ছা, ওখানে ওদের কী বলব আমরা? যদি জিজ্ঞেস করে, কেমন করে এমন হলো?'

'বলবে সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে গিয়েছিল,' হাসে রোরি।

'খোদা, আমি জানি না।' হতাশ কণ্ঠ আবিদের।

রকি বলল, 'আমি হাসপাতালের লোকদের বলব এই দানবটা আমাদের বাড়িতে জোর করে ঢুকে এই কাণ্ড করেছে।'

রোরি এক পলকের জন্য রকির দিকে তাকাল। অমনি 'ঠুস' শব্দে রকির হাতঘড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

'ওরে, বাবারে,' বলে চিৎকার দিয়েই মার খাওয়া জানোয়ারের মত আবিদের পেছনে গিয়ে লুকাল রকি।

'স্টপ ইট, রোরি!' হুকুম করে আবিদ। 'তুমি ছেলেটাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। এসব বন্ধ কর।'

'ঠিক আছে। বন্ধ করলাম।' হাসে ওয়্যারউলফ।

শমিতা দাঁড় করাল রুখসারকে। দরজার দিকে এগোল। হঠাৎ তার চোখে গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল। রেজালা খান ও তার স্ত্রী জার্দানা নাটক দেখে ফিরছে।

বিহ্বল চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে শমিতা বলল, 'কী বলব ওদের?'

রোরি চেয়ারেই বসে আছে। রুখসার যন্ত্রবৎ দাঁড়িয়ে। ফোলা কনুইতে হাত বুলাচ্ছে রকি।

'বলবে যে, ওরা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে গেছে,' পরামর্শ দিল রোরি।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় চলে এল রেজালা। জার্দানাকে বলল, 'এর নাম আধুনিক নাটক? যত্তোসব গাঁজাখুরি কারবার। পয়সাগুলো পানিতে গেল!' হাঁটতে থাকে স্বামী-স্ত্রী।

'এত খেপে যাচ্ছ কেন?' বলল জার্দানা, 'নাটকের শুরু থেকে দেখনি বলেই বুঝতে পারনি। আমার কাছে তো কঠিন বা দুর্বোধ্য মনে হয়নি।'

'দেখ, তোমার পণ্ডিতগিরি আর ফলিয়ো না।' হুংকার দিল

রেজালা, 'কোন্ কচু বুঝেছ, শুনি?'

'আহ-হা, আস্তে বলো না। এত রাতে পাড়া মাথায় তুলবে নাকি?'

দোরগোড়ায় পৌঁছাল ওরা।

'রকি! দরজা খোলা রেখে কী করছ তোমরা?' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রেজালা, ঘরে লোকজন দেখে থেমে গেল। 'আরে আবিদ সাহেব এবং শমিতা ভাবীও আছেন দেখছি? তা, কী মনে করে পায়ের ধুলো দিতে এলেন?'

'ইয়ে মানে...এই... তোতলাল আবিদ, 'একটা গোলমাল...

রুখসার ধীর পায়ে স্বপ্নাতুরের মত হেঁটে এল তার মায়ের কাছে। তাকে জড়িয়ে ধরল। মেয়ের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠল জার্দানা। 'সোনা আমার!' মেয়েকে জড়িয়ে ধরল সে। 'ওরা তোমার কী করেছে?'

গর্জে ওঠে রেজালা খান, 'আপনারা এতক্ষণ এখানে কোন্ নষ্টামি করেছেন, মি. হাসান? এসব কী?'

'আব্বু, ওই হারামী, হারামীটা!' গলা ফাটাল রকি। 'হারামীটা আমাদেরকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমার হাত ভেঙে দিয়েছে।'

বিরক্ত হয়ে রোরি বলল, 'অ্যাই, তুই থামবি?'

রকি ভয়ে চুপ করে গেল।

'রেজালা, সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল আবিদ। 'রোরি...

রোরির ওপর চোখ গেল রেজালা খানের। চোখ ছানাবড়া করে বলল, 'ওর গায়ের পশম এরকম কেন? এত বড় হয়ে গেছে! অদ্ভুত তো!'

'রেজালা!' বলল জার্দানা, 'ওসব থাক, রুখসারের কী করবে সেটাই ভাবো।'

'রুখসার আর রকিকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি,' বলল শমিতা। 'পরে সব খুলে বলব।'

'পরে!' হুংকার ছাড়ল রেজালা খান। 'পরে কেন? আমার মেয়েকে মেরে তক্তা বানানো হয়েছে, ছেলে কাঁদছে বাচ্চাদের মত, আর এর ব্যাখ্যা দেবেন পরে?'

'শান্ত হোন, মি. খান,' অনুনয় করল আবিদ। 'রোরি অসুস্থ। ও জানে না কী করছে...

'রোরি...করেছে?'

'হ্যাঁ করেছি। করতে হয়েছিল আর কী।' বলল রোরি।

'ও রুখসার আর রকিকে পিটিয়েছে?'

'হ্যাঁ, পিটিয়েছি। পেটাতে বাধ্য হয়েছি!' বলে রোরি।

'ও আমার কনুই ভেঙে দিয়েছে, আব্বু,' ফিসফিসিয়ে বলে রকি।

'ইয়াল্লা!' চমকে ওঠে রেজালা খান। 'জার্দানা, আমার রিভলবার কোথায়?'

'মি. খান!' খেঁকিয়ে উঠল আবিদ। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। রিভলবার মানে, কী করতে চান আপনি? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী বলছেন পাগলের মত?'

'আমি পাগল? না আপনারা? একটা জানোয়ার দরজা ভেঙে আমার বাড়িতে ঢুকেছে, আমি চুপ করে থাকব?'

'জোর করে ঢুকিনি,' শুধরে দেয় রোরি, 'আমি নক করেছি, আপনার আদুরে ছেলে এসে দরজা খুলে দিয়েছে।'

'ঢুকে আমার ছেলেমেয়েকে মেরেছিস। তোকে এরপরও আমি আস্ত রাখব?' চোখ পাকিয়ে এগোয় রেজালা খান। যেন খালি হাতেই হামলে পড়বে রোরির ওপর। সামনে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল আবিদ। রেজালা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে বুঝল, এই লোকটার সঙ্গে মারামারি করে পারবে না।

আবিদ রেজালাকে বলল, 'আপনি কী বলবেন পুলিশকে? আট বছরের একটা ছেলে আপনার বিশ বছরের মেয়েকে মেরেছে বলে

ওকে গুলি করেছেন? বলবেন যে, আপনার কারাতে পাশ করা, বেল্ট পাওয়া ছেলেকে পিটিয়েছে এইটুকুন বাচ্চা ছেলে?'

'আমি—আমি, মানে আমাকে তো কিছু একটা করতেই হবে!' রেজালা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'রুখসারকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই?' জার্দানা বলে।

'আমাকেও!' বলল রকি। 'আমার কনুই...

'মচকে গেছে,' বাক্যটা সম্পূর্ণ করল রোরি।

রেজালা রাগ সামলে নিয়ে বলল, 'মেয়েকে আমরা ডা. মেলনের কাছে নিয়ে যাব। সে সবকথা গোপন রাখবে। কিন্তু মি. হাসান, আপনাদের এই ছেলেকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখুন, নইলে খোদার কসম, বিপদে পড়বেন।'

'ওই দুটো অসহায় ছেলেমেয়ের সঙ্গে অমন করা উচিত হয়েছে তোর?' বাড়িতে এসে ছেলেকে প্রশ্ন করে আবিদ।

রোরি নিজের খাটে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমায় তো বলেছি, বাবা। আমায় কাজটা করতে হয়েছে। কুয়ার মধ্যে যারা আছে, তাদের সবাই এমন কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তোমাকে বলেছিলাম না আমি কিছুদিনের মধ্যে মেণ্টালি এবং ফিজিকালি সম্পূর্ণ বদলে যাব? সেই পরিবর্তনের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন চলে এসেছি আমি। আমার চেহারা আট বছরের শিশুর মত দেখাতে পারে কিন্তু আমার মেণ্টাল গ্রোথ এখন আঠারো বছরের যুবকের মত। শুধু তা-ই না, মেয়েদের প্রতি সহিংস আচরণ এই পরিবর্তনেরই একটা অংশ। তোমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু হাইব্রিড ওয়্যারউলফদের কাছে এগুলো খুবই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু রকিকে মারলি কেন তুই?'

'ওই ছোঁড়াটা বদমাশের ঝাড়। ওকে আমার একটুও সহ্য হয়

না, বাবা। অনেক দিন থেকেই ওর উপরে রাগ ছিল আমার। আজকে সুযোগ পেয়ে হাতের সুখ মিটিয়ে নিয়েছি।'

আবিদ নিশ্চুপ।

রোরি বলে চলেছে, 'মাথায় যখন রক্ত উঠে যায়, তখন নিজেকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বলো, বাবা, এটা কি আমার দোষ? তা ছাড়া কি জানো, বাবা, রুখসার আপুর বেলেল্লাপনাও আমার সহ্য হচ্ছিল না। বিশেষ করে তোমার সঙ্গে ও ফ্লার্ট করার চেষ্টা করত দেখে আমার রাগ লাগত। তাই রুখসার আপুকে একটু চমকে দিতে চেয়েছিলাম।'

রোরির বক্তব্য শুনে এমন হতভম্ব হয়ে পড়ল আবিদ যে মুখে আর কথাই জোগাল না।

তেইশ

'তুমি আবার ওখানে যাচ্ছ?' কাপে কফি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলেন অ্যালিস।

রবার্টসন বললেন, 'তা হলে বুঝতেই পেরেছ মি. হাসানের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম।'

'আমি জানতে চাইছি, কেন যাবে?'

'ওরা আমার সাহায্য চায়, তাই,' একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন রবার্টসন।

'তুমি কল করলেই ছুটে যাবার মত ডাক্তার নও। হাসপাতালই

তোমার ধ্যান-জ্ঞান। অথচ ওই মহিলা, শমিতা হাসান, ডাকলেই উতলা হয়ে ছুটতে থাকো। ওর ছেলে অসুস্থই যদি হবে তা হলে হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেই হয়।'

'মাই গড!' আফসোস করেন রবার্টসন, 'তুমি এত বছরে একটুও বদলাওনি। আমার মেয়ের বয়সী ওই মহিলাকে সন্দেহ করতে পারলে? ওকে ভয় পাচ্ছ?'

'ওকে নয়, তোমার অবস্থাকে ভয় পাচ্ছি। এ ক'সপ্তাহে তোমার ওজন কত কমে গেছে খেয়াল করেছ?'

'বিশ পাউণ্ড,' স্বীকার করলেন রবার্টসন, 'এ বয়সে ওজন কমলে তো উপকারই হয়।'

'কিন্তু দুশ্চিন্তা?' বললেন অ্যালিস, 'তোমার চেহারা কেমন হয়ে গেছে।'

'ওদের ছেলের জন্যই আমার দুশ্চিন্তা। এতদিন হয়ে গেল, ছেলেটার জন্য কিছু করতে পারছি না। শমিতাকে যদি দেখতে, অমন প্রাণবন্ত মেয়েটা কেমন মিইয়ে গেছে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ঘুম নেই। নাওয়া-খাওয়া নেই।'

'সেজন্য তুমিও বরবাদ হতে চাও?'

কোন জবাব দিলেন না রবার্টসন। হেরে যাবার ভয় পাচ্ছেন তিনি। না, ভয়কে তিনি ঘৃণা করেন। অথচ, জীবনে এই প্রথম তাঁকে ভয়ের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। হেরে যাবার ভয়। আট বছরের একটা ছেলের মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়তে পারছেন না তিনি।

'ওদের ওখানে তুমি আর যেয়ো না, ভিনসেণ্ট!' মিনতি করেন অ্যালিস।

স্ত্রীর দিকে তাকান রবার্টসন। আবার মনোযোগ দেন কফির পেয়ালায়।

আবিদ হাসানকে বহুকাল নিদ্রা-স্নানবিহীন সৈনিকের মত দেখাচ্ছিল। চোখের নীচে কালি। রবার্টসনকে ঘরে নিয়ে বসাল সে। ঘরে আলো জ্বলছে, পরিবেশটা থমথমে। সোফায় ঘুমাচ্ছে শমিতা।

'রোরি?' জানতে চাইলেন রবার্টসন, একটি শব্দেই যেন ধ্বনিত হলো হাজারটা জিজ্ঞাসা।

'ওর কামরায় ঘুমাচ্ছে। ঘুমালেই স্বস্তি পাই। জেগে উঠলে কী করে বসে কে জানে!'

'আপনার পড়শী রেজালা খান কি আর ঝামেলা করেছে?'

'না। তবে, তার মেয়ে রুখসারকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। সব পড়শীকেই বোধহয় নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে হবে। নয়তো রোরিকে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে।'

'ওরকম ভাবছেন কেন? একটা পরিবর্তন ঘটবে ওর। হয়তো শিগ্‌গিরই সে শান্ত সুবোধ হয়ে যাবে।'

'ডাক্তার! আমি কী করব বুঝতে পারছি না। ওর কথাবার্তায় বিকার এসে গেছে। আমি ভাবতেই পারি না একটা ধাড়ি মেয়েকে সে ওরকম জখম করতে পারে।'

'এতে আশ্চর্যের কী আছে? সে যে কুয়ার কথা বলে, সেটার কথা চিন্তা করুন। ওখানকার হাজার হাজার মানুষের স্মৃতির সঙ্গে তার মানসলোক সংযুক্ত হয়ে ওকে অন্যরকম বানিয়ে ফেলেছে। এর প্রভাব সাময়িক নয়, এটা তো আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না।'

'কিন্তু ডাক্তার, ও যে হিংস্র হয়ে যাচ্ছে। ওর চাইতে ছ'বছরের বড় মাস্তান টাইপের একটা ছেলেকে পিটুনি দিল অথচ তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না।'

'তা হলে ওকে আমার হাসপাতালে ভর্তি করে দিন।'

'আপনার ওখানে তো সব পাগলের ছড়াছড়ি। না, ডাক্তার,

ছেলেকে ওখানে দিতে পারব না আমি।'

'আবিদ সাহেব, আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, কোন অনাদর হবে না। রোরিকে আমি সারাক্ষণ নজরে রাখব।'

'তা হয় না, ডাক্তার। আপনি ঘরে যখন ঘুমাতে যাবেন, তখন? তখন যে সে গতরাতের মত কাণ্ড বাধিয়ে বসবে না তার গ্যারান্টি কী?'

রবার্টসনের মুখে চিন্তার রেখা ফুটল। দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'কাজটা আমি ভাল মনে করছি না। তবু আপনারা যখন চাইছেন, করুন। তবে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হবে। রোরিকে যে আলাদা ঘরে নিয়ে আটকানো হচ্ছে সে যেন একটুও বুঝতে না পারে। বুঝে ফেললে ও ধরে নেবে যে ওর প্রতি আপনাদের কোন মমতা নেই। ও ভাববে বাবা-মা ওকে ভয় করে, নতুবা ঘৃণা।'

'ঠিকই বলেছেন, ডাক্তার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবিদ, 'রোরিকে ভয় নয়, রোরির জন্য ভয়।'

পরদিন বেলা দুটোর পর নীচতলার কামরা থেকে রোরির খাট ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরানো শুরু হলো। রবার্টসন সব দেখছিলেন। উনি এসেছেন শমিতাকে সান্ত্বনা দিতে। ছেলের দৈহিক পরিবর্তন এবং রুখসারের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ বেচারীকে ঘাবড়ে দিয়েছে খুব।

ঘুম থেকে রোরি উঠেছিল বেলা বারোটার দিকে। ঠিক তখনই ড. রনসন এলেন। আবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ঠিক হলো, দোতলার কোনার দিকের কামরায়, যেখানে অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রাখা আছে, সেটি রোরির নতুন বেডরুম হবে।

আবিদ ছেলেকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, 'তোর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখার জন্য বাইরের লোকেরা নীচতলায় ভিড়

করতে পারে। তাই প্রাইভেসি বজায় রাখার জন্য তোর বেডরুম আমরা ওপরতলায় নিয়ে যাচ্ছি।'

রোরি চুপচাপ শুনে গেল। মুচকি হাসল শুধু। রনসন আর আবিদ মালপত্র ওপরতলায় তুলতে গিয়ে যখন বেজায় ক্লান্ত তখন সে সিঁড়ির ওপর বসে সব দেখছিল। সে বলল, 'তোমরা দু'জন এত ঘামছ। আমি তো চটজলদি সব মালপত্র ওপরে নিয়ে যেতে পারতাম। একটুও টায়ার্ড হতাম না!'

আবিদ জোর করে হাসল। ছেলের প্রচণ্ড শক্তির কথা শুধু যে তার জানা, তা-ই নয়, ওই শক্তির ভয়াবহতাও সে দেখেছে রেজালা খানের বাড়িতে।

খাট পাতা হলো দোতলায়। অন্যান্য জিনিসপত্রও ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখা শেষ। সুদৃশ্য বেডশীট পেতে বিছানা তৈরি করছে শমিতা। রোরি চুপচাপ বসে আছে সিঁড়িতে। স্টিফেন রনসন আর আবিদ নীচতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হঠাৎ হো হো হাসতে শুরু করল রোরি।

রনসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, রোরি, হাসছ কেন?'

'সব ব্যবস্থা নিখুঁত।' হাসতে হাসতে জবাব দিল রোরি, 'আর তোমাদের ভয় নেই, না? খাঁচায় বন্দি হবে জানোয়ার।'

চব্বিশ

বাস্তবতা উপেক্ষা করার জন্য তৈরি হলো শমিতা। বাইরের কাজ

নিয়ে ব্যস্ত থাকতে শুরু করল সে। *যতক্ষণ বাইরে থাকব ততক্ষণ ঘরের সমস্যা আমায় স্পর্শ করতে পারবে না*, নিজেকেই বলে সে। রোরিকে দোতলার ঘরে রাখার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ওখানে তার কামরার জানালায় মোটা লোহার গ্রিল আছে, রাতে ও ঘুমাতে গেলে বাইরে জানালার কাঠের দরজায় খিল এঁটে দেয়া হয়। *খোদা! ওকে তুমি আর ঘরের বাইরে টেনে নিয়ো না। জানালা ভাঙার শক্তি দিয়ো না।*

তবু দুশ্চিন্তা শমিতাকে ছাড়ে না। এমনকী পাড়ার স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনে, যেখানে এতদিন শুধু নিয়মিত চাঁদা দিয়েই সে কর্তব্য পালন করে এসেছে, সপ্তাহান্তের কমিটি সভায় বক্তৃতা দেবার সময়ও শমিতার চোখে ভেসে ওঠে ছেলের ক্রমপরিবর্তনশীল অবয়ব। ছেলের নাক ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, নাসারন্ধ্র স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ও মনে মনে প্রার্থনা করে, *খোদা! তুমিই ওকে জুটিয়ে দিয়েছ, তুমিই ওকে বদলে ফেলছ, কিন্তু, আর না, খোদা। এবার বন্ধ করো।*

রবার্টসন, গারবার, রনসন এঁরা আমার ছেলের জন্য কী-ইবা করলেন? ভাবে শমিতা। কেবল একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা ছাড়া তিনজন বিশেষজ্ঞ আর কিছুই তো করতে পারলেন না। তা হলে তাঁরা কি আমার আর আবিদের মত অসহায় দর্শক হয়েই থাকবেন? আর ইয়েন ট্যানার?

ইয়েনের কথা মনে পড়তেই জ্বলে উঠল শমিতা। এ লোকটাই তো আমার যাবতীয় সমস্যার কারণ, তাঁর কথার পরই একে একে ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল। আচ্ছা, ওঁকে দুষছি কেন? একজন পণ্ডিত তাঁর অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে মন্তব্য করেছেন, তিনি মন্তব্য না করলেও তো রোরির যে পরিবর্তন ঘটছে তা ঘটতই। ইয়েনের ওপর ক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য নিজেকে তিরস্কার করল শমিতা।

সেদিন বিকেল পাঁচটায় ঘরে ফিরল ও। ছেলের সঙ্গে খোশগল্প

করতে লাগল। ড্রয়িংরুমের সোফার ওপর লাফালাফি করতে করতে মায়ের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল রোরি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইয়েন ট্যানার এলেন। বললেন, রোরির সঙ্গে আলাপ করার জন্য সন্ধে সাতটায় তিনি আবার আসবেন।

ইয়েন চলে যাবার পর দেয়ালের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রোরি। শমিতা পেছন থেকে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল। ওর গলার পেছনের চুলে হাত বুলিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ, সোনা আমার?'

'কিচ্ছু না। এমনিই আয়না দেখছি,' জবাব দিল রোরি।

'কী দেখছ আয়নায়?'

'আমার চেহারা,' বলল ছেলেটা।

শমিতা আদর করে দু'হাতের তালু ছোঁয়ায় রোরির দু'গালে। ওর গাল লোমশ, আবিদ দু'সপ্তাহ দাড়ি না কামালে যেরকম খসখসে লাগে সেরকম। শমিতা বলল, 'এদিকে ফেরো। মুখে ব্যথা লাগছে?'

'না, আমার মুখে আর ব্যথা লাগে না,' রোরি তার মায়ের দিকে ফিরল। দু'ঠোঁট চেপে রেখে মিটমিট করে হাসতে থাকে।

'এই ছেলে, দুষ্টুমি করে না। খোল মুখ!' বলে শমিতা। রোরি মুখ বুজে রেখেই মাথা নাড়ে।

'মা'র কথা শুনতে হয় বুঝলে!' হাসতে হাসতে বলে শমিতা, 'দাঁত পড়ে যাবার পর তোমার মুখে যে ফাঁক হয়েছে আমি তা দেখব।' তবু রোরি মাথা নাড়ে।

'রোরি হাসান। তুমি এবার মার খাবে বলছি।' কপট রাগ দেখায় শমিতা। ছেলের চেপে রাখা দু'ঠোঁটের মাঝ দিয়ে আঙুল ঢোকাতে চাইল সে। রোরি আঙুল ঢোকাতে দিতে নারাজ। সে ছটফট করছে। অবশেষে শমিতা কাতুকুতু দিলে হো হো করে হাসতে লাগল।

শমিতাও হাসছে। হঠাৎ তার হাসি থেমে গিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। একটা অজানা ভয়ে মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল।

রোরির মুখে ঝকমক করছে সদ্য ওঠা আটটি দাঁত। প্রতিটি দাঁত সুচালো এবং ধারালো। ওয়্যারউলফের দাঁতের মত।

পঁচিশ

হোটেলের কামরায় এসে ইয়েন ট্যানার তাঁর ফাইলপত্র আবার ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। আজ সন্ধ্যায় রোরির সঙ্গে তার শেষবারের মত কথা হবে। কিন্তু ইভ টমাস তো রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা মারে বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে। আর রোববারে তার আড্ডার কোন সীমা নেই। রোরির ছবি ফিল্ম করার উপায় কী তা হলে! চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। আজ যে রোববার। বিকেল ছ'টা বেজে দশ মিনিট। ইভ এখন কোথায়!

ইভের বাড়িতে খোঁজ নিতে তিনি টেলিফোন করার জন্য রিসিভার তুলতে যাচ্ছেন, নজরে পড়ল নোটপ্যাডের ওপর। রোরির সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ের টেপ রেকর্ড থেকে এগুলো তিনি লিখে রেখেছেন। যে প্রবন্ধ তিনি লিখতে শুরু করেছেন, তাতে সংলাপ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো খুবই জরুরি।

আগামী মাসে জাপানে তিনি একটি সেমিনারে এই প্রবন্ধ পড়ে সারা দুনিয়াকে চমকে দিতে চান। মানবজাতির উৎস, বিকাশের ধারা এবং বিবর্তনের ওপর এতকাল ট্যানার যে গবেষণা করে

আসছেন রোরির সাক্ষাৎ পাবার পর সেসব গবেষণা তাঁর নিরর্থক মনে হচ্ছে।

নোটপ্যাডের প্রায় শতাধিক পাতা ইয়েন এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব থেকে মাত্র চারটি পাতার লেখা এখনও প্রবন্ধভুক্ত করা হয়নি।

এই চারটি পাতা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। একটি পাতার লেখা পড়লেন অন্তত পাঁচবার। তাঁর শরীর ফুটে ঘাম বেরুতে লাগল। আবার নোট পড়তে লাগলেন তিনি–

ইয়েন: তোমরা হাইব্রিড ওয়্যারউলফরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে যদি অতই শক্ত-সমর্থ হবে, তা হলে ইতিহাসে তোমাদের একটা তাৎপর্যময় ভূমিকা থাকার কথা। সেটা হলো না কেন?

রোরি: একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা সংখ্যায় বেশি হলে তবেই সম্মিলিত ভূমিকা নিতে পারে। পিওর ব্লাডরা মানুষকে বিয়ে করতে আগ্রহী, ফলে হাইব্রিডের সংখ্যা কখনোই বাড়তে পারেনি। মানুষ আর ওয়্যারউলফের যেসব বিয়ে হয় সেসব দম্পতি বিভিন্ন কৌশলে সন্তানদের কাছে নিজেদের সত্য পরিচয় লুকিয়ে রাখে, যেমন আমাকে 'মন্ত্র' দিয়ে সুপ্ত করে রাখা হয়েছিল। এর ফলে শতকরা নব্বই ভাগ ওয়্যারউলফ নিজেদেরকে মানুষ ছাড়া আর কিছুই কখনও ভাবেনি। ওয়্যারউলফদের কেউ কোন কারণে তার সত্যিকারের পরিচয় জেনে গেলে সমাজের লোকেরা সাধারণত তাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ বলে দূরে সরিয়ে রাখে, কখনও আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেয় না। এভাবে তিল তিল করে ওদের বিনাশ ঘটিয়ে দেয়া হয়।

ইয়েন: বিনাশ?

রোরি: খুন, মি. ইয়েন, খুন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা। হত্যার

দায়ে কারও বিচার হয় না। মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করা হয় না। আমরা ওয়্যারউলফরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিরে এলে অনেক মৃত্যু ঘটবে। তবে ওসব মৃত্যু আমাদের হবে না।

'মাই গড!' বিড়বিড় করেন ইয়েন। 'ওয়্যারউলফরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবজাতির ওপর হামলে পড়বে! তা হলে তো দুনিয়ায় মানুষ বলতে কেউই থাকবে না। এর প্রতিকার কী? সব ওয়্যারউলফকে সনাক্ত করাও তো কঠিন। আমি, আমি তো সারাজীবন গবেষণার পর মাত্র একজনকে সনাক্ত করতে পেরেছি...

ক্রিং। ক্রিং। ক্রিং। চিন্তায় ছেদ পড়ল ইয়েনের। বেশ কিছুক্ষণ রিং হবার পর তিনি রিসিভার তুললেন। ফোন করেছে ইভ।

'ইভ, আজ আর তোমার আসার দরকার নেই। রোরির সঙ্গে আজ আর কোন সেশন করব না।'

'কেন করবেন না, মি. ট্যানার? রাগ করেছেন? দেখুন, এক বন্ধু বাড়ি এসে ধরেছে ওর সঙ্গে আউটিং-এ যেতে। ভদ্রতায় বাধল, মুখের ওপর না করতে পারলাম না। নইলে আমি অনেক আগেই...'

'অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছ, মিস টমাস! আমার হাতে আরও দু'দিন সময় আছে। এখন ঘরে বসে প্রবন্ধটা শেষ করতে চাই। কাল তোমার সাথে আবার কথা বলব, ইভ। আজ তা হলে রাখি!'

ইভ একটু দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'ওহ! আচ্ছা, গুডবাই।'

ইয়েন রিসিভার রেখে দিলেন। তিনি জানেন, তাঁকে কী করতে হবে।

'অতীন্দ্রিয়?' রোরি প্রশ্ন করে, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। খুলে বলবেন?'

ড. স্টিফেন রনসন কথা বলছিলেন রোরির নতুন বেডরুমে বসে। তিনি কামরায় একা। দরজা খোলা। হাসান দম্পতি আর ড.

রনসন যতক্ষণ জেগে থাকেন, খোলাই রাখা হয়। যখন তাঁরা ঘুমোতে যান তখনই দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে ছিটকিনি আটকিয়ে দেন।

'গূঢ় বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এটা হলো মানুষের জীবনের একটা অতিপ্রাকৃত দিক,' বললেন রনসন।

'আপনার কি ধারণা, আমার মধ্যে সেরকম একটা কিছু আছে?' কামরায় এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে পায়চারি করছে রোরি।

'না, তুমি সেরকম...মানে তুমি হলে যাকে বলে...'

'আমি অমানুষ? অর্ধ-মানব? বিবর্তনশীল দানব?' সে বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা একটা মোটা কাঠের টুকরো তুলে নিল মেঝে থেকে। মাথা বরাবর কাঠের টুকরো দু'হাতে ধরে জোরে চাপ দিতেই টাশশ্ শব্দে দু'টুকরো হয়ে গেল ওটা। 'আপনি কি মনে করেন এটা অতীন্দ্রিয়?'

রনসন বিস্ময়ে কেঁপে উঠলেও তা প্রকাশ করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'না, এটা অতীন্দ্রিয় বিষয় নয়। আচ্ছা, কাঁচ ভাঙার ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'টেলিকাইনেসিস। বিজ্ঞানীরা এ নামই দিয়েছেন,' বলল রোরি। 'হাইব্রিড ওয়্যারউলফ আর মানুষের মিলন থেকে যে সন্তান হয় তাদের মানসিক শক্তি প্রবলতর হয় দিনদিন। আমার যেমন হচ্ছে। তা হলে একটা কাহিনি বলি।'

'বলো শুনি,' রনসন তাঁর চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন রুমাল দিয়ে।

'এই আমেরিকায় মেরি জেন ফানশের নামে এক যুবতী ১৮৬৬ সালে অসুখে পড়েছিল। এ সময়ে কয়েকবার সে অন্ধ হয়েছে, বধির হয়েছে, পক্ষাঘাত রোগে ভুগেছে। চিকিৎসায় কোন উপকার পায়নি। অথচ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বিস্ময়কর ক্ষমতা পেয়ে যায়।

‘এই ক্ষমতা দিয়ে সে ভবিষ্যদ্বাণী করত, যা ঘটবে বলত তা-ই ঘটত। মানুষের চেহারা দেখে বলে দিতে পারত, কার কী হয়েছে। এমনকী কে কী ভাবছে তাও বলত নির্ভুল। খামে-ভরা চিঠি স্পর্শ না করে গড়গড় করে পড়ে ফেলত।’

‘এই মেয়ে আসলে ছিল...

রোরি মাথা দুলিয়ে হাসল, ‘ঠিকই ধরেছেন। মেয়েটা ছিল চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ, এক ভাগ অমানুষ। এরকম অনেকের কাহিনি আমি জানি। আরে, মি. ট্যানার যে!’

দরজার দিকে তাকালেন রনসন। ট্যানার বললেন, ‘গুড ইভনিং, রোরি, ডক্টর রনসন। আমি মি. অ্যাণ্ড মিসেস হাসানের সঙ্গে কথা বলে ওপরে এলাম। তাঁরা আমাকে এখানে আসতে বললেন।’

ছাব্বিশ

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন ট্যানার, টেপ রেকর্ডার এবং একটি ফ্লাস্ক রাখলেন রোরির খাটে।

‘তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, রোরি।’

‘প্রশ্ন করুন, উত্তর দিতে থাকি। কোন অসুবিধে নেই।’

রনসনের দিকে তাকিয়ে ট্যানার বললেন, ‘যদি কিছু মনে না করেন, আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।’

রনসন চলে গেলে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ইয়েন ট্যানার খাটে

বসলেন। 'তোমার সঙ্গে খুব সিরিয়াস কথা আছে,' বললেন তিনি, তবে অন্যান্য দিনের মত টেপ রেকর্ডার চালু করলেন না।

'আপনি তো সবসময়ই সিরিয়াস। বলুন, কী জানতে চান!' রসিকতা করে রোরি।

'তোমরা কি মানুষকে ঘৃণা করো?'

'কোন্ মানুষকে? ঘৃণা করার তো নানান কারণ থাকতে পারে।'

'বলছি তোমরা হাইব্রিড ওয়্যারউলফরা মানবজাতিকে কি ঘৃণা করো?'

'না। আপনারা অবশ্য অনেকেই আমাদেরকে ঘৃণা করেন। এমনিতেই এটা বোঝা যায়।'

ভ্রু কুঁচকে গেল ইয়েনের। 'মানুষকে কি তুমি হত্যা করবে?'

এক সেকেণ্ডের জন্য রোরির চোখে ঝলসে উঠল আগুন, 'প্রয়োজন হলে, পরিস্থিতি বাধ্য করলে তো করবই। আপনি করবেন না?'

রোরির প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে ইয়েন বলতে লাগলেন, 'মানবজাতির বিরুদ্ধে হাইব্রিড বিদ্রোহে তুমি কি নেতৃত্ব দেবে?'

রোরি হাসে, 'আপনি এতক্ষণে আসল বিষয়ে এসেছেন। ভয় পাচ্ছেন ওয়্যারউলফদেরকে। অবহেলিত আর নির্যাতিতদের শক্তিকে ভয়।'

'তুমি কি নেতৃত্ব দেবে?'

'অসহায় নারী আর শিশুদের মনে ভয় ধরানোর জন্য ওয়্যারউলফরা বিপ্লব করবে না। তারা বিপ্লব করবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।'

'আমরা তোমাদেরকে খতম করে দেব।'

এবার রোরির মুখে বিদ্রূপের হাসি, 'কখনোই ধরতে পারবেন না আমাদেরকে। কারণ আপনারা অন্ধ, ইচ্ছে করেই অন্ধ। হাজার হাজার বছর ধরেই আমরা আছি মানুষের ভেতর। গুহায় আছি,

বন-জঙ্গলেও আছি। আমরা বরাবরই শক্তিমান, বুদ্ধিমান, কখনোই নেতা হতে পারিনি। মানুষের আগ্রাসনের কারণে এই পৃথিবীতে আমাদের দখলদারি কায়েম হতে পারেনি।'

'সে সুযোগ তোমরা পাবে না।'

'জানোয়ার আমরা তাই? আপনারা তো আমাদের সবসময়ই শিকার করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে নিরাপদ ভেবেছেন নিজেদেরকে–'

'শাট আপ!' গর্জে ওঠেন ইয়েন।

'ইয়েন, আমরা সবখানেই আছি। আপনি, মি. ইয়েন ট্যানার, আপনার মধ্যে যে আমরা নেই হলফ করে বলতে পারেন? আপনি যে মানুষ, সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?'

'শাট আপ!' আবারও ধমক দিলেন ইয়েন। চোখের পলকে ছোঁ মেরে ফ্লাস্কটি তুলে নিলেন। দ্রুত খুললেন ঢাকনি। দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাকে মরতে হবে। মানবজাতির খাতিরে তোমাকে মরতে হবে।'

ফ্লাস্কটি উপুড় করলেন তিনি। ভেতরের পেট্রোল ঢেলে দিলেন রোরির জামাকাপড়ে। তারপর চোখের পলকে সিগারেটের লাইটার ধরিয়ে ছুঁড়ে দিলেন রোরির গায়ে। ভয়ঙ্কর চিৎকার দিল রোরি।

দোতলায় আবিদ ও শমিতা তাদের ছেলের তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠল। দেয়ালের কাঁচ এবং টিভির পর্দা বিস্ফোরিত হয়ে নীল ধোঁয়া বেরুতে লাগল। ওপরতলায় ছুটল তারা।

রনসনও চিৎকার শুনেছেন। তাঁর চোখের চশমার কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে। তিনিও ছুটলেন ওপরতলায়। সিঁড়িতে দেখা হলো হাসান দম্পতির সঙ্গে, তিনজনেই নির্বাক।

জামায় আগুন ধরার সঙ্গে সঙ্গে রোরি লাফিয়ে উঠল দশ ফুট উঁচুতে। পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকল ও। আগুনের তেজ কমাতে পারছে না। ওদিকে বদ্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে তিনজন। অবিরাম ধাক্কা। দরজা খুলছে না। ভেতরে কী ঘটছে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'কী হলো, দরজা খুলুন, ইয়েন। রোরি, দরজা খোলো,' রনসন, আবিদ আর শমিতা সমস্বরে বলছে আর দরজায় ধাক্কা মারছে। ভেতরে, হঠাৎ করে মেঝে থেকে তীরের বেগে লাফ মেরে খাটে উঠে পড়ল রোরি। কম্বল আর চাদর দিয়ে মোড়াল শরীর। খাটের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। সেই সঙ্গে চলছে চিৎকার। আগুন তেজ হারাতে থাকে।

দরজায় ঘা পড়ছে অবিরাম।

রোরি উঠে বসল বিছানায়। ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন প্রাণিবিজ্ঞানী ট্যানার। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার তিনি কী করবেন? রোরি তাকাল ইয়েনের দিকে। ভয়ঙ্কর ক্রূর দৃষ্টি।

'ডিয়ার গড!' মনে মনে প্রার্থনা করেন ইয়েন।

'এমন করা উচিত হয়নি তোমার, ট্যানার।' রোরি কম্বল সরাল শরীর থেকে। ওর বুকের বাম দিক ঝলসে গেছে। বলল, 'সাংঘাতিক বোকামি করেছ, মহাপণ্ডিত।'

হতবাক ইয়েন নড়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন। আসন্ন বিপদ আঁচ করে তিনি দৌড় মারলেন। কিন্তু দরজা থেকে পাঁচ ফুট দূরে থাকতেই ধপাস করে পড়ে গেলেন। রোরি তার মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণকারীকে ধরে ফেলেছে। ইয়েন উঠে বসলেন। তাকালেন রোরির দিকে। খাটে বসেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানছে ও।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দু'হাত দিয়ে মাথার দু'পাশ চেপে ধরে ইয়েন বললেন, 'যীশুর দোহাই! প্লিজ! রোরি, স্টপ ইট!' মনে হচ্ছে মগজের মধ্যে সুই ফোটাচ্ছে কেউ।

তিনি যন্ত্রণা কমানোর জন্য বারবার নিজের মাথা নিজেই মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন। জবাই করা পশুর মত গড়াগড়ি দিচ্ছেন। একসময় টানটান হয়ে গেলেন। তাকালেন ঘরের একশো ওয়াটের বাল্বের দিকে। তাঁর চোখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

রোরি তখনও খাটে বসে। চোখের পানি মুছে ফেলল। একপাশে নিজের মাথাটা হেলিয়ে ও ওর চোখের মণি দুটো ভ্রুর দিকে ঘোরায়।

বেলুন যেমন সশব্দে ফাটে, তেমনি ফটাস করে একটা শব্দ হলো ইয়েনের মাথায়। তাঁর গোটা শরীর কাঁপতে কাঁপতে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল। তারপর আবার সোজা হয়ে গেল।

তিনজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের অবিরাম লাথি আর ধাক্কায় দরজা ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে তারা স্তম্ভিত। শমিতা বুঝতে পারল একটা লড়াই হয়ে গেছে এবং ইয়েন শেষ। পরাজয়ের জন্য তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে।

আবিদ ভয়াবহ দৃশ্যটি দেখার ঘোর কেটে যাবার পর অস্ফুটে বলে ওঠে, 'ইয়া আল্লাহ্!'

'রোরি,' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শমিতা। ছেলের শরীরে পোড়া দাগ দেখে উতলা হয়ে গেল।

রনসন কী করবেন, কী বলবেন, নাকি পালাবেন ভেবে পান না। তিনি মেঝেতে চোখ খোলা, হাঁ মুখ, চিৎপাত ইয়েনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খাট থেকে নেমে তিনজনের সামনে এসে দাঁড়াল রোরি ধীর পায়ে। হাসছে। কঠিন রোগ থেকে সেরে ওঠার সময়কার আধা-বিষণ্ন-আধা-প্রসন্ন হাসি। বলল, 'বোকা ইয়েন, আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। মেরে ফেলেছিল প্রায়। কিন্তু আমি মরতে চাই না। তাই ওকেই মেরে ফেলতে হলো।'

'তোমায় কী করেছেন তিনি?' জানতে চাইল আবিদ।

হাসল রোরি। 'গায়ে পেট্রোল ঢেলে লাইটার দিয়ে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি তো জ্বলন্ত মশাল হয়ে গেছিলাম।'

'ডক্টর রনসন, আমার ছেলের কী হবে! ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। আবিদ, প্লিজ হারি আপ।' অনুনয় করল শমিতা।

'ঘাবড়িয়ো না, মা!' বাধা দেয় ওয়্যারউলফ, 'হাসপাতালের ঝামেলার দরকার নেই! আমি এমনিতেই সেরে উঠব।'

রনসন বললেন, এক্ষুণি হাসপাতালে ভর্তি না করলে শরীরে পোড়া ঘা আরও দগদগে হয়ে যাবে। তা ছাড়া খালি গায়ে থাকলে ঠাণ্ডায় ওর নিউমোনিয়া হবেই।

'মি. রনসন, শুধু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমাকে বিচার করলে ভুল করবেন। বাবা, তুমি বরং এই পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করো কীভাবে ওই পণ্ডিতের সৎকার করবে। পুলিশী ঝামেলায় নিশ্চয় তোমরা পড়তে চাও না।'

তাই তো! এতক্ষণে হুঁশ হয় আবিদের। রনসনকে হাত ধরে ঘরের এক কোনায় নিয়ে গেল। দেখে হাসে রোরি। বলে, 'মা, আমি ঘুমাব। নতুন বিছানা পেতে দাও।'

আবিদ তখনও ফিসফিসিয়ে আলাপ করছে রনসনের সঙ্গে। ওদের কোন কথাই রোরির কানে পৌঁছার কথা নয়। তবু সে বলল, 'বাবা, মি. রনসন যা বললেন তাই করো। নইলে বিপদে পড়বে!'

চমকে ওঠেন রনসন। তিনি কী বলেছেন তা জেনে ফেলেছে রোরি। তবে আবিদ একটুও চমকায়নি। তার কাছে এখন রোরির সব কাজই স্বাভাবিক। সে বলল, 'রনসন, আপনার গাড়িটি লাগবে। দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই। আজ রাতের মধ্যে কাজ শেষ করুন। নইলে ঝামেলা হবে।'

সাতাশ

স্টিফেন রনসনের গাড়ি, চালাচ্ছেন তিনি নিজেই। ভেতরে তিনটি মানুষ, এর মধ্যে জীবিত দু'জন। তারা নেই আকাশে। বাতাসটা একটু ভারী। বৃষ্টি হবার আগে যেরকম হয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া, ভীত রনসন বকবক করছেন সমানে, 'আই হ্যাভ ডান ওয়াইল্ড থিংস ইন মাই লাইফ। বাই দিস ইভেন্ট বিয়ণ্ড মাই অ্যাকসেপ্ট্যান্স। আই মীন, দ্য গাই ইজ ডেড।'

'আমি জানি,' শান্ত গলায় বলল আবিদ।

'একবার একটা ফিল্ম দেখেছিলাম,' রাস্তার পাশের একটা বারের দিকে আড়চোখে তাকালেন রনসন, ঝলমলে আলোর মাঝখানে মদ খেয়ে চুর হচ্ছে খদ্দেররা, 'নায়ক তার বন্ধুকে রাগের মাথায় খুন করে ফেলেছে। সে অনবরত কাঁদছে আর লাশ গুম করার জন্য গাড়ি নিয়ে ছুটছে। আমার অবস্থাও অনেকটা সেরকম। মি. হাসান, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?'

'না, বলুন শুনছি,' বলল আবিদ।

'পুলিশ যদি আমাদের থামায়? লাইসেন্স পরীক্ষা করে দেখার জন্যও তো থামাতে পারে!'

'থামাবে না।'

'খুব বিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন দেখছি। ফুটবল টিমের

ক্যাপ্টেনদের এরকম আস্থার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। আমি ছাত্র থাকাকালে ফুটবলার ছিলাম। আপনিও ছিলেন?'

'কোন কালেই ছিলাম না।'

আলাপ আর জমাতে পারেন না রনসন। আবিদ স্বস্তি পেল। বাড়ির কথা ভাবতে লাগল সে। বেচারী শমিতা এখন ঘরে কী করছে...

কামরা ধোয়ামোছা শেষ করেছে শমিতা। ট্যানারের মাথা ফেটে রক্ত আর মগজের ছিটে লেগেছিল মেঝেতে; জমাট বাঁধার আগেই সেগুলো মুছে ন্যাকড়াটা পলিথিনের ব্যাগে পুরে ডাস্টবিনে ফেলে এসেছে।

রোরি এখন ড্রয়িংরুমে রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। বিছানায় গিয়ে শোবার জন্য বেশ ক'বার বলা হয়েছে ওকে, শোনেনি। গা পুড়েছে আগুনে, ব্যথা উপশমের জন্য রনসন বড়ি খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলেন। বড়ি মুখে তোলেনি রোরি। চোখ বন্ধ করে দোল খেয়ে খেয়ে গুনগুন গান গেয়ে ছেলেটা যন্ত্রণা ভুলছে?

ডা. গারবারকে ফোন করল শমিতা। তিনি বাড়ি নেই। বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছেন। একটা সিরিয়াস প্রবলেম গায়ে না মেখে তাঁর মত লোক সিনেমায় যেতে পারেন! বিরক্ত বোধ করল শমিতা। রোরির কী ঘটছে সেটা তাঁর অজানা নয়। তবু প্রমোদটাই তাঁর কাছে বড় কথা?

কেঁদেই ফেলল শমিতা। ফোন করল রবার্টসনকে। তিনি বললেন, আসছেন। তবে তাঁর গলার স্বর শুনে বোঝা গেল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ভদ্রতা রক্ষা করতে চাইছেন।

রান্নাঘরের কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলল শমিতা। একটু আগে ভয়ানক মৃত্যু হয়েছে একটা লোকের। এমন বাড়িতে একা

থাকাটা ভীষণ যন্ত্রণার। এ অবস্থায় ব্যস্ত থাকা ছাড়া উপায় নেই।

আঠারো মাইল রাস্তা পেরিয়ে আবিদ ডানে মোড় নিতে ইশারা করল রনসনকে। পরিত্যক্ত একটা মাটির সড়ক চলে গেছে ডান দিকে, সিকি মাইল পরেই গভীর বন। রাস্তাটা ঢুকেছে সেই বনে। হ্যাঁ, এখানেই ফেলে রেখে যাবে ইয়েন ট্যানারকে। মৃতদেহ উদ্ধারকারীরা মনে করবে দুর্বৃত্তরা বিদেশি লোকটার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে।

একটা বড় গর্ত খুঁজে পাওয়া গেল। আগাছায় ভর্তি। গাড়ি থেকে দ্রুত লাশ নামাল ওরা। সাবধানে লাশটা শুইয়ে দিল গর্তে। প্লাস্টিকে মোড়া মরদেহ। তার ওপর কম্বল ঢাকা দেয়া। আবিদ কম্বল খুলতে থাকে।

'কী করছেন, মি. হাসান? জলদি চলুন।' ফিসফিস করলেন রনসন, 'কম্বল দিয়ে করবেন কী?'

'কোন প্রমাণ রেখে যেতে চাই না।'

প্লাস্টিক শীট আর কম্বল খুলে নিতে রনসন সহায়তা করলেন আবিদকে। তারপর দু'জনে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি আবার ছুটল পাকা রাস্তার দিকে। রনসনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

রাস্তায় উঠে রনসন গাড়ির গতি কমালেন। মোলায়েম সুরে বললেন, 'মি. আবিদ, আমার শরীর এখন আর কাঁপছে না। তবে মাই গড! এখনও আমার ভয় লাগছে।'

'কম্বল আর প্লাস্টিক শীট বাড়িতে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলব। ইয়েন যে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। যদ্দূর জানি তিনি কখন, কোথায় যান তা কাউকে বলতেন না। হোটেল থেকে বেরিয়ে শহরের বহু জায়গায় চক্কর দিতেন। কাজেই...'

'আরে সে কথা নয়। আমার ভয় রোরিকে নিয়ে। ছোট একটা ছেলে! ওকে প্রথম দেখি গত সোমবারে আর আজ রাতেও

দেখলাম। কত ফারাক! একটা মানুষকে খুন করে ফেলল!'

'ঠিক আছে, আপনাকে আর আমার বাড়িতে ফিরতে হবে না,' কথাটা বলেই আবিদের খেয়াল হলো গাড়িটা রনসনের। তিনি যদি উল্টো রাস্তা ধরেন তা হলে নিজের বাড়ি কী করে ফিরবে ও?

'না, আমি আপনাকে মাঝপথে নামিয়ে দিচ্ছি না। আমি বলছিলাম কী, ছেলেটাকে কোন একটা স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিলে কেমন হয়? সবার নিরাপত্তার জন্য?'

কী জবাব দেবে আবিদ ভেবে পায় না। ছেলেটা তিনজনকে হামলা করেছে, একজনকে মেরেই ফেলেছে। রোরির পরিবর্তন পূর্ণতায় পৌঁছা পর্যন্ত সে আরও কত কী করবে কে জানে!

'আপনি কি ওকে বন্দি করে রাখার কথা বলছেন, ডক্টর রনসন?'

'বন্দিই বলতে পারেন। যতদিন ওর পরিবর্তনের শেষ না হয় ততদিন। আস্তে আস্তে বয়স বাড়বে। পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে, ভেতরের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তুলবে সে। তখন ওকে আমরা নিরীক্ষণ করতে গেলে সে সহযোগিতা করবে।'

'বাকি জীবনটা ওকে গিনিপিগ হয়েই থাকতে হবে, না?'

'এটা অভিমানের ব্যাপার নয়, মি. আবিদ। ছেলেটা যে ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাইব্রিড ওয়্যারউলফ এতে কোন সন্দেহ নেই। ও আমাদের যেসব তথ্য দিতে পারে তা পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই মূল্যবান তথ্য হবে।'

যুক্তিপূর্ণ কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবিদ বলল, 'কোথায় রাখব ওকে? জেলখানায়?'

'না, না! জেলখানা নয়। ইয়েনের মৃত্যুর জন্য রোরিকে আমি খুনী বলছি না। ইয়েন নিজেই বোকামি করেছেন। থাক ওসব কথা। আমি বলছি কোন একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ওকে নিয়ে

রেখে দেয়াটাই সুবুদ্ধির কাজ হবে। শিকাগোর কাছে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান আমার জানা আছে। যদি বলেন...'

'এখন এ আলাপ থাক, মি. রনসন।' কান্নাভেজা গলা আবিদের। সে ভাঙা গলায় বলল, 'আমরা বাড়ি গিয়ে হয়তো দেখব রোরি মরে পড়ে আছে। পেট্রোল ঢেলে ইয়েন ওকে কী ভীষণভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে দেখেননি?'

আটাশ

রোরি মরেনি। বেঁচে আছে। বসে আছে চেয়ারে। দেখে মনে হয় বেহুঁশ। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক ব্যাপার একটাই, ওর একটা পা মেঝেতে, ওই অবস্থায় ধীর গতিতে চেয়ার দোলাচ্ছে।

শমিতা তখনও রান্নাঘরে। ক্লান্ত, অবসন্ন। নিদ্রাতুর চোখ, স্বামীকে দেখে একটু উজ্জ্বল হলো। আবিদ ওর হাতে হাত রাখল। ভরসার হাত। চোখে চোখ। শমিতা বুঝতে পারল আবিদ কফি খেতে চাইছে।

ড্রয়িংরুমে রবার্টসন। চেহারায় চিন্তার গভীর ছাপ। তিনি ইতিমধ্যে গোটা কাহিনি শুনেছেন শমিতার কাছে। আবিদ আর রনসনকে বললেন, অবস্থা আরও গুরুতর হবার আগেই একটা কাজ করতে হবে। তিনি টেলিফোনে স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন আজ রাতটা তিনি এখানেই থাকছেন। বাড়ি ফিরবেন কাল সকালে।

রনসন চটজলদি রোরিকে পরীক্ষা করলেন। তবে খুব সাবধানে। ওকে না জাগিয়েই। প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা রোরির। অবাক হলেন রনসন। আবিদও বিস্মিত। তবে ক্লান্তিতে ও চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছে না। ড্রয়িংরুমে এসে সোফায় কাত হলো সে। একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল।

রাত দুটোর দিকে হঠাৎ কেন জানি ঘুম ভেঙে গেল ওর। তাকাল চোখ মেলে। ডিম লাইট জ্বলছে। ওদিক থেকে সাদা একটা কিছু আসছে। লম্বা চুল মাথায়। ভড়কে গেল আবিদ। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে সোফায় বসল। না, ভয়ের কিছু নেই। তার ছেলে নয়, বউ আসছে।

'ভড়কে দিয়েছিলে আমায়,' বলল আবিদ। 'কী হয়েছে, শমি?'

'আমার সঙ্গে এসো,' মৃদু কণ্ঠে বলল শমিতা। 'রোরিকে একটু দেখবে।'

স্ত্রীর চেহারা বিধ্বস্ত, রোরির হাতে আক্রান্ত রুখসারকে যেমন দেখাচ্ছিল ঠিক যেন সেরকম।

'কী হয়েছে ওর? ছটফট করছে?'

প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শমিতা বলল, 'ওকে একটু দেখবে, এসো।'

স্ত্রীর পিছু নিল আবিদ। রোরির কামরায় যাচ্ছে দু'জনে। ছেলেটাকে অনেক কষ্টে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার কামরায় নিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন রনসন আর রবার্টসন। দু'জনই ওই কামরায় চেয়ারে ঘুমাচ্ছেন। দরজাটা বন্ধ, তবে খিল নেই!

'ও কি জেগে আছে?' ফিসফিসিয়ে বলে আবিদ।

ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করল শমিতা। আস্তে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল আবিদ। ভয়ে শিউরে উঠল ও। রনসন আর রবার্টসন মারা গেছেন! চোখ কচলে আবার তাকাল আবিদ। না, ডাইনিং চেয়ারে দলা-মোচড়া হয়ে পড়ে রয়েছেন

রবার্টসন, রনসন চিৎ হয়ে আছেন বিছানায়। ওঁরা মারা যাননি।

ওই তো ওদেরকে শ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছে। রোরি ঘুমাচ্ছে। গভীর ঘুম তবু দুলছে তার শরীর।

'দেখ,' বলল শমিতা।

বেডল্যাম্পের মৃদু আলোয় তাকাল আবিদ। তার স্ত্রী তাকে যা দেখাতে নিয়ে এসেছে তা দেখতে পেল। রোরির শরীরের বাম দিকটা, যা সন্ধ্যার সময় পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল, সেখানটা ঘন সাদা পশমে ছেয়ে গেছে। ইয়েন পেট্রোল ঢেলে যে দগদগে ঘা সৃষ্টি করেছিলেন তার কোন চিহ্নই নেই।

উনত্রিশ

সূর্য ওঠার আগেই রনসন শেভ করে নতুন পোশাকে ফিটফাট হলেন। রবার্টসন আর আবিদ সাতটার মধ্যেই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতার জন্য অপেক্ষা করছে। রান্নাঘরে উনুন ধরিয়েছে শমিতা। রোরি ঘুম থেকে উঠেই ঘোষণা করল সে ফলের রস খাবে। ইদানীং তার খিদে এত বেড়ে গেছে যে ঘরে যা আছে তাতে কুলোবার নয়।

গাড়ি নিয়ে দোকানে গেল আবিদ। নানারকম ফলের রস আনল, কয়েক গ্যালন।

রোরি বলল, সে সবার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসবে না। ফলের রস খাবে নিজের কামরায়। রবার্টসন ইশারা করলেন

আবিদকে, 'আপত্তি করবেন না। ওকে ওর ইচ্ছামত খেতে দিন।'

টেবিলের পরিবেশ থমথমে। রবার্টসন তাঁর অভিমত পেশ করলেন; রোরিকে অবশ্যই দূরের কোন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা দরকার।

এবং এটা করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তার জন্য। নইলে বিপদ হতে পারে।

প্রবল আপত্তি জানাল শমিতা। ছেলেকে সে কিছুতেই দূরে নিতে দেবে না।

রবার্টসন বললেন, 'মিসেস শমিতা, আবেগ দিয়ে সমস্যা মিটবে না। ভেবে দেখুন কেমন মারমুখী হয়ে উঠছে আপনার ছেলে। রুখসার এবং ইয়েনের বেলায় যা ঘটেছে তেমন কিছু যে আমাদের বেলাতেও ঘটবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

'মারমুখী বলছেন আমার ছেলেকে?' ক্ষুব্ধ হলো শমিতা। 'ইয়েন ভাল মানুষ সেজে এসে আমার ছেলের গায়ে আগুন দিয়েছে। পুড়ে ঝলসে গেছে ওর শরীরের চামড়া। রাগে-দুঃখে ছেলেটা যে গোটা বাড়ি ভেঙে টুকরো করে ফেলেনি সে আমাদের ভাগ্য!'

'শমিতা, প্লিজ! আপনি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন...'

'আমার ছেলেকে আপনারা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইবেন আর আমি চুপ করে থাকব? না, কখনোই তা হবে না।'

'টেক ইট ইজি, ডার্লিং,' নরম গলায় বলে আবিদ, 'ডাক্তার ঠিক কথাই বলছেন। একটা কিছু তো আমাদের করতেই হবে...'

কথাটা শেষ করার আগেই আবিদ দেখতে পেল রোরিকে। দরজার কাছে ছেলেটা দাঁড়িয়ে। চোখ জ্বলছে আগুনের গোলার মতো। সবাই তাকাল ওর দিকে। কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না।

আবিদ প্রথম মুখ খুলল, 'রোরি, কিছু বলবে?'

'শাট আপ, বাবা! মিথ্যুক পাজি কোথাকার!' মুখ বিকৃত করল রোরি। 'তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে।'

'রোরি, তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। চিরকাল থাকবে। যে যা-ই বলুক, তুমি আমাদের সন্তান! আমরা তোমার বাবা-মা।'

'হুহ, বাবা-মা! এত মিথ্যে কথা বলার কী দরকার ছিল, বাবা?'

রবার্টসন চেয়ার থেকে উঠে রোরির কাছে গেলেন। জীবনে বহু কঠিন রোগীকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করেছেন তিনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে মিষ্টি গলায় শুরু করলেন, 'রোরি, আমরা তোমার ভাল চাই। যারা তোমাকে ভুল বোঝে তাদের কাছ থেকে তোমায় আলাদা করে একটা ইনস্টিটিউশনে রাখলে...'

'নিকুচি করি!' চিৎকার দিল রোরি। এক লাফে টেবিলের কাছে এসে টি-পট, কাপ পিরিচ তুলে নিয়ে দেয়ালে ছুঁড়তে লাগল। 'তোমাদের তেলানো কথায় আমাকে মজাবে? বেশি বকবে না, রবার্টসন, তোমার মাথার হাড় ভেঙে দেব।'

আবিদ ছেলের কাছে ছুটে গেল। 'রোরি! কী হচ্ছে এসব?' সে ধমক দিল। কিন্তু ক্রোধান্বিত ওয়্যারউলফ থামল না। সে খালি একটা চেয়ার আছড়ে ভেঙে ফেলল। এরপর একে একে গামলা, ট্রে, প্লেট ভাঙতে লাগল। শমিতা কেঁদে ফেলল, রনসন ভয়ে ডাইনিং টেবিলের নীচে গিয়ে লুকালেন।

'থামো বলছি!' বিকট চিৎকার দিল আবিদ। রাগ কমায়, নাকি আবিদের চিৎকারের ফলে বোঝা গেল না, তবে রোরি থামল এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

রবার্টসন বললেন, 'এজন্যেই বলছিলাম ওকে দূরে কোথাও পাঠানো ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।'

'না,' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শমিতা, 'না, না, না...' টেবিলে মাথা রেখে ভেঙে পড়ে সে।

'কোথায় নিতে হবে ওকে?' জিজ্ঞেস করল আবিদ।

'শিকাগোর সেইলিস ইনস্টিটিউট হলে কেমন হয়?' পরামর্শ দিলেন রনসন।

মাথা নাড়লেন রবার্টসন, 'না, ওখানে নয়। ওখানকার বন্দোবস্ত তেমন সুবিধের নয়। আমি হাওয়ার্ড স্মিথের কথা ভাবছি। তাঁর হাসপাতাল শহর থেকে বাইরে। ড. স্মিথ লোকও ভাল। সবচেয়ে বড় কথা, রোগীর কোন তথ্য তিনি ফাঁস করেন না।'

'আপনি তাঁকে চেনেন? আমার সঙ্গে কিন্তু পরিচয় নেই।' বললেন রনসন।

'পনেরো বছর আগে সিয়াটলে একবার আলাপ হয়েছিল।' বললেন রবার্টসন। 'ওঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলতে হবে। তিন ঘণ্টার জার্নি। আবিদ এবং শমিতাকেও যেতে হবে, বণ্ড সই করার জন্য। ডা. গারবারকেও, কেস হিস্ট্রি ব্যাখ্যা করবেন তিনি। সন্ধ্যার আগেই রোরিকে ভর্তি করানো উচিত।'

'আমি গারবারকে ফোন করছি।' রনসন বললেন, 'তা হলে চলুন, এখনই স্মিথের সঙ্গে আলাপ সেরে আসি।'

তবে ছেলেকে একা রেখে শমিতা যেতে রাজি না হওয়ায় ঠিক হলো সে বাড়িতে থাকবে, অন্য সকলে যাবে স্মিথের কাছে। পথে, গারবারকে তুলে নেয়া হবে গাড়িতে।

তার আগে, রোরিকে কামরার ভেতরে রেখে দরজায় তালা মারতে হবে। কাজটা খুব চাতুর্যের সঙ্গে সমাধা করল আবিদ।

বন্ধ কামরা থেকে কোন শব্দ এল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল আবিদ। হঠাৎ শুনল গজরাচ্ছে রোরি। বিকট চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলছে গোটা বাড়ি।

আবিদ বলল, 'শোন, শমি, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দরজা খুলবে না। রোরি মিথ্যে বলতে পারে, নানারকম চালাকি করতে পারে। হুমকি দিতে পারে। কান্নাকাটি করতে পারে। বেরিয়ে এসে সে কী করবে খোদাই জানেন। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি দোতলায়

যেয়ো না। যত কষ্ট হোক, মন শক্ত করে নীচেই থেকো।'

স্বামীর কথার জবাবে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল শমিতা। ওর মুখ বিষণ্ন। বোবা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে।

'চলুন রওনা দিই। আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে।' তাড়া দিলেন রনসন। 'বৃষ্টি নামলে গারবার আমাদের জন্য অপেক্ষা না-ও করতে পারেন।'

এমন সময় ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ। রিসিভারে কান দিয়ে রনসন ইশারায় জানান, রবার্টসনের কাছে ফোন এসেছে।

ফোন ধরলেন রবার্টসন। 'না, অ্যালিস! হ্যাঁ...একটু ঝামেলায় আছি। ...আহা বলছি তো ফিরব, সন্ধে হবে। ...আরে না, না, চিন্তার কিছু নেই। ...আছে মনে আছে। ...হ্যাঁ পুরো লোড করেছি। ...ধুত্তোর শুধু ফালতু মেয়ে মানুষের মত কথা। আমি কচি খোকা নাকি!' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিলেন রবার্টসন।

শমিতা দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। কাছে এসে বলল, 'আপনি সঙ্গে রিভলবার এনেছেন?'

রবার্টসন বিব্রত কণ্ঠে বলেন, 'ইয়ে মানে ভাবলাম–'

'আপনি, আপনি আমার ছেলেকে গুলি করবেন! হে, খোদা!'

গ্যারেজ থেকে রনসনের গাড়ি বের করা হয়েছে। হর্ন বাজতেই রবার্টসন যেন দৌড়ে পালালেন।

ঢাকায় থাকেন শমিতার মা। মায়ের কাছে দুঃখের কথা বলার জন্য লং ডিসটেন্স কল করে হতাশ হলো শমিতা। মা বাড়ি নেই, জানাল কাজের বুয়া। তার সঙ্গে রোরিকে নিয়ে কোন কথা বলল না শমিতা। দু'একটা কথা বলে রেখে দিল ফোন। শুধু বলল পরে আবার সে ফোন করবে।

'খোদা, তুমি তো সবই পারো। আমার ছেলেকে ভাল করে দাও!' প্রার্থনা করল শমিতা।

ক্রিং। ক্রিং। ক্রিং। টেলিফোন ধরল না শমিতা। তিনবার বাজল। শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেল সে রিসিভারের দিকে।

'হ্যালো?'

'শমিতা! রক্ষে যে আপনি ধরেছেন। মি. হাসান ধরলে লজ্জায় মরে যেতাম। কী যে বলতাম তাঁকে...আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

ফোন করেছে জার্দানা খান। মহিলার সঙ্গে গত কয়েক দিন দেখাও হয়নি, ফোনে কথাও হয়নি।

'আপনারা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন যে গত শনিবার থেকে আমরা কোথায়!'

'হ্যাঁ।' মিথ্যা বলল শমিতা। সে জানেই না যে জার্দানারা মহল্লা ছেড়ে চলে গেছে।

'রুখসার আর রকিকে এখানে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করেছি। আমি আর রেজালা থাকি ভাড়া করা একটা কেবিনে। আপনারা মনোকষ্টে ভুগবেন না, প্লিজ! রোরি যা করেছে ওতে তো আপনাদের কোন হাত ছিল না।'

শমিতা শুধু শুনে গেল। কোন কথা বলল না। এমনকী কোত্থেকে জার্দানা ফোন করেছে তাও জিজ্ঞেস করল না।

'সত্যি বলতে কি একটা কথা জানার জন্যও ফোন করছি। ইয়ে, মানে আমাদের কখন বাড়ি ফিরে আসাটা নিরাপদ হবে। মানে আপনারা কোন কিছু কি করছেন?'

'রোরিকে আজ দূরের একটা ইন্সটিটিউশনে নিয়ে যাওয়া হবে।' বলল শমিতা।

'ওহ, গুড! আই মীন, আই অ্যাম সরি টু হিয়ার ইট। তবে খুশি হচ্ছি ভেবে যে রোরি উপযুক্ত ডাক্তারের চিকিৎসা পাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়,' বলল শমিতা।

'ওকে দূরে সরিয়ে রেখে ভালই করবেন। আচ্ছা, আবার কি

ওসব কিছু ওকে ভর করবে? মানে রুখসারের সঙ্গে যেসব করেছিল আর কী।'

'তা কী করে বলি!'

'তা অবশ্য ঠিক। কী করে বলবেন। ও তো আর আপনার ছেলে নয়।'

শমিতার মেজাজটাই গেল বিগড়ে। 'কী বললেন আপনি?'

কণ্ঠস্বরে পরিবর্তনটা ধরতে পারেনি জার্দানা, 'বলছি, ওকে তো আপনি পেটে ধরেননি। কোন্ বাপের ঔরসে জন্ম, স্বভাব কেমন হবে তা আপনিই বা জানবেন কেমন করে?'

'পাকিস্তানী কুত্তী! তুই আমার ছেলেকে বেজন্মা বলার সাহস পেলি কোথায়–'

'শমিতা! আই অ্যাম শকড–'

'চোপ! হারামজাদী! তোরা কখনও আর আমার বাড়ি আসবি না। এলে তোদের জুতোপেটা করব।'

'শমিতা! প্লিজ!'

'ডাইনী! আর কখনও আমার সঙ্গে কথা বলবি না।'

অপর প্রান্তের রিসিভার রাখার শব্দ হলো। শমিতা জানে এ জীবনে জার্দানার সঙ্গে তার আর কথা হবে না। ওই পরিবারের কারও সঙ্গেই আর তার আলাপ দূরে থাক, দেখাও হবে না।

ত্রিশ

আকাশে প্রচুর মেঘ করেছে। কেমন বেগুনি রঙের একটা চাদর

ঢেকে ফেলছে গোটা আকাশ। চারদিকে ঘনিয়ে উঠছে অন্ধকার। সন্ধের সময় যেমন হয়, ঠিক তেমনি। অথচ এখন বিকেল মাত্র সাড়ে তিনটা।

ঘরে আলো জ্বালেনি শমিতা। নীরবে, একা সে সতর্ক নজর রাখছে রোরির ওপর। বিকেল তিনটার দিকে ইভ টমাস টেলিফোন করেছিল। বলেছে ইয়েন ট্যানারকে গুণ্ডারা খুন করে লাশ ফেলে রেখেছে গভীর জঙ্গলে। শুনে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে শমিতা।

ইভ রোরির অবস্থা জানতে চেয়েছিল। সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে শমিতা, 'আগের মতই।'

মিনতি করেছে ইভ, 'আপনার ছেলে পুরোপুরি ওয়্যারউলফ হয়ে গেলে আমাকে দয়া করে জানাবেন। আমি ফিল্ম করব। মি. ট্যানারের একান্ত ইচ্ছে ছিল সেটাই। আহা, বেচারার সাধ পূরণ হলো না!'

রোরি ধীরে ধীরে নিজের বন্দিত্ব মেনে নিচ্ছে। মাঝে মধ্যে ওর দরজায় করাঘাত শোনা যায়। অবিরাম গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছে ছেলেটা। তবে শমিতার সময় যে আর কাটে না! কখনও বই পড়ে, কখনও টিভি দেখে, কখনও ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত হয়, তবু বারবার বন্দি ছেলের দিকেই মনোযোগ চলে যায়।

বিখ্যাত গায়কদের হিট গানগুলো অবিকল সুরে একের পর এক গাইছে রোরি। কেমন করে এতটুকুন ছেলে সুরের কাজ রপ্ত করল? নিজেকে প্রশ্ন করে শমিতা। রোরি যে কুয়োর কথা বলে সেখানেই কি তবে সুর শিখেছে সে?

না, আমি আর রোরির কথা ভাবব না, মনে মনে বলল শমিতা। সে ওর দিকে মনোযোগ না দেয়ার জন্য স্বামীর জুতোয় রং করতে শুরু করল। আবিদের জামাকাপড় ইস্ত্রি করল।

এরপর সে তাই করল যা না করার জন্যই এতক্ষণ নানান কৌশল অবলম্বন করছিল। একটা চেয়ার নিয়ে নিঃশব্দে বসল

রোরির কামরার বন্ধ দরজার সামনে। ততক্ষণে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

'মা! এতক্ষণে তুমি এলে?'

রোরির কণ্ঠস্বর শুনে স্তম্ভিত শমিতা। 'হ্যাঁ এলাম। তুমি কেমন করে বুঝলে?'

'আমার অনুভূতি খুব ধারালো। স্বাভাবিক মানুষের চাইতে অনুভূতি শক্তি আমার অনেক বেশি।'

শমিতার হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করতে থাকে।

'মা! বাবা কোথায়? ড. রবার্টসন কোথায় গেলেন?'

'ওরা বাড়ি নেই, রোরি। ইয়ে...মানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।'

'আমার ব্যাপারে, তাই না? সেজন্যই আমাকে বন্দি করেছে?'

মিথ্যে বলে আর কী হবে! রোরি তো সবই বুঝে ফেলে, সবসময়ই সে বুঝতে পারে। 'হ্যাঁ, সোনা আমার! তারা তোমার জন্য একটা জায়গা ঠিক করতে গেছে।'

চুপ করে রইল রোরি। এই নীরবতা শ্বাসরুদ্ধকর লাগল শমিতার কাছে।

'ওরা আমাকে সারা জীবন তালাবদ্ধ ঘরে রাখবে,' বলল ওয়্যারউলফ, 'জন্তু-জানোয়ারকে যেরকম খাঁচায় পুরে রাখে তেমনি খাঁচায় পুরবে, যাতে আমি কারও ওপর হামলে না পড়ি। তারপর ঘুম পাড়ানোর ঔষধ দেবে আমার খাবারের সঙ্গে। খেয়ে আমি মরে যাব। এটাই চাও তোমরা?'

'না, রোরি। অমন ভেবো না, লক্ষ্মীটি। আমরা তোমায় ভালবাসি। তোমায় মরতে দেব কেন আমরা?'

'তা হলে তোমরা আমাকে ডা. স্মিথের কাছে পাঠাতে চাইছ কেন? ওখানে পণ্ডিতরা এসে আমাকে জেরা করবে। একের পর এক প্রশ্ন করে বিরক্ত করবে। তারপর ইয়েনের মতই কোন এক

পাগল আমাকে মারতে আসবে, আমি লোকটাকে মেরে ফেলব। ওসব ঘটার আগে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও, মা!'

দু'চোখ বেয়ে পানি গড়ায় শমিতার। ভাঙা গলায় বলল, 'আমি তোমাকে যেতে দিতে পারব না।'

'দরজা খোলো, মা।'

'না, খোকা, না। আমি পারব না।' কান্নায় কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায় শমিতার।

বিকট চিৎকার করে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রোরি, 'আমাকে বেরুতে দাও। নইলে যারা আমায় নিতে আসবে তাদের সবাইকে আমি মেরে ফেলব। কসম, আমি সবাইকে খতম করব।' আবার প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ও, দরজাটা এবার মড়মড় করে উঠল।

হঠাৎ রোরির গলার আওয়াজ অন্য রকম হয়ে যায়। কান্না জুড়ে দেয়, 'প্লিজ খোলো, মা! অন্ধকারে আমার ভয় করছে। ঘরে আলো নেই।'

ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ। ঝড়ো বাতাস বইছে বলে বিদ্যুৎ বন্ধ করেছে কেন্দ্র থেকে। ভয়ার্ত ছোট্ট ছেলেটির মিনতি শুনে মমতায় গলে যায় শমিতা। চেয়ার থেকে উঠে তালায় চাবি ঢোকাতেই মনে পড়ল স্বামীর হুঁশিয়ারি, 'ছলছুতো করে, ভয় দেখিয়ে, কান্না-কাটি করে ও বেরুতে চাইবে। খবরদার দরজা খুলতে যেয়ো না।'

'তুমি অন্ধকারে ভয় পাও না। তুমিই বলেছ আমায়, ভুলে গেলে?' শমিতা ছেলেকে মনে করিয়ে দিল ক'মাস আগে শোবার ঘরে তার বলা কথা।

'ঠিক আছে!' গর্জে উঠল রোরি, 'আমি বের হচ্ছি, যখন বেরিয়ে পড়ব তখন তুমি পালাবে। বুঝলে মেয়ে? নইলে তোমার খবর আছে।'

মড়মড় শব্দ হতেই দেখা গেল দরজার কাঠের একটি পাল্লা ফেটে রোরির মুষ্টিবদ্ধ হাত বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে ফুটো হয়ে

গেল ওখানে। এবার হাত দিয়ে গর্তটা বড় করার জন্য কাঠ ভাঙতে লাগল রোরি। ভয়ে চিৎকার দিল শমিতা।

রোরি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, 'ভাল চাও তো পালাও, মেয়ে মানুষ।'

স্তম্ভিত শমিতা। এ তো তার ছেলের গলা নয়, মানুষের গলার আওয়াজ নয়। দৌড়াতে শুরু করল ও। দরজার কাঠ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন।

'পালাও! ভীতু মুরগি কোথাকার!' উন্মাদের মত হাসে রোরি, 'নইলে তোমার গোটা শরীর আমি ফাটিয়ে ফেলব, বোমা ফাটার মত ফেটে টুকরো টুকরো হবে তুমি। আমি ওয়্যারউলফ! আমি ওয়্যারউলফ! আমি তোমায় ছাড়ব না।'

শমিতা পালাচ্ছে। খোদা, কোথায় লুকাব আমি? কোথায় যাব? দড়াম করে ফ্রেমসমেত পুরো দরজাটাই মেঝেতে পড়ে যাবার শব্দ হলো। অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে শমিতার ডান চোখের ওপরে, কপালের কাছটা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল।

'কোথায় গেলে, মা জননী?' ঠাট্টার সুরে চিৎকার করে রোরি, 'আমার নজর এড়াতে পারবে না। মনে রেখ আমি আধা-মানব, আধা-জানোয়ার।'

শমিতা লুকিয়ে আছে বাথরুমে। লাগোয়া বেডরুমে রোরির দুপদাপ পায়ের আওয়াজ। খোদা! খোদা! রক্ষে করো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচতলায় রোরির চিৎকার শোনা গেল, 'মা আমার! জলদি এসো।'

শমিতা খুব সাবধানে বাথরুম থেকে বের হলো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খাটের কাছে গেল টেলিফোন করতে। পুলিশে খবর দেবে। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে যাবে, হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল রিসিভার।

রোরি তামাশা করছে আমার সঙ্গে, ভাবল শমিতা। আমি কী

করছি সব দেখছে ও, আর হাসছে নিঃশব্দে। ইচ্ছে করলে যে কোন সময় সে আমাকে মেরে ফেলতে পারে। টেবিলের ওপর রাখা গাড়ির চাবি খুঁজতে শুরু করল শমিতা। পেয়েও গেল।

রনসনের গাড়িতে রবার্টসন আর আবিদ গেছে ডাক্তার স্মিথের ওখানে। শমিতাদের দুটো গাড়িই আছে বাড়িতে। ভক্সওয়াগনটা গ্যারেজের বাইরে। শমিতা ছুটল সেখানে। পরনে তার খাটো হাতা ব্লাউজ আর ট্রাউজার; পায়ে চপ্পল।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ঘরের বাইরে এল ও। কিন্তু একী! ভক্সওয়াগন একপাশে কাত হয়ে আছে। রোরির কাণ্ড!

ভাগ্য ভাল শমিতার। যে চাবি এনেছে তা ভক্সওয়াগনের নয়, ম্যাভারিকের। গাড়িটা আছে গ্যারেজে। পাগলের মত দৌড়ে গ্যারেজে ঢুকল ও। দরজা খুলে ভেতরে বসেই চাবি দিয়ে ইঞ্জিন চালু করল।

খোদা! রোরি ইঞ্জিনটা যেন না ফাটায়! প্রার্থনা করে শমিতা। ব্যাক গিয়ারে চালিয়ে গ্যারেজের বাইরে আনল গাড়ি। হঠাৎ গাড়ির ছাদে বিরাট কিছু পড়ার শব্দ হলো। কী পড়ল আবার ছাদে? ব্রেক কষল শমিতা।

প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হলো গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিন, সেই সঙ্গে হো হো অট্টহাসি!

ছাদের উপর বসে আছে রোরি। গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ধরল শমিতা। এক ঝটকায় বেরিয়ে পড়তে হবে। দরজা খোলার চেষ্টা করতেই ড্রাইভিং সিটের পাশের কাঁচের জানালা ফেটে গেল। জানালায় ঘুষি মেরেছে রোরি।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল শমিতা। এবার ও আমাকে টেনে বের করে আছড়ে মেরে ফেলবে। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত, সেই সঙ্গে গাড়ির ছাদের উপর নাচ শুরু করে দিয়েছে রোরি, অদ্ভুত সব শব্দ হচ্ছে সব মিলিয়ে।

নানান শব্দের ভেতর ভয়ার্ত নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার একাকার হয়ে যেতে থাকে।

একত্রিশ

গোঁয়ারের মত ড্রাইভ করে লোকটা, মনে মনে জ্যাক গারবারের মুণ্ডুপাত করল আবিদ। গারবার তুমুল বৃষ্টির মধ্যে প্রায় খাঁ খাঁ রাস্তায় প্রবল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়িটা রনসনের। রবার্টসন চুপচাপ বসে আছেন। ড. স্মিথের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে। সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। তবে বলা বাহুল্য, রুখসারের ওপর রোরির হামলা কিংবা ট্যানারকে হত্যার ঘটনা বেমালুম চেপে গেছেন ড. রবার্টসন। শুধু বলেছেন রোরি অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠেছে। কাজেই তাকে বাসা থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া দরকার। এখন সমস্যা হলো, কীভাবে রোরিকে আনবেন! আবিদ মুচলেকায় সই করেছে, 'স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার ছেলে এই ইনস্টিটিউশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে।' সই করার পর থেকেই তার মন খারাপ। রোরি যদি আর কখনোই সুস্থ না হয়, শমিতাকে কীভাবে প্রবোধ দেবে ও?

রনসন বকবক শুরু করলেন। এখন তিনি স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক এই দুইয়ের বিভ্রান্তিকর সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বললেন, 'এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় কোন্‌টা যে স্বাভাবিক সেটা একটা ধাঁধা হয়ে আছে। আমার কথাই ধরুন। চার্লি চ্যাপলিনকে

সবাই বলে কমেডির রাজা। ওর অভিনয় একটুও পছন্দ নয় আমার। এজন্য এক বান্ধবী সেদিন আমায় অ্যাবনর্মাল বলল। তাই বলে কি আমি অ্যাবনর্মাল?'

'আমার তো আপনাকেই বরং কমেডির রাজা বলে মনে হয়,' বলল আবিদ।

'কী বললেন? আমাকে কী মনে হয়?'

'রনসন! একটু বকুনি বন্ধ করবেন? কমেডিয়ানের দোষগুণ বিচারের আরও সময় পাবেন,' বললেন গারবার।

'ড. স্মিথ কি রোরিকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারবেন?' ডা. রবার্টসনকে প্রশ্ন করল আবিদ।

'বলতে পারব না, মি. হাসান,' সহজ স্বীকারোক্তি রবার্টসনের, 'তবে আমার বিশ্বাস, স্বাভাবিক মানুষের মত রোরি থাকতে পারবে, যদি সে নিজে সেরকম থাকতে চায়।'

গাড়ি বাড়ির আঙিনায় ঢুকতেই হেডলাইটের আলোয় চিৎপাত ভক্সওয়াগনটা চোখে পড়ল। দুমড়ানো-মোচড়ানো ম্যাভারিক পড়ে আছে একটু দূরে। শিউরে উঠল আবিদ। রোরির কাছে শমিতাকে একা রেখে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। গাড়ি থেকে নেমে স্ত্রীর নাম ধরে চিৎকার করতে করতে ও ঘরের দিকে ছুটল। শমিতার কোন সাড়া নেই।

ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে অন্ধকার। বাতি জ্বেলে আবিদ দেখে নীচের তলার যে ঘরে রোরি ছিল সে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ে আছে মেঝেতে। সবগুলো কামরার আসবাবপত্র তছনছ হয়ে আছে। স্ত্রীর ভাগ্যে কী ঘটেছে ভাবতে গিয়ে দিশেহারা বোধ করল ও। দোতলায় উঠে বেডরুমে গেল। কার্পেটের ওপর বসে দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে বসে আছে শমিতা।

'তুমি ঠিক আছ তো?' উৎকণ্ঠিত আবিদ, 'ও তোমায় জখম করেনি তো? কপালে রক্ত কেন?'

শমিতার সুন্দর টানা টানা গভীর কালো চোখে আগের সেই দ্যুতি নেই, চেহারায় বোবা বিষণ্নতার ছাপ, দৃষ্টিহীন অপলক তাকিয়ে ও উচ্চারণ করে,'কে? আবিদ?'

'হ্যাঁ, আমি। ও কোথায় গেল?'

ক্ষীণ কণ্ঠে বলল শমিতা, 'রোরি? চলে গেছে।'

'জানি গেছে। কিন্তু কোথায় গেল? কী হয়েছে? ও তোমার কী করেছে?'

'কিছুই করেনি,' শান্ত গলায় বলল শমিতা। 'ও বদলে গেছে, আবিদ। ভয়ানকভাবে বদলে গেছে। আমাদের ছেলে পুরোপুরি বদলে গেছে। ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

'মিসেস হাসান কি সুস্থ আছেন?' কামরায় ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলেন গারবার।

'হ্যাঁ, সুস্থই আছে। তবে ভয়ানক শক পেয়েছে মনে হচ্ছে!'

'দেখি!' এগিয়ে গেলেন গারবার।

শমিতা শোবার জন্য খাটের দিকে পা বাড়াল। 'আমি রেস্ট নেব। আমায় একা থাকতে দিন।'

রনসন সব শুনে মুখ হাঁ করে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, 'বিপদের কথা! পুলিশে খবর দিতে হয়।'

'রাখুন তো!' ঝাঁঝিয়ে উঠল আবিদ। 'আমরাই ওকে খুঁজব। পুলিশ তো ওকে পেলে গুলি করবে।'

'কিন্তু ওকে খুঁজে পেলে আমরা কি সামলাতে পারব?' বললেন রনসন, 'পুলিশই পারবে।'

'কী যা তা বলছেন, রনসন!' আপত্তি জানালেন গারবার, 'ভয় পেয়ে ছোট একটা ছেলে পালিয়েছে আর ওর পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবেন? ও কি জেল পালানো দাগী আসামী?'

'তা নয় অবশ্যই। তবে ইয়েন ট্যানারের মত আমরাও তো বিপদে পড়তে পারি!'

'ট্যানারের আবার কী হলো?' প্রশ্ন করলেন গারবার।

'ট্যানার মারা গেছেন,' আবিদ চট করে বলে ফেলল রনসন কোন কথা বলার আগেই। বলেই হুঁশ হলো, গারবার কিছুই জানেন না ট্যানারের মৃত্যু সম্বন্ধে। কথা ঘোরানোর জন্য বলল, 'চলুন বেরিয়ে পড়ি। সবাই মিলে রোরিকে খুঁজি।'

'আচ্ছা, ও কোন দিকে যেতে পারে?' গারবার জানতে চান।

'ও বলত, পরিপূর্ণ ওয়্যারউলফ হলে ও পাহাড়ে চলে যাবে। পাহাড়ের দিকেই রওনা দিয়েছে নিশ্চয়ই।' বলল আবিদ।

'শহরের পশ্চিম দিকে কপলিন রোড হয়ে পাহাড়ে যাবার রাস্তা,' বললেন গারবার, 'একটা হাইস্কুলের পাশ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে।'

'চলুন সেদিকেই যাই,' বললেন রনসন।

'ওয়েট! শমি, তুমি কি যাবে?' স্ত্রীকে প্রশ্ন করল আবিদ।

গারবার বললেন, 'এরকম অবস্থায় ওকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

শমিতা বিছানায় উঠে বসল। হ্যাঁ, সেও যাবে।

রবার্টসন তাগাদা দেন, 'হারি আপ!'

চিৎ হয়ে থাকা ভক্সওয়াগন সোজা করে তাতে উঠলেন গারবার ও রনসন। রনসনের গাড়িতে আবিদ, শমিতা আর রবার্টসন। ঠিক হলো, কপলিনে যাবার যে দুটি রাস্তা আছে, দুটি গাড়ি সে দুটি পথ ধরে এগুবে সাবধানে। পথে রোরিকে পেলে হাইস্কুলের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্য গাড়িটি একবারে হাইস্কুলের সামনে আসবে।

পাঁচজনকে নিয়ে দুটি গাড়ি বের হলো আবিদের বাড়ি থেকে। গাড়ির ভেতর রবার্টসন তার কোটের একটি পকেটে হাত দিলেন। না, চিন্তার কিছু নেই। গুলিভর্তি রিভলবার ঠিকই আছে। তিনি পকেট থেকে হাত বের করলেন না। সতর্ক থাকাই ভাল। মুহূর্তের অসাবধানতায় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

বত্রিশ

রবিন পার্কার জীবনে নানা কিসিমের পেশায় থাকার পর একটু সচ্ছলতার মুখ দেখেছে। গত পাঁচ বছর ধরে সে একটা কনস্ট্রাকশন ফার্মের সাইট ম্যানেজার। বিশ হাজার ডলারে জমি কিনে বাড়ি তুলেছে। বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে নতুন বাড়িতে বসবাস তার চেহারায় এনে দিয়েছে একটা সুখীসুখী জেল্লা। সপ্তাহে দু'দিন সে বাইশ বছর বয়স্কা এক যুবতী সেক্রেটারির সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক মজা করে। ব্যাপারটা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক পার্কারের জন্য খুবই অশোভন বলে মিলন ঘটে অতি গোপনে।

সোমবারের এই সন্ধ্যায় যুবতী সেক্রেটারির সান্নিধ্যেই তার থাকার কথা। কিন্তু সে নিজের বাড়িতেই আছে। পত্রিকা পড়ছে লিভিংরুমে বসে। তুমুল বৃষ্টি আর হিমেল বাতাস; এর মধ্যে ঘরের বাইরে যাওয়ার জো নেই। বৃষ্টির শব্দের জন্যই সামনের বারান্দায় পোষা কুকুরটির নাকের সোঁৎ সোঁৎ আওয়াজ পার্কারের কানে আসেনি।

'বাবা,' মেজ ছেলে মাইক বলল, 'মেরি কী যেন শুঁকছে।'

পত্রিকা ভাঁজ করে কান খাড়া করল রবিন। ছেলে ঠিকই বলেছে। পোষা মাদী কুকুর মেরি পাহারাদার হিসেবে সুবিধের নয়; আগন্তুক দেখলে ঘেউ ঘেউ করার বদলে সে আগন্তুকের শরীর চেটে দেয়। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের অপেক্ষায় থাকল রবিন।

কোন শব্দ শোনা গেল না।

মেরি মিনিট দুয়েক কোঁ কোঁ করে শব্দ করল। তারপরই হঠাৎ যন্ত্রণায় কাতরানোর মত টানা আওয়াজ করতে লাগল। এরপর আর কোন সাড়া নেই। 'ওর কী হলো!' বলেই দরজা খুলতে ছুটছিল মাইক।

'যেয়ো না, মাইক,' আদেশ করল রবিন। বিশালদেহী মেরিকে এত তাড়াতাড়ি যে স্তব্ধ করে দিয়েছে সে নিশ্চয়ই আকারে আরও বিরাট হবে। তাই রবিন নিজেই এগিয়ে গেল। দরজা খুলেই সে একটা ধাক্কা খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। তার বুকে মেরি। বিস্ময়ে বিমূঢ় রবিন স্পষ্ট দেখেছে লোমশ শরীরের কিছু একটা তাকে ধাক্কা মেরেছে।

'মেরি!' চিৎকার দিল রবিনের বড় ছেলে জুলিয়াস।

নিষ্প্রাণ কুকুরটি এখন রবিনের কোলে; তার মাথাটা ফেটে চৌচির। রক্তাক্ত। সামনের দু'পা ভাঙা।

'মাই গড!' উঠল রবিন। 'হায় হায়, কে এমন করল রে!'

তার স্ত্রী ও মেয়ে ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। মেরির দশা দেখে তারাও আফসোস করতে লাগল।

'কী হলো, ড্যাড?' ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মেয়ে সুজান।

'কুকুরটাকে কেউ মেরে ফেলেছে!' রবিন আবার ছুটে গেল দরজার কাছে। বারান্দায় মিটমিটে আলো। আঙিনায় বৃষ্টির পানি জমছে। ভাল করে এদিক-ওদিক দেখল সে। না, কেউ নেই। কিন্তু তার কুকুরকে মেরে কেউ লুকিয়ে আছে, ভাবতেই জ্বলুনি বাড়তে থাকে শরীরে।

বারান্দা থেকে আবার ঘরে ঢুকতে যাবে রবিন এমন সময় কিচেন থেকে ভেসে এল মেয়েলী গলার ভয়ার্ত চিৎকার। কিচেনে ঢুকল সে ঝড়ের বেগে এবং দেখল পেছনের ভাঙা দরজা দিয়ে লাফ মেরে পালাচ্ছে সাদা একটি প্রাণী। প্রাণীটির থাবায় আস্ত

একটা শুয়োরের রান আর দুধের জগ।

'রবিন। এটা দরজা ভেঙে ফেলেছে। ফ্রিজও ভেঙেছে। এমন জোরে ঢুকেছে যে...'

স্ত্রীকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রবিন পার্কার। এক এক লাফে প্রায় দশ ফুট দূরত্ব পেরুচ্ছে প্রাণীটি। কিচেনের পেছনের উঠোনে বেশ পানি। এর মধ্যে কয়েক লাফে জায়গাটা পার হয়ে গেল ওটা। রবিন রাগে গরগর করতে থাকে।

'মাইক!' চিৎকার করে সে, 'আমার শটগানে গুলি ঢোকাও। জলদি। সুজান, তুমি পুলিশে খবর দাও। বলবে বিরাট এক বনবিড়াল ঘরে ঢুকে আমাদের আক্রমণ করেছে।'

রাগে আর ঘৃণায় রবিনের চোখ জ্বলছে। বৃষ্টি আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে অনুপ্রবেশকারীর ওপর দারুণ খেপে যায়। প্রাণীটাকে আজ রাতের মধ্যেই খতম করবে শপথ নেয় সে।

তেত্রিশ

রনসন যে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন মাঝপথে তার ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিল। তিনি বনেট খুলে দেখছিলেন। এমন সময় আরেকটি গাড়ি এসে থামল পাশে। এক যুবক ড্রাইভ করছে গাড়িটি, পেছনের সিটে সুন্দরী এক যুবতী। রনসন চিনলেন, ইভ টমাস।

এবং বকবকানির অভ্যাসবশে ফাঁস করে দিলেন সব। ইভ বয়ফ্রেণ্ডকে ফেলে রেখে ঝট করে রনসনের গাড়িতে উঠে বসল। ওয়্যারউলফ পাকড়ানোর অভিযান প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

ইভের বয়ফ্রেণ্ডের সহায়তায় রনসনের গাড়ির ইঞ্জিন সচল হলো। ইভের দুঃখ, এমন একটা মুহূর্তে মুভি ক্যামেরা সঙ্গে নেই। রনসনের আনন্দ, সুন্দরী ইভ তাঁর পাশের সিটে বসেছে।

'মিসেস হাসান খুব ভেঙে পড়েছেন কি?' ভেজা রাস্তার দিকে সতর্ক চোখ রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে রনসন ডা. গারবারের অভিমত জানতে চাইলেন।

'ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক,' পেছনের সিটে বসা গারবার বলেন, 'আদরের ছেলে পর হয়ে গেলে কোন্ মা কষ্ট না পায়? এরকম পরিস্থিতিতে মহিলা মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলতে পারেন।'

'ইস্-স্-স্,' আফসোস করেন রনসন, 'সুন্দরী মহিলাদের দুঃখী চেহারা আমাকে উতলা করে ফেলে। শমিতা দারুণ সুন্দরী। ইভ, কিছু মনে করলেন না তো?'

'মনে করার কী আছে!' বলল ইভ, 'সুন্দরকে সুন্দর বলা তো অপরাধ নয়। আপনিও তো বেশ সুদর্শন।'

লজ্জায় লাল হয়ে রনসন বললেন, 'না, ইয়ে...মানে বলছিলাম কি, শমিতা এখনও তরতাজা, সুইট। আবিদ হাসানও প্রাণবন্ত স্বামী। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা না জানি নস্যাৎ হয়ে যায়। বিশেষ করে ইয়েন ট্যানারের যে দশা রোরি করেছে, তাতে...

'ট্যানারকে রোরি কী করেছে?' জানতে চাইল ইভ।

'খবরের কাগজে লিখেছে ট্যানারকে দুর্বৃত্তরা খুন করেছে। আসল ঘটনা তা নয়। আবিদেরই বাড়িতে রোরির হাতে মারা গেছেন ট্যানার।'

'বলেন কী!' একসঙ্গে ইভ ও গারবার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

এক ধরনের বিকৃত আনন্দ যেন ফুটে উঠল রনসনের কণ্ঠে, ‘রোরি তার সেই মানসিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল যাকে বলে সাইকোকাইনেসিস। এবং তা-ই দিয়েই সে ট্যানারের করোটির ভেতরেই মগজ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।’

‘আপনার মগজেই গোলমাল আছে!’ ঠেস দিয়ে বললেন গারবার।

‘না। সত্যি বলছি। ঘটনার সময় আমি ওখানে ছিলাম।’ বললেন রনসন, ‘ট্যানারের গলিত মগজ কান দিয়ে বেরুতে দেখে আমার বমি এসে গিয়েছিল।’

‘তা হলে ছোট্ট ছেলে রোরি একটা খুনী?’ ইভের প্রশ্ন।

‘হত্যা করেছে ও আত্মরক্ষার জন্য। বলতে ভুলে গেছি, আক্রান্ত হবার আগে ট্যানার আগুন ধরিয়ে দেন রোরির গায়ে।’

‘ট্যানার পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন রোরিকে?’ জিজ্ঞেস করল ইভ।

‘মেরেও ফেলেছিলেন প্রায়। ছেলেটার শরীরের বাম দিক পুরোটাই ঝলসে গিয়েছিল।’

‘তা হলে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন না কেন?’

নিজের চোখে দেখেছেন তবু ইভের প্রশ্নের জবাবে যা বললেন তা তাঁর নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললেন, ‘রোরি নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যেই তার চামড়া, চুল, সবকিছু আবার পুড়ে যাবার আগের অবস্থায় চলে এসেছে।’

কথাটা বিশ্বাস করলেও গারবারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘মাই গড! ছেলেটা তা হলে কী?’

সার্জেন্ট উইলিয়াম অ্যালান। বয়স একান্ন। সাতাশ বছর ধরে পুলিশ বাহিনীতে কাজ করছে। চার বছর পর অবসর নেবে। দোহারা গড়নের অ্যালান নম্রভাষী, আইন প্রয়োগে কঠোর

পরিশ্রমী। বড়কর্তারা তাকে সুনজরে দেখেন। একবার ছুটিতে থাকাকালে সে একটা ভুল করেছিল; ব্যাপারটা জানাজানি হলে তার চাকরি যেত। অ্যালান সেবার গাঁজা খেয়েছিল।

শীত শীত হাওয়া আর বৃষ্টিঝরা আজকের রাতে তার সঙ্গে হাইওয়েতে ডিউটি করছে তরুণ অফিসার পল। বয়স সাতাশ। একরোখা, জেদী। ধর্ষণকারী সন্দেহে একবার এক কৃষ্ণাঙ্গকে পিটিয়ে আধমরা করেছিল। ছেলেটি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর পলের চাকরি যায় যায় অবস্থা। অনেক কষ্টে রক্ষা পেয়েছে।

পল আর অ্যালান বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য তিনজনকে জরিমানা করে কন্ট্রোলরুমের দিকে রওনা দিয়েছিল পেট্রোল কারে। পথে সেলুলার ফোন বেজে উঠল। নির্দেশ এল: 'রবিন পার্কারের বাড়ি যাও। তার কী সমস্যা হয়েছে দেখে সেভাবে ব্যবস্থা নাও।'

ওরা রবিনের বাড়ি চলে এল। রবিন সব ঘটনা খুলে বলল। জানাল জানোয়ারটিকে সে খুঁজেছে অনেকক্ষণ। তার বাড়ির দশ গজ দূরে হাইস্কুলের জিমনেশিয়ামে জানোয়ারটি লুকিয়ে আছে বলে তার ধারণা। কারণ ওখান থেকে অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ সে শুনতে পেয়েছে।

'জিমনেশিয়ামে তো রাতে তালা লাগানো থাকে।' বলল সার্জেন্ট অ্যালান।

'তা জানি। কিন্তু ভেতরে কিছু একটা ঢুকেছে। নইলে ওরকম আওয়াজ শুনব কেন?' ওদিকে যাবার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে রবিন।

বিরক্ত হয়ে পল তাকাল অ্যালানের দিকে। প্রধান সার্জেন্ট মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়, 'দেখা যাক ওদিকটা। গাড়ি থেকে শটগান নিয়ে আসব, স্যর?'

'নাহ দরকার নেই,' রবিনের হাতের শটগানের দিকে তাকিয়ে বলল পল, 'বনবিড়াল জাতীয় কিছু হলে সামলাতে আমাদের কোন

অসুবিধাই হবে না।'

পেট্রোল কার এসে থামল জিমনেশিয়ামের সামনের রাস্তায়। গাড়ি থেকে নামল রবিন, পল ও অ্যালান। গাড়ির আলোর ফ্ল্যাশার জ্বলতে থাকল। ওরা তিনজন রওনা দিল জিমনেশিয়ামের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দরজার সামনে চলে এল।

সদাসতর্ক পল লক্ষ করল, জিমনেশিয়ামের ধাতব দরজার শিকল ভাঙা। লোহার মোটা শিকলের সঙ্গে তালা ছিল। তা ভেঙে ফেলে ভারী দরজা ফাঁক করে কেউ ভেতরে ঢুকেছে। দরজাটা তিনজনে মিলে খুলল। পিস্তল উঁচিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকল পল। বলল, 'মি. পার্কার, আপনি দূরে থাকুন, ঝামেলা হতে পারে।'

রবিন নিজের শটগান দেখিয়ে বলল, 'আমি রেডি আছি।'

অ্যালান তার অফিসারের পাশে দাঁড়াল অস্ত্র হাতে। পল হাঁক ছাড়ল, 'এই! কে লুকিয়ে আছ? জলদি বেরোও। আমরা পুলিশ। খালি হাত মাথার ওপর তুলে বেরিয়ে এসো।'

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। এক মিনিট। দুই মিনিট। কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ নেই।

'আমি বলেছি মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।' আবারও বলল পল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অ্যালান তার টর্চ লাইট জ্বালল। ঘরের এদিক ওদিক আলো ফেলল। কিছুই নজরে পড়ল না। বিরাট ঘর। ফ্লাডলাইট ছাড়া একসঙ্গে গোটা ঘরের সবকিছু দেখা অসম্ভব! অ্যালান টর্চ লাইটের আলো সারা ঘরে ফেলতে থাকে।

রবিন পেছন থেকে বলল, 'কী মনে হয় আপনাদের ভেতরে কেউ নেই?'

'মি. পার্কার, আবার একটু বলুন তো জানোয়ারটা দেখতে কেমন ছিল?' জানতে চাইল পল।

অ্যালান হাত ইশারায় বলল, কিছু বলতে হবে না। একটা কিছু তার নজরে পড়েছে। ঘরের উত্তর প্রান্তে বাস্কেট বল কোর্টের কাছে মেঝেতে একটা খালি কাঁচের জগ। দুধের জগ। জগের আশেপাশে আলো ফেলল সে। বাস্কেট-এর খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে জানোয়ারটা শুয়োরের রান কামড়ে খাচ্ছে।

'পেয়েছি এবার ওটাকে,' শটগান উঁচিয়ে খুশিতে বাগবাগ হলো রবিন। কিন্তু ওকে বাধা দিল অ্যালান। কারণ, অপর্যাপ্ত আলোয় জানোয়ারটা কী তা ঠাহর করা যাচ্ছে না। বনবিড়ালের মতই, কিন্তু পশমগুলো সাদা কেন?

'বনবিড়াল তো মনে হচ্ছে না। ভল্লুক নাকি?' জিজ্ঞেস করে পল।

'আরও আলো দরকার, স্যর। সুইচ বোর্ডটা কোন্ দিকে?' অ্যালান জিজ্ঞেস করে। দরজার পাশের দেয়ালে টর্চের আলো ফেলতেই বোর্ড চোখে পড়ল। পল সুইচ টিপতে গেলে টর্চ লাইট নিভিয়ে ফেলল অ্যালান।

সুইচ টিপতেই আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। হতভম্ব হয়ে গেল অ্যালান। পোল-এর খুঁটির কাছে কিছু নেই। জানোয়ার উধাও।

'আরি! তাজ্জব কাণ্ড!' চমকে ওঠে রবিন।

'ওটা হাওয়া হয়ে গেছে, অ্যালান!' বিস্মিত পল বলল।

'জেন্টলমেন,' একটা নরম কণ্ঠস্বর ভেসে এল, দরজার ডানে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে, 'আমি সব দেখতে পাচ্ছি।'

অ্যালান টর্চ নিভিয়েছে আর পল সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়েছে, সাকুল্যে লেগেছে কয়েক সেকেণ্ড সময়, এরই মধ্যে উত্তর প্রান্ত থেকে প্রায় সত্তর ফুট দূরে দক্ষিণ প্রান্তের দেয়াল বরাবর একটা বেঞ্চিতে এসে বসেছে প্রাণীটি এবং কথা বলছে।

'শালার বানর!' রাগে গরগর করতে করতে রবিন শটগান তাক করল।

'পার্কার! গুলি করবেন না। ওটা মানুষ... চিৎকার করল উইলিয়াম অ্যালান। রবিন ততক্ষণে ট্রিগার টিপে ফেলেছে।

প্রাণীটি চোখের পলকে বেঞ্চ থেকে লাফ মারল প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙের মত। গিয়ে পড়ল প্রায় ত্রিশ ফুট দূরের মেঝেতে। রবিনের গুলিতে বেঞ্চের একটি অংশ উড়ে গেছে, বুলেট লেগেছে দেয়ালে। তিনজনই ভ্যাবাচ্যাকা খায়। রবিন আবার গুলি করার আগেই শটগান কেড়ে নিল অ্যালান।

'আরে, বোকা! ওটা মানুষ!' বলে সে বিভ্রান্ত রবিনকে। তার কথা শেষ হতে না হতেই কানে ভেসে এল পিস্তলের গুলির শব্দ। জেদি, একরোখা পুলিশ অফিসার পল একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে আর প্রকাণ্ড ব্যাঙের মত লাফ মেরে মেরে প্রাণীটি জায়গা বদল করছে। তার গায়ে কোন গুলিই লাগছে না।

চৌত্রিশ

ড্রাইভ করছে আবিদ, গাড়িতে রয়েছে শমিতা ও রবার্টসন। পেছনের গাড়িতে রনসন, গারবার ও ইভ। হাইস্কুলের সামনে পুলিশের গাড়ি, ফ্ল্যাশার জ্বলছে। ব্যাপার কী? আবিদ ব্রেক কষে। রনসনও গাড়ি থামালেন।

দুর্ঘটনার কোন আলামত নেই, এত রাতে শহর থেকে দূরে পুলিশের গাড়ি কেন? তবে কি রোরি এখানে? আবিদ আর রবার্টসন গাড়ি থেকে নামলেন। শমিতা চুপচাপ বোবার মত উদাস,

ভেতরেই বসে রইল। জিমনেশিয়ামের খোলা দরজার দিকে এগোল আবিদ। ওখানেই তার ছেলে, ওকে বাঁচানোর জন্য সে দরকার হলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে।

আবিদকে অনুসরণ করেন রবার্টসন, গারবার, রনসন ও ইভ। পিস্তলের ঘন ঘন গুলির আওয়াজ শুনে পাঁচজনই চমকে ওঠে। জিমনেশিয়ামে ঢুকে আবিদ দৃশ্যটা দেখে—দুই পুলিশ এবং আরেকটা লোক তার ছেলেকে কোণঠাসা করে রেখেছে। কমবয়সী পুলিশটা রোরিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। আর রোরি লাফিয়ে লাফিয়ে পিস্তলের টার্গেট ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

সার্জেন্ট অ্যালান তার অফিসারকে, 'আর নয়, স্যর, আর নয়, স্যর,' বলে থামাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পল ক্রমাগত ট্রিগার টিপেই চলল। রোরি হি হি করে হাসছে পাগলের মত এবং হাসতে হাসতে লাফ মেরে পুলিশ অফিসার পলের কাঁধে উঠে তাকে চেপে ধরল মেঝের সঙ্গে। অফিসারকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল অ্যালান। প্রকাণ্ড এক টুকরো কাঠ দিয়ে বাড়ি মারল রোরির পিঠে।

'থামুন!' চিৎকার করল আবিদ। রোরি তখনও উপুড় হওয়া পলের পিঠে বসে আছে। অ্যালান আবার বাড়ি মারতে যেতেই রোরি পেছনে না তাকিয়েই ঘুষি ছুঁড়ল। ঘুষি খেয়ে দশ ফুট দূরে ছিটকে গেল অ্যালান, ফুসফুস থেকে সব বাতাস যেন বেরিয়ে গেল ভুস করে। এদিকে রবিন অবিরাম মুষ্ট্যাঘাত করে চলছিল রোরিকে।

আবিদ আরেকটু এগিয়ে গেল। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন রনসন, গারবার ও ইভ। কাপড়ের পুটুলী ছুঁড়ে ফেলার ভঙ্গিতে রবিনকে ছুঁড়ে মারল রোরি। লোকটা বাড়ি খেল আবিদের গায়ে। ওকে নিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল আবিদ। চোট পেল বুকে। ওর গায়ে চিৎ হয়ে রয়েছে রবিন।

পল হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল, মুখ থেকে রক্ত ঝরছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটি তুলে নেয়ার জন্য উবু হলো। রোরি এক হাতে পুলিশ অফিসারের ঘাড়, অন্য হাতে এক পা ধরে মাথার ওপরে ঝট করে তুলে নিল। তারপর তার পিঠের মাঝ বরাবর হাঁটু দিয়ে গোত্তা দিল। প্রচণ্ড ব্যথায় অঁ আঁ করে উঠল পল। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ওই অবস্থায় মেঝেতে তাকে ছুঁড়ে ফেলল রোরি।

এদিকে অ্যালান আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। পিস্তল তাক করল সে। ছুঁড়ল গুলি। চকিতে সরে গেল রোরি। অদ্ভুত হাসি মুখে। অ্যালান আবারও গুলি চালায়। কিন্তু সে যেন কোন ছায়াকেই গুলি করছে। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল রোরি। অত্যন্ত দ্রুত পরপর কয়েকটা ভয়ানক ঘুষি মারল ও অ্যালানের পেটে। লোকটা ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। রবিনের ঘাড় ভেঙে গেছে; সে ওই অবস্থায় পড়ে ছিল আবিদের বুকের ওপর। তাকে ঠেলে সরিয়ে কোনরকমে উঠে বসতে বসতে আবিদ হাঁক দিল, 'থামো, রোরি। থামো বলছি!'

রোরি থামল না। ও এবার পলকে লাথি মারতে গেল।

স্টিফেন রনসন ও জ্যাক গারবার ভাবলেন পুলিশ অফিসারকে রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য। আর সেখানেই মারাত্মক ভুল করে বসলেন তাঁরা। গারবার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন রোরিকে, 'রনসন! ওর পা ধরে টান মারুন।'

রনসন কিছু করার আগেই রোরি সক্রিয় হলো। কনুইয়ের গুঁতো মেরে গারবারের অণ্ডকোষ দিল থেঁতলে। রোরিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি দম বন্ধ করে বসে পড়লেন মেঝেতে। রোরি প্রচণ্ড রদ্দা মারল গারবারের ঘাড়ে, তিনি চিৎকার করে উঠলেন অসহ্য ব্যথায়; কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না গলা দিয়ে। সংজ্ঞা হারালেন বিনা বাক্য ব্যয়ে।

'সুইট হোলি জেসাস!' চোখ ছানাবড়া আর্তনাদ করলেন ভয়ার্ত রনসন। চোখের সামনে যা ঘটছে তা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে

তাঁর।

আবিদ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই চিৎ হয়ে পড়ে গেল। খাড়া হবার শক্তি নেই গায়ে। সে চিৎকার করল, 'রবার্টসন! রবার্টসন! ওকে থামান প্লিজ!'

রবার্টসন যেন সম্মোহিত। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ওয়্যারউলফের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার দিকে। রোরি এবার ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে ইভের দিকে কদম বাড়াল। মেয়েটার দেহরক্ষীর ভূমিকায় নামলেন রনসন; ঝাঁপিয়ে পড়লেন রোরির ওপর। কিল, ঘুষি, লাথি সমানে চালাতে থাকলেন। রোরি রনসনকে ছোট শিশুর মত পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ভলিবলের মত দূরে ছুঁড়ে মারল। তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন ত্রিশ ফুট দূরে একটি বেঞ্চের ওপর। বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে, অজ্ঞান।

রবার্টসন পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাক করলেন। আবিদ যেখানে শুয়ে, তার খুব কাছেই রবার্টসন। তিনি ট্রিগার টিপবার আগেই রোরি চকিতে এদিকে ফিরল। তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল আগ্নেয়াস্ত্র। রোরি প্রয়োগ করছে সাইকোকাইনেসিস। রবার্টসন চমকে ওঠারও সুযোগ পেলেন না, ঠাস করে তাঁর মাথাটা আছড়ে পড়ল মেঝেতে, আর কোন সাড়া নেই।

রবার্টসনের পিস্তল পড়ে ছিল শুয়ে থাকা আবিদের ফুট তিনেক দূরে, তুলে নিতে সে হাত বাড়াল। এমন সময় তার দিকে এগিয়ে এল রোরি, 'বাবা, তা হলে এবার তোমার পাওনা মিটিয়ে দিই।'

পঁয়ত্রিশ

বিভ্রান্ত আবিদ উপুড় অবস্থায় মাথা তুলে ছেলের দিকে তাকাল। তার মুখে প্রচণ্ড ঘুষি মারল রোরি। চোখে সর্ষে ফুল দেখল আবিদ। চক্কর দিচ্ছে মাথা, সবকিছু ধোঁয়াশা ঠেকল। তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবিদ ভাবল আমি কি বেঁচে আছি? জিমনেশিয়ামের বাল্বগুলো জ্বলছে। রক্তাক্ত পুলিশ অফিসার পল গোঙাচ্ছে, 'গড! নো, প্লিজ...' ইভ টমাস, না? হ্যাঁ, তাই। তাকেও আঘাত হেনেছে রোরি। মেয়েটা বেহুঁশ। রনসন, রবিন, গারবার ও রবার্টসন এরাও শুয়ে আছে। ওরা কি মরে গেছে? বুঝতে পারল না আবিদ।

'খুব লেগেছে, না? কেমন লাগছে, আবিদ?'

প্রশ্নকর্তার দিকে তাকানোর জন্য আবিদ অনেক কষ্টে উঠে বসল। রোরি বসে আছে উবু হয়ে, গায়ে কাপড় নেই, বড় বড় সাদা পশমে গা ঢাকা। ওর নাক থ্যাবড়া, ভুরু মোটা, বড় বড় চোয়াল। মানুষ আর জানোয়ারের মাঝামাঝি একটা প্রাণী।

'তোমাকে অতটা জোরে মারতে চাইনি আমি, বাবা। ওদেরকেও মারতে চাইনি। বিশ্বাস করো।'

'রোরি!' ফিসফিসিয়ে বলে আবিদ, 'রোরি, তা হলে কেন

ওদের এমন করলে?'

'ওরা আমাকে আক্রমণ করেছিল। আত্মরক্ষা করতে ওদেরকে আমি পাল্টা মার দিয়েছি।'

মাথা তখনও ঘুরছিল, তবু নিজেকে শক্ত রেখে আবিদ বলল, 'তুমি ওদেরকে মেরেই ফেললে?'

রোরির গলা অন্যরকম হয়ে যায়, বেদনার সুরে বলল, 'পুলিশের ওই দুটো লোক, আর ওই রবিন এবং ডা. গারবার মরে গেছে। অন্যরা বেঁচে যাবে...ওদের ভাগ্য ভাল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রোরি আবার বলল, 'একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি, আবিদ। আমাকে তো বাঁচতে হবে, না? আমরা ওয়্যারউলফরা আমাদের প্রকৃতির সামান্যতম পরিচয় দেয়ামাত্র খুন হয়েছি, শতাব্দীর পর শতাব্দী খুন হয়েছি। আমার আসল বাবা-মাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এখন আমাকেও খুন করতে চায়। কিন্তু আমি ওয়্যারউলফদের মধ্যে অনেক শক্তিধর। আমাকে থামাবার কোন সুযোগ কাউকে দেব না। আমি চলে যাব আমাদের সমাজে। ওখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করব। আমাদের ভবিষ্যৎ!'

'তা হলে তুমি এখানে এলে কেন?' প্রশ্ন করল আবিদ।

হাসল রোরি। সত্যিকারের হাসি, ঠাট্টার হাসি নয়। 'তুমি ঠিক আছ এটা জানার জন্যই বসে আছি আমি। বখে যাওয়া শিশুর মত তোমায় মেরেছি, বাবা। তবু এ দুনিয়ায় তোমাকে আর মাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। তোমাদের মনে কখনোই আমি দুঃখ দিতে চাইনি। কিন্তু, আমার নতুন শক্তিকে সামাল দেয়ার মানসিক বল নেই, তাই উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেললাম।'

আবিদ একটু নড়ে বসল। হঠাৎ হাতের নাগালে পেল রবার্টসনের পিস্তল। 'এখন কী করবে ঠিক করেছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি চলে যাব। খিদে পেয়েছে বলে আমি ওই বাড়িতে ঢুকেছিলাম। ওখানে যাওয়া উচিত হয়নি আমার,' বলল রোরি। 'জানি না নতুন জায়গায় গিয়ে খিদে মেটাব কীভাবে। তবু যেতেই হবে।'

হাইস্কুলের পাশে জঙ্গলময় পাহাড়ের দিকে হাত ইশারা করল রোরি। 'ওখানে হাইব্রিড ওয়্যারউলফরা জড়ো হবে। আমি ওদের নেতা হতে পারি। সবাই মিলে ঠিক করব কী করতে হবে। লড়াই, সংগ্রাম বা আত্মগোপন একটা কিছু করব আমরা। মানুষ খুব হিংস্র, নৃশংস। এজন্য ভেবেচিন্তে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।'

'অমন কোরো না, রোরি,' বলল আবিদ। মায়ের মৃত্যুর পর সাবালক বয়সে এই প্রথমবার সে কাঁদছে, 'ফিরে এসো আমাদের বুকে। তুমি আগের মত হয়ে যাও। হতে পারো না?'

হাইব্রিড মাথা ঝাঁকায়। হ্যাঁ, ও পারে।

'তা হলে তা-ই করো। স্বাভাবিক হয়ে যাও।'

'এদের কী হবে?' মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে রোরি বলল। 'ইয়েন, রুখসার এবং গারবার, এদের পরিবার?'

'রবার্টসন প্রভাবশালী লোক। তিনি সব বন্দোবস্ত...'

'তুমি সত্যিই কি মনে করো তিনি আমায় রক্ষা করবেন? পারবেন না। স্নেহান্ধ হয়ে কত কিছু ভাবছ তুমি। বাস্তব বড় নিষ্ঠুর, বাবা।'

'তুমি তা হলে চলেই যাবে? আমাদের কষ্টের কথা একটুও চিন্তা করবে না?'

'তোমাদের কষ্ট আমি বুঝি, বাবা। কিন্তু উপায় নেই। আমি স্বাভাবিক হলেও লোকে আমায় ছাড়বে না। আমিও ছাড়ব না। তুমি আবার ঝামেলায় পড়বে। তা আমি চাই না।'

'তুমি কি লুসি নামের মেয়েটাকে মেরে ফেলেছিলে?'

'না। ওই ফুলের মত নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটাকে কেন মারব? ও নিজেই শিকলে আটকা পড়েছিল।' বলে সিধে হলো রোরি, 'বাবা, একটা অনুরোধ করছি। মাকে বোলো, তাকে আমি ভালবাসি। বলবে, কথা দাও।'

'কথা দিলাম,' কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর আবিদের।

খোলা দরজার দিকে ধীর পায়ে এগোয় রোরি, 'গুডবাই, বাবা।'

'গুডবাই, রোরি।'

ছত্রিশ

আবিদ তাকিয়ে থাকে রোরির গমনপথের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে পিস্তলের কথা। [illegible] বাড়িয়ে সে [illegible] তুলে নেয়। তাক করতেই রোরি ঘুরে দাঁড়ায়, 'ট্রিগার [illegible] আগেই আমি তোমার ঘাড় মটকে দিতে পারি, জানো?'

তবু আবিদ তাক করে রইল। কী করবে ভেবে পেল না।

'আবিদ, এত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই তোমার হাত থেকে পিস্তল ফেলে দেয়ার মানসিক ক্ষমতা আমার আছে,' বলল রোরি। 'আমি চলে যাচ্ছি, তাই তোমার আর কোন ক্ষতি করতে পারি [illegible]।' হাঁটতে শুরু করে ও।

ট্রিগার টিপল আবিদ। বুলেটে বিদ্ধ হলো রোরির ডান কাঁধে। হাঁটু ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। আবিদের দিকে ফিরে স্থির

দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমায় গুলি করলে, বাবা!'

আবার মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে এগোল রোরি। আবার গর্জে ওঠে পিস্তল।

এবার গুলি লাগল হাইব্রিডের পিঠের বাম পাশে। রোরি লাফিয়ে উঠল প্রায় ছাদ পর্যন্ত, তীব্র চিৎকারে গোটা জিমনেশিয়াম কাঁপছে। বাল্বগুলো একটা একটা করে ফাটতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিকষ আঁধারে ঢেকে গেল জিমনেশিয়াম। তবু রোরির আর্তচিৎকার থামে না।

অন্ধকারে আবার গুলি চালাল আবিদ। গুলি লাগল কিনা বুঝতে পারল না। ওদিকে রোরি অবিরাম চিৎকার করেই চলেছে। কান ফেটে যাওয়ার দশা আবিদের। বাম কানে হাত চেপে ধরে ও। টের পেল ডান কানের পর্দা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে

'চিৎকার থামাও!' পাগলের মত হাঁক দিল আবিদ

চতুর্থ বুলেট লাগল রোরির বুকে। এবং গা হিম হয়ে এল আবিদের। বুলেটবিদ্ধ রোরির শরীর থেকে লাল নীল সবুজ হলুদ ধোঁয়াটে আলো বেরুচ্ছে। আবিদ ভয়ে শেষ দুটি বুলেট খরচ করে ফেলল, 'হায়, আল্লাহ্! এবার আমি কী করব?'

হরেক রকম আলোর মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে রোরি মেঝেতে পড়ে গেল। আবিদ অস্ফুটে বলল, 'এ আমি কী করলাম। ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য খুনই করে ফেললাম!'

কিন্তু একী! এক মিনিটের মধ্যে রোরি উঠে দাঁড়িয়েছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তারপর হি হি করে হেসে হাঁটা ধরল। আবিদ দেখল রোরি দরজা পেরিয়ে চলে গেল।

সাঁইত্রিশ

কিছুক্ষণ পরে আবিদের শরীর কিছুটা হালকা হয়ে এল। ও উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল অসুস্থ বৃদ্ধের মত। রোরির কথা ভাবছিল। ছেলেটা কি পাহাড়ে গিয়েই মরে যাবে?

দরজা পেরিয়ে বাইরে এল আবিদ। পুলিশের গাড়ির ফ্ল্যাশার জ্বলছে। আকাশে বিষণ্ন চাঁদ। জিমনেশিয়ামের সামনের মাঠে পানি জমেছে। জানালা খোলা। মুখ বাড়িয়ে আছে শমিতা। মুখে স্মিত হাসি। ভুল দেখছে না তো আবিদ?

'আবিদ,' বলল শমিতা। 'তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায়?'

'ওরা ভেতরে,' জবাব দিল আবিদ। বিহ্বলতা কাটে না তার, 'সাহায্য করতে হবে ওদেরকে।'

শমিতা স্বামীকে দেখছে, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। জিমনেশিয়ামের ভেতরে এতক্ষণ কী ঘটেছে শমিতা কল্পনাও করতে পারবে না—মনে মনে ভাবে আবিদ।

'রোরি ঠিক হয়ে গেছে। হি ইজ অলরাইট নাউ।' বলল শমিতা। 'সে আগের মত হয়ে গেছে। গায়ে কোন পশম নেই।'

কথাগুলো শুনে ঠাণ্ডা হয়ে গেল আবিদ, 'কী বললে?'

'ও আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কী দারুণ ব্যাপার!'

'এ হতে পারে না, শমি। তুমি ভুল দেখেছ।'

চুপ করে রইল শমিতা।

'এটা অসম্ভব, শমিতার। ওর শরীরে অনেক বুলেট লেগেছে। ও বেঁচে থাকতে পারে না!'

'কী যা তা বকছো! ওকে আমি দেখেছি। আমার চোখের সামনে দিয়েই ও পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেল।'

আবিদ তার গাড়ির ছাদের ওপর মাথা নামাল। কী দেখল সে আর কী শুনছে! শমিতার মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে নাকি?

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল আবিদ। কাছেই পাহাড়। সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ রোরির আর্তচিৎকার ভেসে আসছে যেন। না, চিৎকার নয়। বাতাসের শব্দ।

'রোরি, যেখানেই থাকো ভাল থেকো।' প্রার্থনা করে আবিদ।

মার্চের সেই রাতে, জিমনেশিয়ামে যা ঘটেছে তার কিছুই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। প্রমাণিত সত্য হিসেবে একটা খবরই সবাই মেনে নেয়, সেটা হলো: দু'জন পুলিশ, স্থানীয় এক ভদ্রলোক এবং প্রখ্যাত এক চিকিৎসক মারা গেছেন। আর জখম হয় পাঁচজন। একজন নিখোঁজ...আট বছরের একটি ছেলে।

পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত করেছে। জিমনেশিয়ামের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী এলাকায় সন্ধান চালিয়েছে, রোরি হাসানের কোন খোঁজ পায়নি। আহত ব্যক্তিরা চিকিৎসার পরে সেরে উঠেছে। পুলিশ তাদের তদন্ত রিপোর্টে বলেছে এক অদ্ভুত জানোয়ার তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। রোরি হাসানকে ওই জানোয়ার পাহাড়ে ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত ছেলেটি মরে গেছে বলে পুলিশের ধারণা।

মে মাসের মধ্যে এলাকার লোকজন মার্চের সে ঘটনার কথা ভুলে গেল। তবে দুষ্ট খোকাখুকিদের ঘুম পাড়ানোর জন্য মায়েরা রাতের বেলায় মাঝে মধ্যে অদ্ভুত সেই জানোয়ারের কেচ্ছা বলে। জুন মাসে আবিদ হাসানের বাড়ির অদূরে এক বাড়ি থেকে জনৈক

মহিলার গলিত লাশ পুলিশ উদ্ধার করল। তবে কীভাবে তার মৃত্যু হলো তার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

আগস্ট মাসে রোরির ন'বছর বয়স হবার কথা। সে মাসে নিউ ইয়র্কে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা এক মহিলা তার এক এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করল। মেয়েটির নাম রোলি। রোলিকে কেন হত্যা করা হলো তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা ওই মহিলা দিতে পারেনি।

সুন্দরী ইভ সেপ্টেম্বর মাসে তার এক বয়ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে ওয়াশিংটন চলে গেল। ইয়েন ট্যানারের অসমাপ্ত প্রবন্ধগুলো সে সঙ্গে নিয়ে গেলেও কী মনে করে পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলল। স্বামী কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'এগুলো বই আকারে ছাপলে লোক ভাববে আমার মাথায় ছিট আছে।'

শমিতা ও আবিদ হাসান তাদের বিরাট বাড়িতে বাস করেছে কয়েক মাস। আবিদ বাড়ি বদলের জন্য বারবার চাপ দিয়েও স্ত্রীকে রাজি করাতে পারেনি। শমিতার বিশ্বাস তার ছেলে তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু আবিদের ধারণা তার গুলিতে রোরি মরে গেছে। তবু মাঝে মধ্যে তারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে ছেলেটি বেঁচে আছে। ডিসেম্বর মাসে ওরা দেশে বেড়াতে এল। আবিদের ইচ্ছে এখানে কোন ব্যবসা করে থিতু হয়ে যাবে। তবে শমিতার দেশে দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছে নেই। রোরির কথা তার বারবার মনে পড়ে। হয়তো রোরির কারণেই ও আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে।

যৌবন দেখানো সেই রুখসার আজমীর শরীফের এক বিখ্যাত খাদেমের ছেলেকে বিয়ে করে একদমই বদলে গেছে। সে এখন রীতিমত ধর্মকর্ম করে এবং বোরকা ছাড়া রাস্তায় বের হয় না।

রকি কিন্তু বদলায়নি। সে এখনও আগের মতই মাস্তানি করে বেড়ায়। তবে সে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের গায়ে কখনও হাত তোলে না। পাড়ার লোকে ওর এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত। ও নিজেও অবাক হয়েছিল। আট বছরের একটা ছেলে তাকে যে ধোলাই দিয়েছে এটা নিজেরই বিশ্বাস হয় না। কনুই ভাঙেনি, মচকে গিয়েছিল। চিকিৎসার পর সেরে উঠলেও মাঝে মধ্যে ব্যথা হয়। আর তখনই ও মনে মনে বলে, 'রোরি, কারাতে না শিখেও তুই দেখালি বটে!'

অন্য পাড়ার মাস্তানদের ঘায়েল করার মতলবে ও রোরির মত অবিশ্বাস্য শক্তি লাভ করতে রোজ রাতে খোদার কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনায় কোন ফল হয় না। আরও একটি প্রার্থনা করে ও, 'হে খোদা! আর কখনও রোরির মত কারও সামনে যেন পড়তে না হয়।'

জলাভূমির ভয়ঙ্কর

এক

'নীলু!' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ড. আহমেদ ফয়সাল। 'কতবার মানা করেছি জানালা দিয়ে ওভাবে মাথা বের করবে না। তারপরও যদি মেয়ে কথা শোনে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিনাত সুলতানা নীলু। জানালার কাঁচে চিবুক ঠেকিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

যত সামনে এগোচ্ছে, প্রকৃতির চেহারা ততই বদলে যাচ্ছে। মসৃণ, চওড়া রাস্তার দু'পাশে নিবিড় বন। এত ঘন জঙ্গল জীবনে দেখেনি নীলু। সবুজ জঙ্গল, ওপরে ঝকমকে নীল আকাশ। ভারি ভাল লাগছে ওর।

বেশ খানিক পর দৃশ্যপট আবার বদলে গেল। এবার বাড়িঘর চোখে পড়তে লাগল। প্রায় সবগুলো বাড়িই একই রকম মনে হলো নীলুর কাছে। সামনের পোর্চ বা বারান্দায় অনেককে দেখা গেল রকিং চেয়ারে বসে দুলে দুলে খবরের কাগজ পড়ছে। তবে মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেকটা বাড়ি যেন রনপা'র ওপর দাঁড় করানো। মাটি থেকে কমপক্ষে চারফুট উঁচুতে হবে ঘরগুলো।

'বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘরগুলো ওভাবে বানানো হয়েছে', ব্যাখ্যা করলেন নীলুর বাবা। 'এসব এলাকায় বন্যা হয় প্রায়ই।'

'ইস, এবারের সামারে যদি বন্যা হতো!' বলল নীলু আশা নিয়ে।

'অলক্ষুণে কথা বলিস না তো।' ভর্ৎসনা করলেন ড. ফয়সাল।

কাঠের তৈরি ঘরগুলো বেশিরভাগই প্রাচীন, বিবর্ণ। দেখলেই বোঝা যায় ঝড় জলের অনেক অত্যাচার পোহাতে হয়েছে। নীলু অবাক হয়ে দেখল বেশিরভাগ বাড়ির ছাদ টিনের।

'বৃষ্টির সময় টিনের ছাদঅলা বাড়িতে কী সুন্দর ঝিমঝিম শব্দ হয় তা যদি কোনদিন দেখতিস তুই।' আফসোস করলেন ড. ফয়সাল। 'টিনের বাড়িতে বাস করতে না পারলে তোর জীবনটাই বৃথা।'

মেয়েকে মাঝে মাঝে চটিয়ে মজা পান আহমেদ ফয়সাল। রেগে গেলে ফর্সা নীলুকে আরও সুন্দর লাগে। মুগ্ধ হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। নীলু ক্লাস সেভেনে পড়ে শিকাগোর একটা নামকরা স্কুলে। নীলুর মা নেই। বাবাই তার মা-বাবা সবকিছু। ড. আহমেদ ফয়সাল একজন জীববিজ্ঞানী। প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ। তারপরও যতটুকু পারেন সময় দেয়ার চেষ্টা করেন মেয়েকে। নীলুর এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাবা। মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে কিছু কাজ আছে তাঁর। সামারটা ওখানেই কাটিয়ে আবার শিকাগো ফিরে যাবার পরিকল্পনা করেছেন। মেয়ে অন্তঃপ্রাণ নীলুকে তিনি 'তুই' ডাকেন। যখন 'তুমি' বলেন, নীলু বুঝতে পারে রেগে গেছেন বাবা।

সাগরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। লম্বা, উঁচু একটা ব্রিজে উঠে পড়ল গাড়ি। চারদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল নীলুর।

বিশাল, সমতল একটা ল্যাণ্ডস্কেপ দেখা যাচ্ছে সামনে। এমন অবারিত দিগন্ত জীবনে এই প্রথম দেখছে নীলু। লম্বা, হলুদ ঘাস দুলছে বাতাসে, বাদামী-সবুজ রঙের পুকুরের মাঝখান থেকে যেন

উঠে এসেছে ওগুলো। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। শুকনো ভূমি দেখা যাচ্ছে না।

'হেই! ওটা কী?' চেঁচিয়ে উঠল নীলু।

'আমাকে বলছিস?' জিজ্ঞেস করলেন আহমেদ ফয়সাল। 'কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সের কোথাও লেখা নেই যে আমার নাম "হেই"! সর্বশেষ চেক করে দেখেছি, ওতে লেখা আছে মি. আহমেদ ফয়সাল।'

'ঠিক আছে, মি. ফয়সাল। কী ওটা?'

'নীলু...'

'আচ্ছা, বাপি। বলোই না কী ওটা?'

'ওটা একটা জলাভূমি, মামণি,' বললেন তিনি। 'দেখে মনে হচ্ছে তৃণভূমি, লেক আর জলা সব মিলেমিশে এক হয়ে আছে, তাই না? জলার মাটি কিন্তু খুব খতরনাক জিনিস। একবার পা দিয়েছিস কি চোরাবালির মত টেনে ধরবে খপ করে।'

নীলু বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে জলাভূমির দিকে। ওটার ভেতর কত কী রহস্যময় জিনিস থাকতে পারে। তাকাতেই শিরশির করে উঠল গা।

ব্রিজের শেষ মাথায় চলে এসেছে গাড়ি, সূর্যও পাটে বসতে শুরু করল। সামনের রাস্তা ঢাকা পড়ছে আঁধারে। তবে রাস্তার পাশে একটা ভাঙাচোরা সাইনবোর্ডের হাতে লেখা অক্ষরগুলো ঠিকই উদ্ধার করতে পারল নীলু, 'মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড।'

'হু হু হু! চলে এসেছি আমরা।' আনন্দে লাফিয়ে উঠল সে। আবার জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল বাইরে।

ঠিক এমন সময় অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করল। দেখা গেল এদিকের রাস্তা পুরোটা বালুময়। গাড়িটা বারবার পিছলে যেতে চাইল, একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে টলতে লাগল মাতালের মত। পাউডারের মত বালুতে টায়ার স্থির থাকতে চাইছে

না। বাধ্য হয়ে স্পিড কমিয়ে দিলেন আহমেদ ফয়সাল।

নীলু লক্ষ করল মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের মেইনল্যাণ্ডে বাড়িঘর অনেক কম। হতে পারে গাছপালার আড়ালে আরও বাড়ি আছে, ভাবল সে।

গাছগুলোও কেমন অদ্ভুত। রাস্তার পাশে ভীতিকর ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, ছড়ানো ডালপালাগুলোকে সাঁঝের আঁধারে মনে হলো ডাইনীর বাড়ানো থাবা।

শিউরে উঠল নীলু। তারপরও সাহস করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিশাল গাছগুলোর দিকে। পাতায় ওগুলো কী ঝুলছে?

কপালে ভাঁজ পড়ল নীলুর। অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হলো ছোট ছোট কতগুলো মানুষ দেখতে পেয়েছে ও। আকার, আকৃতিহীন মানুষ, কালো চোখ, হাঁ করা মুখ। হাত-পাগুলো যেন গলে যাচ্ছে আঁধারে।

ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল নীলুর চোখ। আতংকের চোটে গুলিয়ে উঠল পেট।

'বাপি,' আর্তনাদ করে উঠল ও। 'পালাও জলদি! ভূত!'



'...ত ব্যাপার তো,' বিড়বিড় করলেন আহমেদ ফয়সাল, ভুরু ...ক তাকিয়ে আছেন দ্বীপটার ম্যাপের দিকে।

'আমি ইয়ার্কি করছি না,' কিচমিচ করে উঠল নীলু। 'ওই দ্যাখো। গাছে ওগুলো ঝুলে আছে। ইইইইইইইইই!!'

বাবার সিট খামচে ধরল সে দু'হাতে। ঝট করে বুজে ফেলল চোখ, ভূতের হামলার ভয়ে অস্থির। ভূতটা হাসছে, শব্দ শুনতে পেল নীলু। ভয়ঙ্কর গলায় খলখল করে হাসছে।

আবার চিৎকার দিল ও।

খিক খিক খক খক শব্দটা আরও জোরালো হয়ে উঠল, কাছে আসছে। যেন গাড়ির ভেতর থেকে শব্দ হচ্ছে।

ভয়ে জমে গেল নীলু। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাণপণে বুজে রইল চোখ।

চোখ বুজে থাকলেও সত্যিকার একটা ভূতকে মুখোমুখি দেখার সুযোগটাও এদিকে হারাতে ইচ্ছে করছে না।

যা থাকে কপালে ভেবে চোখ মেলল নীলু–দেখল ওর বাবাকে। হাসছেন তিনি সামনের সিটে বসে। ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে।

'কো...কোথায় ওটা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল নীলু।

'তোর মাথার মধ্যে, বোকা,' হাসিটা আরও প্রসারিত হলো। 'ওগুলো ভূত নয়। স্প্যানিশ মস বা শ্যাওলা–পাথর বা গাছের কাণ্ডে জন্মানোর বদলে ডালে ঝুলে থাকে। আর তা দেখে ভয়ে দিশেহারা তুই। হা! হা! হা!' হেসে কুটিপাটি ড. আহমেদ ফয়সাল।

আবার জানালার ধারে চলে এল নীলু, উঁকি দিল। মাথার ওপর চাঁদ উঠছে, ভৌতিক আলোতে গাছের ডালে ঝুলতে থাকা সাদা শ্যাওলাগুলোকে মনে হলো বিয়ের ছেঁড়া পোশাক পরা কনে।

'আমি কী করে বুঝব ওগুলো শ্যাওলা?' প্রতিবাদ করল নীলু।

খানিক হতাশই লাগছে এখন। ভূতের সাথে মোলাকাত হলে মন্দ হতো না। বান্ধবীদের রসিয়ে গল্পটা বলা যেত। গল্প শুনে নিশ্চয়ই সবার চোয়াল ঝুলে পড়ত। বলত কীভাবে সে ভূতটার

সাথে মারামারি করেছে, ঘুষি মেরেছে। আর হাতটা ঢুকে গেছে ভূতের স্বচ্ছ শরীরের ভেতর। বলত সে ভূতটাকে খেতে দেখেছে। খাবারগুলো গলা থেকে পেটে নেমে যাবার দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে নীলু। বলত...

'ওটাকেও ভুতুড়ে মনে হচ্ছে না?' বললেন আহমেদ ফয়সাল। 'চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে না ওটা একটা ভূতের বাড়ি?'

বাবার কথায় চমক ভাঙল নীলুর। চোখ তুলে চাইল। বিশাল এক বাড়ি। বুঝতে পারল এ বাড়িতেই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেছে ওরা।

প্রকাণ্ড বাড়িটার দেয়াল ক্লিপবোর্ডের, এ দ্বীপের অন্যান্য বাড়ির মত, প্রাচীন, ম্লান এবং বিবর্ণ। তবে ধূসর রঙ নয় বাড়িটার, কালো রঙে সত্যি বিকট লাগছে দেখতে।

বাড়িটার সামনে এবং দু'পাশে বারান্দাও আছে। ছাদ ঠেলে উঠে গেছে একটা চিমনি, ভেন্টিলেটারসহ। দোতলায় গোল একটা জানালা দেখা গেল, রঙিন কাঁচ লাগানো।

'ওয়াও!' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল নীলু। 'হ্যালোউইন পার্টির হানাবাড়ির মত লাগছে বাড়িটাকে। কী বিশাল!'

লাফ মেরে গাড়ি থেকে নামল ও, লঝ্‌ঝরে সিঁড়ি টপকে উঠে এল বারান্দায়।

গাড়ির বনেট খুলে সুটকেস আর ট্রাঙ্ক নামাতে নামাতে আহমেদ ফয়সাল বললেন, 'এত বড় বাড়ি সাধারণত বড় পরিবারগুলোই ভাড়া নিয়ে থাকে। তবে ভাগ্য ভাল আমরা পেয়ে গেলাম। কারণ কেউই বাড়িটি ভাড়া নিতে চায়নি।'

অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি, যেন নিজেকে শুনিয়েই বললেন, 'ভাবছি কেন নিতে চায় নি।' তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভৌতিক বাড়িটির দিকে পা বাড়ালেন তিনি দু'হাতে দুই সুটকেস ঝুলিয়ে।

তিন

একটা পুরানো, জং ধরা চাবি বের করলেন তিনি পকেট হাতড়ে। তালা খুলবেন। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল ওটা। ধাক্কা দিলেন দরজায়, ক্যাঁআচ শব্দে খুলে গেল কবাট।

নীলুই আগে পা রাখল ভেতরে। বেসমেন্টের সোঁদা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। দরজার পাশের দেয়াল হাতড়াল ও, সুইচ খুঁজছে। দেয়ালে ধুলো বোঝাই, খোঁচা খেয়ে নখে উঠে এল পেইন্ট।

অবশেষে আলোর সুইচ খুঁজে পেল নীলু।

তবে এ ধরনের সুইচ কখনও দেখেনি ও। হাতের স্পর্শে বুঝল দুটো বোতাম ধরে আছে ও, একটা অপরটার চেয়ে উঁচু। নীচেরটা ভেতরে ঢোকানো, ওপরেরটা বাইরের দিকে। ওটাতে চাপ দিতে নীচের বোতামটা ফট করে বেরিয়ে এল।

হিসস করে একটা শব্দ হলো, বিশাল এক ঝাড়বাতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলোতে।

ছোট ছোট, কমপক্ষে একশো বাতি একসাথে এণ্ট্রান্স হলে জ্বলতে দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল নীলুর। ঘরটা কী বিশাল! দোতলার সমান হবে উঁচু।

দেয়ালে জলাভূমির পেইন্টিং ঝোলানো। দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন আগের আঁকা। লম্বা, বাঁকানো একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল নীলুর, পুরানো আমলের ছায়াছবির মত দেখতে

নিজের সুটকেস হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল ও। এক দৌড়ে উঠে এল ওপরে। বাঁক ঘুরতেই লম্বা, অন্ধকার একটা করিডর পড়ল সামনে। খাঁ খাঁ করছে। করিডরের শেষ মাথা দেখা যাচ্ছে না।

দেয়ালে হাত রাখল ও, ভেলভেট ওয়াল পেপার মোড়ানো। এখানেও নীচের মত দুটি বোতাম আবিষ্কার করল নীলু। ওপরেরটা টিপে দিল।

মাকড়সার জালে ঢাকা কতগুলো বাতি জ্বলে উঠল সাথে সাথে। করিডরের দু'পাশে অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘরের বন্ধ দরজার ওপর একটা করে বাতি ঝুলছে। নীলু গুনল–দশটা।

বাড়িটা ঘুরে দেখার উৎসাহ ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে ওর। মাকড়সার জাল ভেদ করে আসা বাতির মিটমিটে আলোয় গা ছমছম করছে। টের পেল ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সরসর করে।

পা টিপে টিপে হলওয়ের দিকে এগুল নীলু। উঁকি দিচ্ছে বেডরুমগুলোতে। আলো জ্বালানোর মুহূর্তে দম বন্ধ করে রাখছে। লম্বা বিছানা, পুরানো আমলের ওয়াশস্ট্যাণ্ড আর সুদৃশ্য টেবিল দেখার পর সশব্দে নিশ্বাস ফেলছে।

হলঘরের শেষ মাথায় প্রকাণ্ড দুই দরজাঅলা ঘরের সামনে হাজির হয়ে গেল নীলু।

কাঠের দরজাদুটোতে নানান কারুকাজ। ওদিকে তাকিয়ে কেন জানি শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর। বাপিকে ডেকে আনবে কিনা ভাবল একবার। বাপ আসছে কিনা দেখার জন্যে একবার গলাও বাড়াল।

পরক্ষণে নিজেকে তিরস্কার করল ও।

'এমন ভীতুর ডিম হওয়া তোমাকে মানায় না, নীলু,' চোখ রাঙাল ও নিজেকে। 'ভেতরে মাকড়সার জাল ছাড়া আর থাকবেই

বা কী?'

পেতলের ডোরনবে ধীরে ধীরে মোচড় দিল নীলু। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভীষণ অন্ধকার, তবে ঘরটা বিরাটই হবে, অনুমান করল ও।

পা বাড়াল নীলু, ঢুকল আঁধারের রাজ্যে, হাত বাড়িয়ে খুঁজছে আলোর সুইচ। জ্বেলে দিল বাতি। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ঘরটা দেখার জন্যে।

সাথে সাথে চোখ বড় বড় হয়ে গেল অবিশ্বাসে।

চার

এ বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটিতে ঢুকেছে জিনাত সুলতানা নীলু।

আর এটা একটা মেয়ের শোবার ঘর।

চারদিকে দেখতে দেখতে বিস্ময়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ। ওর বয়সী কোন মেয়ের ঘর হবে এটা।

'ওয়াও!' ফিসফিস করল নীলু। 'মেয়েটা কি রাজকন্যা-টন্যা ছিল নাকি? দেখে তো তাই মনে হয়।'

ঘরের এককোনায় ছোট একটা টেবিল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার। টেবিলের ওপর চমৎকার সাজানো ছোট টি সেট, যেন পার্টির জন্যে রেডি করে রাখা। আর পার্টিটা শুরু হয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে।

দেয়ালে এক সারে দাঁড়ানো অপূর্ব সুন্দর কিছু চিনামাটির

পুতুল। যেন পার্টির অতিথিদের দেখভাল করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েগুলো। এমনই জীবন্ত!

'অদ্ভুত ব্যাপার তো,' কিনারায় সোনার বেড় দেয়া একটা কাপ আর পিরিচ হাতে তুলে নিল নীলু। এক ফোঁটা ধুলোও নেই। অথচ এ বাড়িটার সবখানে শুধু ধুলো আর ধুলো।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল ও পুরানো দিনের পোশাক পরা এক লম্বা, সোনালি সৈনিকের দিকে। একটা ক্লজিট বোঝাই অসংখ্য গাউন চোখে পড়ল। হলুদ লেস দেয়া, পেছনে অনেক বোতাম লাগানো। ক্লজিটের ওপরের র‍্যাকে বেশ কিছু বুটজুতোও আছে। কালো রঙের।

সবগুলো, দেখে মনে হয়, নীলুর সাইজের।

'কার এগুলো?' অবাক হয়ে ভাবল ও। 'মেয়েটা কি এখনও মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে বাস করে? তা হলে তো ওর বয়স হবার কথা একশো।'

হঠাৎ পোশাকগুলো পরার অদ্ভুত একটা ইচ্ছে জেগে উঠল মনে। দ্রুত নিজের শর্টস আর টি শার্ট ছেড়ে সাদা সাটিনের, ফোলানো স্লিভের চমৎকার একটা ড্রেস বেছে নিল ও। ড্রেসটার হাইনেকের ওপর আবার গোলাপ ফুল আঁকা।

খুব সাবধানে ড্রেসটা পরল নীলু। ছোট বোতাম আটকাতে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হলো, তারপর ঘরের কোনায় লম্বা আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটিকে ভারি পছন্দ হলো তার। সাটিনে হাত বোলাতে খসখস শব্দ উঠল।

'আহ্, এখন একটা ঘোড়া জোগাড় করতে পারলেই হতো। ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়তাম।' খিলখিল হাসল নীলু।

ধীর পায়ে এগোল ও এবার ঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিসটির দিকে—প্রকাণ্ড এক বিছানা, এতই বড় আর উঁচু যে ওটাতে উঠতে মইয়ের দরকার হয়।

বিছানার চাদর সাদা আর গোলাপী রঙের। ছোট ছোট কুশন আছে, ঝালর দেয়া। বিছানার ওপর বহুরঙা একটা চাঁদোয়া ঝুলছে।

সাধারণত এরকম ছেলেমানুষী করে না নীলু এমনকী পুতুলও খেলে না ও। ওর ধারণা পুতুল খেলার বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে।

তবে আজ যেন ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসেছে ওকে। মই বেয়ে বিছানায় উঠে এল ও, শুয়ে পড়ল সাদা-গোলাপী রঙের বালিশে মাথা দিয়ে।

বেশ অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার লাগছে ব্যাপারটা।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনল নীলু, শিরদাঁড়ায় যেন বরফ-জল নেমে এল। 'ইইইইইই আহ্‌হ্‌?!'

জমে গেল নীলু, চট করে উঠে বসল। অমন বিকট সুরে কে গোঙাচ্ছে? বাতাসের শব্দ কি?

তারপর আবার শব্দটা শুনল ও। 'ইইইইইইই আহ্‌হ্‌হ্‌!'

কেউ প্রচণ্ড রাগে গর্জাচ্ছে। পাখিটাখি হবে বোধহয়, মনকে প্রবোধ দিল নীলু। ভয় পাবার কিছু নেই। আবার ভেসে এল গা হিম করা আওয়াজটা। 'ইইইইইই আহ্‌হ্‌?!'

শিরায় যেন রক্ত জমাট বেঁধে গেল নীলুর, বুকের খাঁচায় দমাদম পিটতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। না, ওটা পাখির চিৎকার হতে পারে না। অমন ভয়ঙ্কর আর্তনাদ কোন পাখি করে না। এমন গোঙানি বা গজরানি আগে কখনও শোনেনি নীলু। টের পেল গলা শুকিয়ে গেছে ওর, দম বন্ধ হয়ে আসছে। চিৎকার দিতে চাইল, কোন শব্দ বেরুল না গলা থেকে।

অবশেষে, হাঁপিয়ে উঠে যেন দম ফিরে পেল নীলু, ফুসফুসের সমস্ত শক্তি জড় করে আর্তনাদ ছাড়ল। 'বাপিইইইইই!'

পাঁচ

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল নীলু। ওর বাবা এসে দেখলেন মেয়ে রীতিমত থরথর করে কাঁপছে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'কী হয়েছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বাইরে কী যেন একটা আছে,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল নীলু। 'গোঙাচ্ছে।'

দু'জনেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল, শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না।

খানিক পরে নীলুর বাবা বললেন, 'তুই কি শিওর কারও গোঙানি শুনেছিস?'

মাথা দোলাল নীলু। 'হ্যাঁ, বাপি। শুনেছি।'

জীববিজ্ঞানী হাসলেন, নীলুর পরনের সাটিনের পোশাকের দিকে হাত বাড়ালেন।

'আমার মনে হয় কল্পনায় তুই শব্দটা শুনেছিস।' ড্রেসটাতে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন তিনি।

'না, বাপি,' প্রতিবাদ করল নীলু। 'বিশ্বাস কর, আমি গোঙানির আওয়াজ শুনেছি। মনে হচ্ছিল কোন মানুষ গোঙাচ্ছে।'

নীলুর বাবা আর কিছু বললেন না। ঘরের চারদিকে চোখ

বুলাতে লাগলেন।

'অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাচ্ছি,' অবশেষে বললেন তিনি। 'যেন কোন জাদুঘরে ঢুকেছি।'

বিছানার পাশের দেয়ালের দিকে হাত তুলে দেখালেন ড. আহমেদ ফয়সাল। 'ওই দ্যাখ। ওদিকে একটা ব্যালকনিও আছে। চল তো দেখি তোর গোঙানির উৎস ওদিকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

ওখানে একটা দরজা আছে, নীলুর চোখে পড়েনি আগে। আহমেদ ফয়সাল দরজাটা খুললেন। কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল নীলু, না জানি কী লুকিয়ে আছে দরজার পেছনে।

বাবার পিছু পিছু ভীরু পায়ে সে যখন বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে, দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। অপূর্ব সুন্দর একটা পোর্চ, বেশ চওড়া। ছাদ থেকে একটা দোলনাও ঝুলছে। ঝুলবারান্দায় বেশ কিছু চেয়ার, ছড়ানো-ছিটানো।

ঝুলবারান্দার পরে, ধবধবে চাঁদের আলোতে, বিশাল, সাদা সাগর সৈকত ভেসে উঠল চোখের সামনে—তারপর সমুদ্র।

'কী সুন্দর!' মুগ্ধ বিস্ময় নীলুর চোখে।

'দেখলি তো?' বললেন ড. ফয়সাল। 'এখানে কেউ নেই। সম্ভবত কোন পশু বা পাখির ডাক শুনেছিস তুই। দক্ষিণের এই এলাকায় তুই তো আগে কখনও আসিসনি।'

কিন্তু বাবার কথা কানে যাচ্ছে না নীলুর।

ভয়ের শীতল একটা স্রোত ওকে অবশ করে দিচ্ছে।

'ও-ওইদিকে দ্যা-দ্যাখো!' ফিসফিস করল ও।

ঝুলবারান্দার বিপরীত দিকে হাত তুলে দেখাল নীলু। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ছোট, কাদামাখা পায়ের ছাপ মাখা একটা ট্রেইলের দিকে।

ছাপগুলো কোন কিশোরীর খালি পায়ের।

ছাপগুলো চলে গেছে রেইলিং থেকে জানালার দিকে–বিছানার ডান পাশের জানালায়। তারপর মোড় ঘুরে আবার রেইলিং-এর দিকে এগিয়েছে।

ওখানে থেমে দাঁড়িয়েছে।

দেখে মনে হয় মেয়েটা ব্যালকনি থেকে নীচে লাফিয়ে নেমেছে। কিন্তু মাটি থেকে ব্যালকনির উচ্চতা কম করে হলেও বিশ ফুট!

নীলু ঝুঁকে এল সামনে, পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করল। প্রায় তার পায়ের সাইজ। হাত বাড়িয়ে ছাপগুলো স্পর্শ করল ও। চটচটে, আর আঠালো, এখনও ভেজা ভেজা।

'মেয়েটা যে-ই হোক,' বলার সময় কেঁপে উঠল গলা, 'একটু আগেও সে এখানে ছিল।'

ছয়

'হুমম,' হাঁটু গেড়ে বসে ছোট পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলেন ড. আহমেদ ফয়সাল। মুখ তুলে চাইলেন সৈকতের দিকে। তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় পায়ের ছাপ-রহস্য ভেদ করতে পেরেছি আমি।'

নীলু বারান্দার অপর প্রান্তে তাকাতে দেখতে পেল একটা লম্বা মাচা, আঙুরলতা আর ফুলগাছের ওপর আড়াআড়িভাবে বসানো। বারান্দার ঠিক পাশ ছুঁয়ে ওটা নেমে গেছে নীচে। মাচা বেয়ে উঠতে

বা নামতে তেমন কোন সমস্যা নেই। মেয়েটা হয়তো তাই করেছে।

বাপের কথা শুনে নীলু প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে। 'আমার ধারণা, স্থানীয় কেউ কৌতূহলী হয়ে এসেছিল আমাদের দেখতে,' বললেন ডক্টর।

পিছিয়ে এলেন তিনি, জানালার লক পরীক্ষা করলেন। 'এখানে ভয়ের কিছু নেই। নিরাপদেই থাকবি তুই।' বললেন তিনি। তারপর রওনা হয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। গাড়ি থেকে এখনও বাকি ট্রাঙ্ক নামানো হয়নি।

নীলু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সাগর সৈকতের দিকে। অপেক্ষা করছে। কাউকে হয়তো দেখতে পাবে ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কিংবা কারও কাপড়ের খসখস শব্দ শুনবে। শব্দ শোনার জন্যে দম বন্ধ করে রইল ও।

কিন্তু পাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ও।

আগে লক্ষ করেনি, এবার চোখে পড়ল জিনিসটা। ছোট, সুদৃশ্য টেবিলের পাশে–লম্বা আরেকটি আয়না। টেবিলের ওপর রুপোর হেয়ারব্রাশ, চিরুনি এবং ছোট আয়নাও আছে।

'ওয়াও!' মনে মনে বলল নীলু। 'মেয়েটা নিশ্চয়ই আয়নায় বারবার নিজের চেহারা দেখতে ভালবাসত।'

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে ভাবল ও, এখানে ঘুমোতে নিশ্চয়ই খুব মজা। ঘুম থেকে জাগলেই চারপাশে বৈভবের ছড়াছড়ি।

গলা ছেড়ে বলল নীলু। 'দাঁড়াও। আমরা এ বাড়িতে থাকতে এসেছি। এখানে আমি ঘুমালে অসুবিধে কী?'

এরপর নীচে চলে এল ও। বাপকে দেখল কিচেনে। রান্নাঘরটা বেশ বড় আর ঝকঝকে। সাদা-কালো মোজাইক করা মেঝের ঠিক

মাঝখানে একটা প্রাচীন লোহার স্টোভ। একটা ফ্রিজও আছে, পুরানো আমলের, পেটমোটা। দরজা খুলতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে হয়।

'কীরে, মা, কিছু বলবি?' মেয়েকে দেখে জানতে চাইলেন বাপ।

'হ্যাঁ,' বলল নীলু। 'আমি ওপরের বেডরুমে শুতে চাই।'

'ওখানে শোয়া ঠিক হবে না,' বললেন ডক্টর। 'ওঘরে অনেক পুরানো অ্যান্টিকস আছে। ভেঙে-টেঙে ফেলবি। তুই অন্য কোন ঘরে ঘুমা। ঘরের তো অভাব নেই।'

'প্লিইইইজ, বাপি,' আবেদনের সুরে বলল নীলু। তারপর শেষ অস্ত্রটা ছুঁড়ল। জানে বাবা এবার ঘায়েল হবেনই।

'তুমিই তো বলো সবসময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। ওঘরে ঘুমিয়ে আমি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই।'

এবার নরম হলেন ড. আহমেদ ফয়সাল। মেয়েকে তিনি প্রায়ই বলেন, 'অমুক অভিজ্ঞতা তোর হলো না। তোর জীবনটাই বৃথা।' নীলুও বুঝে গেছে বাপকে পটানোর মোক্ষম দাওয়াই হলো কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা বলা।

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। এত করে যখন বলছিস। যা অনুমতি দিলাম। তবে সাবধান, কোন জিনিসে হাত দেয়া চলবে না। আর এই পোশাকটা খোল তো শিগ্‌গির।'

নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল নীলু। ড্রেসটার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে।

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বাইল ও। দ্রুত জামার বোতাম খুলছে। পোশাকটা খুলে একটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখল নীলু। তারপর বাপকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'গুডনাইট, বাপি। কাল সকালে দেখা হবে।'

সাত

পরিপাটি, রাজকীয় বিছানায় হাত-পা মেলে শুয়ে পড়ল নীলু। কিন্তু ঠিক যেন আরাম পাচ্ছে না ও। কুশনগুলো একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল মেঝেতে। শুধু দুটো বালিশ রাখল সে বিছানায়। দুটোই পুরানো।

এরপর লেস লাগানো বেডকাভারও টেনে ফেলে দিল নীলু। নীচে দেখা গেল সুতির সাধারণ একটা কাঁথা।

'এটাই আমার জন্যে ভাল,' বলল সে। ঝলমলে জিনিসগুলো দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু ওর ওপর শুয়ে কোন মজা নেই। অন্তত নীলু কোন মজা পাচ্ছে না।

এবার 'দ' হয়ে শুয়ে পড়ল নীলু। সারাদিনের ভ্রমণ-ক্লান্তি দ্রুত ঘুম এনে দিল চোখে।

স্বপ্ন দেখল ও সেই জলাভূমি আর ভুতুড়ে গাছের, সেই সাথে বিকট গোঙানিও শুনতে পেল।

'ইইইই, আহ্‌হ্‌হ্‌,' প্রতিধ্বনি তুলল কণ্ঠটি। 'ইইইইইই আহ্‌হ্‌?!'

'আঃ আঃ... বিড়বিড় করল নীলু, আধা ঘুম আধা জাগ্রত অবস্থায় সিঁটিয়ে গেল ও।

ভৌতিক কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ বদলে গেল। গোঙানির মাত্রা কমে এল, আগের মত উচ্চকিত নয়। জড়ানো, অস্পষ্ট। যেন পানির

নীচ থেকে কথা বলছে কেউ।

কথা বলার সময় কণ্ঠটি কাঁপতে লাগল রাগে। কাঠ হয়ে শুনল নীলু।

'তোমার ধারণা...তুমি এখানে নাচবে গাইবে...আর এখানকার সবকিছু...তোমার হয়ে যাবে?' আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এল স্বর। 'ঠিক আছে, খুকি...অপেক্ষা করো...আরেকটা জিনিস আসছে...।

আট

থেমে গেল কণ্ঠস্বর। নীলু শুয়ে রইল বিছানায়, থরথর করে কাঁপছে, হাত-পা নাড়াতে পারছে না।

ওঠার শক্তি পাচ্ছে না নীলু, ইচ্ছে করছে এক দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। কিন্তু পারছে না।

বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখেছি, নিজেকে প্রবোধ দিল ও। কোন শব্দ শুনতে পাইনি আমি। সবই আমার কল্পনা।

নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আবার চোখ বুজল নীলু। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বাবার ডাকে ঘুম ভাঙল ওর। ঘর ভরে গেছে সূর্যের আলোয়।

'উঠে পড়, বাছা,' বললেন ডক্টর। 'নাস্তা খাবি না? খিদে পায়নি?'

'পায়নি আবার।' লাফ মেরে উঠল নীলু। 'খিদেয় পেট চোঁ চোঁ

করছে।’

‘চল তা হলে বেরিয়ে পড়ি। শহরে যাব। কিছু মুদি সদাই কিনতে হবে। আজ বাইরে নাস্তা করব আমরা।’

এক দৌড়ে ব্যালকনিতে চলে এল নীলু। মন প্রফুল্ল। সাগর সৈকত ঝলমল করছে সূর্যালোকে। তীরে আছড়ে পড়ছে ফেনার মুকুট পরা ঢেউ। সাঁতার কাটার জন্যে আর তর সইছে না নীলুর।

হঠাৎ পায়ের ছাপের দিকে নজর চলে গেল ওর। আছে এখনও ওগুলো। তবে শুকিয়ে গেছে।

‘হুমম,’ এক লাথিতে ছাপগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিল নীলু। ‘পরেরবার মেয়েটা এলে ওর সাথে কথা বলতে হবে। হয়তো আমরা বন্ধুও হয়ে যেতে পারি।’

নয়

‘শহর’ বলতে কিছু কাঠের দালানকোঠা। নীলুদের বাসা থেকে মাইলখানেক দূরে কয়েকটা মনোহারী দোকান আছে লালচে একটা রাস্তার ধারে, সার বেঁধে দাঁড়ানো।

ড. আহমেদ ফয়সাল মার্কেটের সামনে গাড়ি থামালেন, নজর বুলালেন চারদিকে। হার্ডওয়্যার স্টোর, বিউটি শপ, মার্কেট। ‘মোটামুটি প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে দেখি,’ বললেন তিনি। ‘বাহ্, একটা বেকারিও আছে। যা তো, মা, এক দৌড়ে ব্রেড কিনে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে মুদি সদাইগুলো কিনে ফেলি। আজ

তোকে নিয়ে পিকনিক করব।'

নীলুকে পাঁচ ডলার দিলেন তিনি। টাকাটা নিয়ে সে উজ্জ্বল রঙের একটা দালানে ঢুকে পড়ল। বিল্ডিংটা পুরানো, সবুজ আর লাল রঙ করা হয়েছে সদ্য, ঝলমল করছে। সামনের দরজায় কাঠের একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা–'গুল্লাহ গুরমেট ডিলাইটস: তাজা রুটি ও বিস্কুট পাওয়া যায়।'

'গুল্লাহ, খিক খিক হাসল নীলু। 'কী অদ্ভুত নাম রে, বাবা!'

বেকারির ভেতরে বিস্কুটের মনমাতানো গন্ধ। মিষ্টিও আছে। গ্লাসকেসের মধ্যে হরেক রকম মিষ্টি থরে থরে সাজানো। অমন মিষ্টি জীবনে দেখেনি নীলু। আর কত বিচিত্র নাম ওগুলোর। সুইট পটেটো টার্নওভার। সুইট পটেটো পাই। ওকরা কেক। কর্নব্রেড পুডিং উইদ পিচ।

'সুইট পটেটো টার্নওভার?' অবাক হলো নীলু।

'হ্যাঁ। খাওনি কখনও?'

দারুণ চমকে উঠল নীলু। পাঁই করে ঘুরতেই দেখল ওর বয়সী একটা মেয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটির পরনে শর্টস আর সাদা টি শার্ট, বাদামী চামড়ার সাথে মানিয়ে গেছে দারুণ। মাথার চুল কুচকুচে কালো, অনেকগুলো বেণী তাতে। কানে ছোট দুল। নড়ে উঠতে টিং টিং শব্দ করল দুলগুলো।

'না এ জিনিস কখনও খাইনি আমি,' মৃদু গলায় স্বীকার করল নীলু। 'মনে হয় মজার জিনিসই হবে।'

'খাবে একটা?' জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি। 'আমার দিদার দোকান এটা। একটা খেলে কিছু মনে করবেন না তিনি।'

গ্লাসকেসের পেছনে চলে এল সে, বাদামী রঙের একটা মিষ্টি নিয়ে নীলুর হাতে দিল হাসিমুখে। বলল, 'খাও।'

মস্ত কামড় বসাল নীলু মিষ্টিতে। অপূর্ব স্বাদ। মুখে যেতেই

গলে গেল।

'দারুণ!' বলল নীলু। 'ধন্যবাদ। তা তোমার নাম কী, ভাই? আমি নীলু।'

'আমি শীলা,' বলল মেয়েটি। 'এটা আমার দিদার দোকান। মা-ও এখানে কাজ করে। মাঝে মাঝে আমিও একটু আধটু সাহায্য করি।'

মিষ্টি খেয়ে মুখ মুছল নীলু হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। বলল, 'আমাকে একটা ব্রেড দাও তো, ভাই। বাবার সাথে পিকনিক করব। যাবে আমার সঙ্গে?'

'পারব না,' করুণ গলায় বলল শীলা। 'আজ আমার দোকানে বসার দিন।'

'তা হলে কাল?' জানতে চাইল নীলু। 'তুমি আমাকে দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখালে খুব খুশি হব।'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল শীলা। নীলু ওর ঠিকানা দিচ্ছে শীলাকে, শীলা রুটির সাথে আলগোছে ওর ব্যাগে কিছু চুয়িংগাম ঢুকিয়ে দিল।

নতুন এক বন্ধু পেয়ে রোমাঞ্চিত নীলু এবার ছুটল মার্কেটের উদ্দেশে, বাপের কাছে।

দশ

পরদিন সকালে চলে এল শীলা নীলুদের বাড়িতে। তবে ঘরে ঢুকল না সে, দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। অবাক হলো নীলু। 'কী ব্যাপার,

শীলা! ভেতরে এসো।'

প্রবল বেগে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল শীলা। আসবে না।

'কেন? কী হয়েছে?' জানতে চাইল নীলু।

শীলা ওকে ইশারা করল বাইরে আসতে। নীলু চলে এল ড্রাইভওয়েতে।

'কী ব্যাপার?'

'তুমি তো আমাকে বলোনি হেবারস্যাম হাউসে তোমরা থাক,' মুখ অন্ধকার করে বলল শীলা।

'আমি এ বাড়িটার নাম এই প্রথম শুনলাম তোমার কাছে। তবে কি জান, দেখলেই বোঝা যায় এককালে এ বাড়িতে খুব ধনী মানুষরা ছিল। আমি যে ঘরে থাকি, চলো, তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাব। একটা ছোট মেয়ের ঘর ওটা। ওর যে কত খেলনা আর পোশাক...' থেমে গেল নীলু অস্থির ভঙ্গিতে শীলাকে হাত মোচড়াতে দেখে।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো?' চেঁচিয়ে উঠল ও।

'তুমি ওই ঘরে থাকছ!' গুঙিয়ে উঠল শীলা। 'জানো না এ বাড়িটা হানা বাড়ি? আর ছোট মেয়েটার ঘর এ বাড়ির সবচেয়ে ভুতুড়ে কামরা!'

এগারো

'মানে!' অবাক হলো নীলু।

'মানে হলো তোমরা যে বাড়িতে থাকছ ওটা ভুতুড়ে বাড়ি,'

বলল শীলা। 'এখানকার সবাই জানে কথাটা। তোমার বাবা কেন যে ওটা ভাড়া নিলেন। বহুদিন ওবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না কেউ।'

'ভাড়া নেয়ার সময় বাবাকে কেউ বলেনি এটা ভুতুড়ে বাড়ি।' শিউরে উঠল নীলু। একটু থেমে বলল, 'কিন্তু এটা যে সত্যি হানা বাড়ি কী করে জানলে? কোন প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ!' বিস্ময় প্রকাশ করল শীলা। 'সবাই জানে ওটার কেচ্ছা-কাহিনি।'

'তা হলে কেচ্ছা-কাহিনিটা আমাকে শোনাও না!' ধরে বসল নীলু।

'আচ্ছা, শোনাব।' বলল শীলা। 'আগে ছবিটা দেখাই চলো।' বাড়ির দিকে পা বাড়াল ও।

'কীসের ছবি?' শীলার সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটছে নীলু।

'হেবারস্যাম পোর্ট্রেট,' জবাব দিল শীলা। 'আমার দাদু আমাকে ছবিটি দেখিয়েছিল। গল্পটাও তার কাছ থেকে শোনা। তারপর থেকে এ বাড়ির ধারেকাছেও ঘেঁষি না আমি।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা, ঝট করে ঘুরল, একটুর জন্যে বাড়ি খেল না নীলুর মাথার সাথে।

'স্রেফ তোমার জন্যে হানা বাড়িটাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছি আমি,' নীলুর নাকে প্রায় নাক ঠেকিয়ে বলল ও।

জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না নীলু, শুধু 'ধন্যবাদ' বলল।

শীলা বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। থমথমে চেহারা নিয়ে এগোল সিঁড়ির দিকে, তারপর লিভিংরুমে ঢুকল। লিভিংরুমের দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল নীলুর।

ছবিটা হলুদ হয়ে গেছে, একশো বছর আগের পোশাক-আশাক পরা কিছু লোকের সাথে একটি ছোট মেয়েকে দেখা যাচ্ছে।

'ওটা হেবারস্যাম পরিবার,' বলল শীলা। 'একশো বছরেরও

আগে এ বাড়ি তৈরি করে গেছে ওরা।'

ভালভাবে দেখার জন্যে ছবিটির দিকে ঝুঁকল নীলু। দলের মাঝখানে ভালুকের মত প্রকাণ্ডদেহী এক লোক, মাথায় হ্যাট। তারপাশে কালো পোশাক পরা রোগাটে চেহারার এক মহিলা। তার চুলে শক্ত বিনুনি।

'উনি মি. হেবারস্যাম,' ভালুককে দেখিয়ে বলল শীলা। 'আর পাশের মহিলা তাঁর স্ত্রী। এখানে প্ল্যানটেশন করে বহু টাকাই কামাই করেছিলেন তিনি। আমাদের পূর্বপুরুষদের দু'একজন তাঁদের বাড়িতে মজুর খেটেছে।'

শীলা এবার হাত রাখল অপেক্ষাকৃত তরুণ দু'জনের ছবিতে। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। ছোট মেয়েটি বসে আছে মহিলার কোলে।

'ওই ভদ্রলোক মি. হেবারস্যামের ছেলে, আর তাঁর পাশের জন তাঁর স্ত্রী।' কালো বুট পরা ভুরু কুঁচকে রাখা মেয়েটিকে এবার ইঙ্গিত করে বলল, 'আর এ হলো ইউজেনি।'

'ইউজেনি? ওর ঘরটাই তা হলে দোতলায়?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল শীলা। 'বুড়ো হেবারস্যামের নাতনী। বেশি আদরে বখে গিয়েছিল মেয়েটি। যা চাইত তাই পেয়ে যেত। আর তার চাহিদারও নাকি শেষ ছিল না। লোকে বলে, ঘরের লোকজন তটস্থ থাকত তার যন্ত্রণায়। চাকরবাকরদের খাটিয়ে মারত। রীতিমত অত্যাচারী স্বভাবের ছিল এই ইউজেনি।' শীলা তাকাল নীলুর দিকে, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'বেশি বাড়লে যা হয়। তার অত্যাচারের সাজাও সে পেয়েছে তেমনি।'

বারো

'কী ঘটেছিল মেয়েটার ভাগ্যে?' কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল নীলু।

'আসলে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা কারোরই নেই,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল শীলা। 'যদ্দূর জানি মেয়েটা নাকি তার দাদীমার কাছে একটা পনি ঘোড়ার আবদার করে। ঘোড়া তার একটা ছিল। দাদীমা আরেকটা কিনে দিতে অস্বীকার করলে রাগ করে সে বেরিয়ে পড়ে। তাকে সর্বশেষ দেখা গেছে জলাভূমির দিকে যেতে। তারপর আর তার খোঁজ মেলেনি।'

একটু বিরতি দিল শীলা, ঝপ করে নেমে গেল গলার স্বর। 'লোকে বলে সে নাকি জলায় ডুবে মরেছে। কিন্তু ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল ইউজেনি। প্রতিশোধ নিতে সে আবার ফিরে আসে বাড়িতে, ভূত হয়ে।

'তবে সাধারণ ভুতুড়ে চেহারা ছিল না তার। তাকে নাকি ভয়ঙ্কর দেখাত। মাটি আর ঘাস দিয়ে তৈরি কিম্ভুত একটা জীবের মত নাকি দেখতে ইউজেনি। নিজের ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল ইউজেনির। লোকে বলে নিজের ঘরে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে। তার অতৃপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায় জলাভূমির ধারে।'

'কেউ দেখেছে ওকে?' ফিসফিস করল নীলু।

'জানি না ঠিক।' বলল শীলা। 'তবে ওর গোঙানি আর

আর্তনাদ নাকি শুনেছে অনেকেই। ওর বেডরুমের সাথে লাগোয়া ঝুলবারান্দা থেকে সেই অমানুষিক চিৎকার ভেসে আসত। ইউজেনি জলায় ঘুরে বেড়ায় ডাইনীর মত। জলাভূমির চোরাবালিতে ডুবে নাকি মরেছে মেয়েটা। জায়গাটা দেখলেই চিনতে পারবে। একটা গাছ, গাছের গায়ে আঁকশি বেঁধা, দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়, শ্যাওলা পড়া প্রকাণ্ড একটা পাথরের পাশে।'

'ও, বাবা। ওখানে মরে গেলেও যাব না আমি!' কেঁপে উঠল নীলু। শীলাকে ইউজেনির বেডরুমের গল্প খুলে বলল সে এবার। জানাল বাইরে থেকে কত উদ্ভট এবং ভয়ঙ্কর শব্দ শুনেছে। পায়ের ছাপের কথা বর্ণনা করতেও ভুলল না। শেষে সেই দুঃস্বপ্নের কথা ব্যাখ্যা করল, ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য সব শব্দ শুনেছে।

'তা হলেই বোঝো,' চোখ বড় বড় করে বলল শীলা। 'তোমার পিছু নিয়েছে ওটা...জলাভূমির ভয়ঙ্কর!'

গা হিম হয়ে গেল নীলুর, শীলার দিকে তাকাতে দেখল তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। ঠিক তখন ঠাণ্ডা কী একটা কাঁধ স্পর্শ করল নীলুর।

পাথর হয়ে গেল মেয়েটা। ঠাণ্ডা জিনিসটা সরসর করে ওর কাঁধ বেয়ে ঘাড়ের দিকে যাচ্ছে, যেন ভেজা, নোংরা একটা ধারাল থাবা ওকে খামচে দিতে চলেছে।

তেরো

'আ-আ-আ-আ!' প্রাণপণে চিৎকার দিল নীলু। লাফ মারল শীলার

দিকে। পরক্ষণে দেখা গেল দুই বান্ধবী লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে। দু'জনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

'বুউউ!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন নীলুর বাবা, ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে একটা কাঁকড়া, কিলবিল করছে–একটা দাঁড়া বেশ বড়, ভেজা, বেগুনী রঙের।

'এই দ্যাখো। কী পেয়েছি,' গর্বের সুরে বললেন তিনি। 'বেগুনী দাঁড়ার কাঁকড়া।'

'বাপি!' হাঁপিয়ে উঠেছে নীলু। 'আরেকটু হলেই ভয়ে মরে যেতাম আমি।'

'সরি,' মুচকি হেসে হাত বাড়ালেন তিনি। প্রথমে নীলুকে, তারপর শীলাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। বিব্রত দেখাচ্ছে শীলাকে। বান্ধবীর সাথে ড. আহমেদ ফয়সালের পরিচয় করিয়ে দিল নীলু।

'তা নতুন বান্ধবীকে নিয়ে কী গল্প হচ্ছিল?' চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জীববিজ্ঞানী।

'আপনারা এ বাড়িতে এসে ঠিক করেননি, আংকেল গম্ভীর মুখে বলল শীলা। 'এটা একটা ভুতুড়ে বাড়ি।'

'আচ্ছা!' সকৌতুকে বললেন ডক্টর। 'তা কার ভূত আছে গো, মামণি!'

'ইউজেনির,' চট করে বলল নীলু। 'সেদিন রাতে ওই মেয়েটাই এসেছিল আমার ঘরে।'

'হা! হা! হা!' হাসিতে ফেটে পড়লেন ডক্টর। 'তাই নাকি?'

'কেন, আপনার কি মনে হয় না এ বাড়িতে ভূত থাকতে পারে?' বলল শীলা।

'ভূত?' বললেন তিনি। 'শোনো, মেয়ে। আমি বৈজ্ঞানিক মানুষ। বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি। ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। আর ভূত বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, বুঝলে? ভূত আছে শুধু মনের

মধ্যে, কুসংস্কার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীলু এবং শীলা। কিছু বলল না।

ড. ফয়সাল বললেন, 'কীরে, নীলু? তুই চেহারাটা অমন করে রেখেছিস কেন? সারাক্ষণ ভূতের ভয় পেলে তো আমি তোর চিন্তায় কোন কাজই করতে পারব না। বললাম তো ভূত বলে কিছু নেই। আর এ বাড়িতে তো নেই-ই। আশা করব, খামোখা ভূত-ভূত করে আমাকে জ্বালাতন করবে না তুমি।' শেষের দিকে সিরিয়াস শোনাল তাঁর কণ্ঠ।

মন খারাপ হয়ে গেল নীলুর। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ে কষ্ট পেয়েছে বুঝতে পেরে আদর করে ওর চুল নেড়ে দিলেন ড. আহমেদ ফয়সাল। গুমোট পরিবেশটাকে হালকা করতে শীলার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি তা হলে সেই বিখ্যাত শীলা, তাই না? নীলু অবশ্য এর আগেও তোমার কথা বলেছে কয়েক বার।' মুখ লাল হয়ে গেল শীলার লজ্জায়। কিছু বলল না।

'হ্যাঁ, বাপি,' উৎসাহিত হয়ে উঠল নীলু। 'ওর কথাই বলেছি তোমাকে। আমি ওর সাথে একটু বেরুচ্ছি।' শীলার হাত ধরল সে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও,' বললেন নীলুর বাবা। 'কোথায় যাবে আগে সেটা বলো।'

'ভয় পাবেন না, আংকেল,' বলল শীলা। 'এই শহরটা আমি আমার হাতের তালুর মতই চিনি। এখানেই জন্ম আমার। মা বলে হাঁটতে শেখার আগেই নাকি আমি সাগরে সাঁতার কেটেছি। আমার নিজের একটা বাইক আছে, আছে একটা ডিঙি নৌকাও। ও দুটো নিজেই চালাতে পারি আমি। আর এখানকার সবাই আমাকে চেনে। সাহায্যের প্রয়োজন হলে শুধু একটা হাঁক দেব। সাথে সাথে একশো লোক হাজির হয়ে যাবে।'

'বাহ, ভারি স্মার্ট মেয়ে দেখছি!' হাসলেন ড. আহমেদ

ফয়সাল। 'তা হলে তোমার হাতে আমার মেয়েকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেয়া যায়। আমি সাগরের দিকে যাব। সৈকতে দুর্লভ প্রজাতির বেগুনী দাঁড়ার কাঁকড়ার সন্ধান পেয়েছি। ওখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত আছি। প্রয়োজন হলে চলে এসো।'

'কিছু ভাববেন না, আংকেল,' বলল শীলা। নীলুকে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। 'কোন সমস্যা হবে না...

দ্রুত বেরিয়ে এল ওরা, দরজা বন্ধ করল সশব্দে। তারপর শীলা ওর অসমাপ্ত বাক্য শেষ করল এই বলে, 'অন্তত এ বাড়ি থেকে যতক্ষণ দূরে আছি!'

চোদ্দ

নীলু আর শীলা যে যার সাইকেলে উঠে পড়ল, চালাতে লাগল সাঁই সাঁই করে।

'কোথায় যাব আমরা?' জিজ্ঞেস করল নীলু।

'মজা করার বহু জায়গা আছে,' জবাব দিল শীলা। 'সৈকতের দিকে যেতে পারি। ওখানে তারা মাছ দেখতে পাবে। তোমাকে কি বলেছি আমি তারা মাছ সংগ্রহ করি? অথবা বেকারিতে ঢুকে পেটপুজাও করা যেতে পারে...'

শীলা একের পর এক ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে, কিন্তু নীলুর কানে ঢুকছে না ওর কথা। সে অন্য কিছু নিয়ে ভাবছে। রাস্তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে নীলু। চওড়া, খালি রাস্তা।

গাছের সারির যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয়েছে জলা।

'কোথায় যাব ঠিক করে ফেলেছি,' বলল নীলু। 'জলাভূমিতে!' তাকাল সে শীলার দিকে, উত্তেজনায় ঝকমক করছে চোখ।

ওর প্রস্তাব শুনে আরেকটু হলে সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্ছিল শীলা।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'ওই ভয়ঙ্কর গল্প শোনার পরেও কোন্ সাহসে তুমি ওদিকে যেতে চাইছ? জলাভূমিতে ভূত আছে। আমি যাব না।'

'চলোই না,' আবেদনের সুরে বলল নীলু। বাড়িতে বসে, দশ মিনিট আগে ইউজেনির গল্প শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু রাস্তায়, খোলা প্রকৃতির নীচে এসে ওর ভয় অনেকটাই কেটে গেছে। বরং কৌতূহল জাগছে জলাভূমিটি দেখার জন্যে।

জলাভূমির ভয়ঙ্কর সম্পর্কে আরও জানতে চায় সে।

'ব্যাপার হলো কি, শীলা,' পটানোর ভঙ্গিতে বলল নীলু। 'আমার বাবা বলেন কোথাও রহস্য দেখলে সেটার সমাধানে এগিয়ে যাওয়া উচিত। জলাভূমির মেয়েটাকে যত দেখতে পাব, ততই ওকে বুঝতে পারবে।'

'ওই ডাইনীকে বোঝার কোন খায়েশ আমার নেই,' বলল শীলা।

'আরে, ওর সাথে তো আর আমরা দোস্তি করব না,' একই ভঙ্গিতে বলল নীলু। 'বুঝতে পারা মানে ওকে ধরতে পারা। ওকে কব্জায় নিয়ে আসা। ওকে হত্যা করা। যাতে আর কোনদিন ও কাউকে ভয় দেখাতে না পারে।'

পনেরো

জলার দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। জায়গাটা অস্বাভাবিক নীরব। আশপাশে বাড়িঘরের চিহ্নও নেই। লোকজন নেই। ক্বচিৎ দু'একটা গাড়ি ফুল স্পিডে ছুটে যাচ্ছে বিপরীত দিকে।

গা ছমছম করে উঠল নীলুর। ভয় ভয় লাগছে।

সামনে, হলদে ঘাসের অরণ্যের মাঝখানে কী যেন একটা দেখতে পেল ও। কাছে আসতে দেখা গেল ওটা কাঠের একটা সেতু, নড়বড়ে। লম্বা ঘাসের ওপর গলা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে খুঁটিতে ভর দিয়ে।

'ওই দ্যাখো,' উত্তেজিত গলায় বলল নীলু। 'আমরা আসল জায়গায় পৌঁছে গেছি।'

জবাবে শীলা বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না। তবে বান্ধবীকে অনুসরণ করল সে। সাঁকোর ওপর সাইকেল নিয়ে সাবধানে উঠল ওরা, হাঁটা দিল জলার দিকে।

জলাভূমির প্রকাণ্ড বিস্তৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল নীলু। কাঠের সেতুর ওপর মোটা মোটা ব্যাঙ বিশ্রাম নিচ্ছিল, ওদের দেখে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। পানির ওপর ঘাস ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ফুলের মত দেখতে বড় বড় সবুজ শ্যাওলা ভুস করে ভেসে উঠছে। আঁশটে একটা গন্ধ আসছে।

'বিশ্রী গন্ধ,' নাক কুঁচকে উঠল নীলুর। 'বৃষ্টি হলে ভাল হতো।

গন্ধটা চলে যেত।"

অবাক কাণ্ড। সাথে সাথে এক পশলা ঠাণ্ডা বৃষ্টি ঝরে পড়ল।

'আরে, এটা কী!' হেসে উঠল নীলু। 'আকাশে মেঘ নেই। সূর্য দিব্যি আলো ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বৃষ্টি।'

হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে শীলা বলল, 'এটাই হলো মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য। গরমের সময় এরকম হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হয় আমাদের এখানে। হয়তো প্রচণ্ড গরমে তুমি ছটফট করছ, পরের মুহূর্তে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেবে তোমাকে। তবে বৃষ্টি হঠাৎ যেমন আসে, তেমনি হঠাৎ চলে যায়।'

শীলার কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন থেমে গেল বৃষ্টি।

'দক্ষিণ ক্যারোলাইনা সত্যি অদ্ভুত জায়গা,' মন্তব্য করল নীলু।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ও একটা ডাল ভেঙে ফেলেছিল, সেটা কাদা পানিতে ছুঁড়ে মারতেই ব্লারপ শব্দ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন পানির নীচে লুকিয়ে থাকা কিছু একটা টেনে নিয়ে গেছে ওটাকে।

উবু হয়ে বসল নীলু, কাদার মধ্যে আঙুল ঢোকাল। ব্লারপ, ব্লারপ। শক্ত কী যেন চেপে ধরল ওর আঙুল, টান মারল নীচের দিকে।

আঁতকে উঠে হাত টানল নীলু, সাদা হয়ে গেছে মুখ। জলাভূমিতে সত্যি বোধহয় ভূত আছে।

তারপর সান্ত্বনা দিতে ফিসফিস করে নিজেকেই যেন শোনাল, 'বোকা মেয়ে, এতে ভয়ের কিছু নেই। এটা প্রকৃতি। ভূত নয়।'

কাঠের সেতুটা বেশ লম্বা, ঘাসের মাঝখান দিয়ে পথ করে চলে গেছে। শেষ মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে ছোট্ট একটা দ্বীপে, ছোট একটা সৈকতও দেখা গেল।

'পিকনিকের জন্য দারুণ জায়গা,' মন্তব্য করল নীলু। একটা গাছের গায়ে হেলান দিল সে সাইকেল, লাফিয়ে নামল স্যাঁতসেঁতে

বালুতে। 'তোমার কী মনে হয়, শীলা?'

কোন জবাব এল না। ঘাড় ঘোরাল নীলু।

'শীলা?'

সেতুর কিনারে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীলা, সৈকতের দূর প্রান্ত দেখিয়ে তুলল কাঁপা একটা আঙুল। ওদিকে তাকাল নীলু। একটা গাছ। তাতে একটা আঁকশি বিঁধে আছে। পাশে শ্যাওলা পড়া প্রকাণ্ড একটা বোল্ডার।

'এ জায়গার গল্পই আমি শুনেছি,' দম বন্ধ করে বলল শীলা। 'এটা সেই গাছ। সেই পাথর।'

কাঁপা কণ্ঠ পরমুহূর্তে আর্তনাদে পরিণত হলো।

'এখান থেকে ভাগো, নীলু। এখানেই সেই ঘটনা ঘটেছে। এখানেই ইউজেনি হেবারস্যাম ডুবে মরেছে।'

ষোলো

'এখানে?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল নীলু।

চারপাশে তাকাল ও। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে ছোট্ট সৈকত। সৈকতের যেখানে শেষ, সেখান থেকে থকথকে, আঠালো কাদামাটি নিয়ে জলার শুরু।

'মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব অসাবধানী ছিল,' বলল ও। 'হাঁটার সময় সবার চোখ-কান খোলা রাখা উচিত। মেয়েটা মনে হয় ওসবের ধার ধারত না। বোকার হদ্দ ছিল বোধহয়।'

কথা শেষ করে মাত্র এক কদম এগিয়েছে, 'আঁউ!' করে চেঁচিয়ে উঠল নীলু। ওর পা আটকে গেছে ছোট্ট একটা গর্তে।

'যেন এইমাত্র মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে গর্তটা,' অবাক হলো নীলু।

'চোখ-কান খোলা না রেখে এখন কে হাঁটে,' সেতুর ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল শীলা। 'চলে এসো। ফিরতে হবে।'

গর্ত থেকে পা টেনে তোলার চেষ্টা করল নীলু।

ব্লারপ, ব্লারপ, ব্লারপ।

'ওহ্ না!' গুঙিয়ে উঠল ও। 'আমার জুতোটা গেছে!'

গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল নীলু জুতো বের করতে। হাতে জুতোর ফিতে বাঁধল। টান দিল। পড়াৎ করে বেরিয়ে এল কাদামাখা জুতো।

'হেই, পেয়েছি।' শীলাকে উদ্দেশ্য করে বলল ও।

কিন্তু শীলা জবাব না দিয়ে নীলুর কাঁধের ওপর দিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে। আর্তনাদ করে উঠল ও।

'কী হলো?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল নীলু। ঘুরল।

দেখল জলার মাঝে এইমাত্র একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। হতভম্ব হয়ে ওদিকে তাকিয়ে রইল নীলু। গর্তটা ঠিক গর্ত নয়, যেন হাঁ করা বিশাল একটা মুখ। মুখটাতে দাঁত নেই, বদলে ঘাসের শিকড় ঝুলছে। গলা নেই, আছে একটা টানেল।

বিকট টানেলটা নীলুকে গ্রাস করতে হাঁ করে আছে মুখ।

'ইইইইইই!' বিকট চিৎকার দিল নীলু। দৌড়াতে চাইল, কিন্তু কে যেন মাটির সাথে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরল পা জোড়া।

নীচে তাকাল নীলু। জলার ঘাস জড়িয়ে আছে গোড়ালি, চাপ পড়ছে পায়ে, টানছে ওকে।

ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে হাঁ করা ভয়ঙ্কর গর্তটার মধ্যে।

সতেরো

'শী-ই-ইলা-আ-আ!' কেঁদে উঠল নীলু। 'আমাকে বাঁচাও।'

কাদার তৈরি মুখটা ওর পায়ে কামড় বসাচ্ছে। ভাগ্য বলতে হবে ঘাসের দাঁত ওর পায়ে আঁচড়ের সৃষ্টি করতে পারছে কেবল, চামড়া ভেদ করতে পারছে না।

মুখটা ওকে অনবরত টেনেই চলেছে। হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে গেছে ও কাদার মধ্যে।

'ইইইইইআ,' গলা ফাটাল নীলু। 'আমাকে খেয়ে ফেলল!'

লাথি মারার চেষ্টা করল ও, কিন্তু আঠালো কাদা এমনভাবে চেপে ধরেছে, নড়তে পারছে না নীলু। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। ও কীসের শব্দ?

'ইইইইইই আহহহহ। ইইইইইই-হিইই-হিইই!'

খাবি খেল নীলু। রাতের বেলা জানালা দিয়ে ঠিক এমন চিৎকার শুনেছে সে দিন দুই আগে। তবে ভয়ঙ্কর কণ্ঠটাকে এখন মনে হচ্ছে হাসছে।

'ইইইইইই-হিইই-হিইই,' খলখল করে উঠল কণ্ঠটি।

'জলাভূমির ভূত মেয়েটা!' গোঙানি বেরুল নীলুর গলা দিয়ে। 'আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে!'

'খবরদার কাছে আসবি না,' বলে এক লাফে নীলুর পাশে পৌঁছে গেল শীলা। হাত বাড়িয়ে দিল। 'হাতটা ধরো, নীলু। আমি

তোমাকে টেনে তুলছি।'

মরিয়া হয়ে শীলার বাড়ানো হাত চেপে ধরল নীলু। ওকে ধরে প্রাণপনে টানতে লাগল শীলা। কিন্তু নীচ থেকে যেন শক্ত করে ধরে আছে কেউ নীলুর পা, ওকে উঠতে দেবে না।

সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী নয় শীলা। সে টানতেই লাগল নীলুকে। ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল, কপালে ঘাম জমল। হঠাৎ সড়াৎ করে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল নীলুর পা, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে শীলার ওপর। পরক্ষণে দেখা গেল দু'জনেই গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

কাদা মেখে ভূত হয়ে গেল দু'জনেই। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটল বাইক লক্ষ্য করে। ঠিক তখন, পেছন থেকে ভয়ঙ্কর গলায় হেসে উঠল জলাভূমির ভয়ঙ্কর।

'ইইইই-হিইই, ইইইই-হিইই-ইইই!'

'পিশাচী এখনও যায়নি,' আঁতকে উঠল নীলু। 'শীলা, পালাও! জলদি!'

আঠারো

এক লাফে বাইকে উঠে পড়ল দুই বান্ধবী, সাঁই সাঁই করে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল।

কাঠের সেতু এমন ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, নীলুর ভয় হলো ওরা ছিটকে পড়ে যাবে বাইক থেকে। কিন্তু গতি কমাল না

মোটেই। বাড়িয়ে দিল আরও। ওর মাথার ভেতর এখনও প্রতিধ্বনি তুলছে ভয়ঙ্কর হাসিটা।

রাস্তায় উঠে আসার আগ পর্যন্ত ওরা একবারও পেছন ফিরে দেখেনি। ভেবেছে পেছন ফিরলেই দেখবে জলাভূমির ভূতটা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

এবার পেছন ফিরে দেখল নীলু। কেউ ওদের তাড়া করছে না।

'ওটা আমাদের তাড়া করল না কেন বুঝতে পারছি না,' বলল সে।

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল শীলা। 'আগে ভাগো শিগ্গির।'

প্যাডেলের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা, ঝড়ের বেগে চালাতে লাগল। বাধ্য হয়ে নীলুকেও একই কাজ করতে হলো।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি সাইকেল চালাল ওরা নীরবে, অবশেষে বিস্ফোরিত হলো শীলা।

'প্রথমে তুমি ওর সমস্ত জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করেছ এবং তার জামাও গায়ে দিয়েছ,' বলল সে রাগ নিয়ে। 'তারপর আবার ওকে বোকার হদ্দ বলার সাহস দেখিয়েছ। এজন্যেই জলাভূমির মেয়েটা চটে গেছে তোমার ওপর।'

'হতে পারে,' বলল নীলু। 'কিন্তু আমি কী করে জানব ওই বাড়িতে মেয়েটার ভূত আছে?'

'এবার ঠিক আমাদের ওপর চড়াও হবে ও,' বলল শীলা।

'যদি না তার আগে ওকে কব্জা করতে পারি।' মন্তব্য করল নীলু।

শীলা অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল বান্ধবীর দিকে।

'তুমি ওকে কব্জা করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কীভাবে?'

জবাবে কিছু বলল না নীলু। ঠিকই তো কীভাবে একটা ভূতকে কব্জা করবে ও। গভীর ভাবনায় ডুবে গেল নীলু।

উনিশ

নীলুকে নিয়ে শীলা ওদের বাড়িতে চলে এল। বেকারির সাথেই বাসা।

শীলার মা রান্নাঘরে, টেরই পেলেন না তাঁর মেয়ে এক বান্ধবীকে নিয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছে, তারপর বাথরুমে গিয়ে গা-হাত পা ধুয়ে এসেছে।

'আমার জামার সাইজ তোমার মতই,' শীলা নিজের বেডরুমে ঢুকে বলল, 'নাও, আমার জামা পরো।' একটা টি শার্ট দিল সে নীলুকে। তারপর ফ্রিজ খুলে চিংড়ি আর সালাদ নিয়ে এল।

খেতে খেতে নীলু বলল, 'জলাভূমির ভূতটা সম্পর্কে আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যায় ভাবছি। তোমাদের এখানে লাইব্রেরি বা মিউজিয়াম নেই?'

'আছে একটা মিউজিয়াম। লাইব্রেরিও আছে। তবে ওতে তোমার কাজ হবে বলে মনে হয় না,' বলল শীলা। 'দুটোর কোনটাই কম্মের নয়।'

'হুমম,' বলল নীলু। হঠাৎ লাফ মেরে উঠল। 'আচ্ছা, এমন কোন বয়সী মানুষও কি নেই যে হেবারস্যাম পরিবার সম্পর্কে জানে?'

নিজের কপালে টোকা দিল শীলা।

'ইস্, কথাটা আগে যে কেন মনে পড়েনি!' ও-ও লাফ দিল।

'আমার খালা ভিক্টোরিয়া। কবিরাজ। উনি সব জানেন। মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের ইতিহাস তাঁর কণ্ঠস্থ।'

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল নীলু। 'তা হলে চলো এক্ষুণি তোমার খালার বাসায় যাই।'

বিশ

ভিক্টোরিয়া খালার বাসা দ্বীপের শেষ মাথায়। এবার আর সাইকেলে নয়, পায়ে হেঁটে, গল্প করতে করতে দুই বান্ধবী রওনা হলো। অবশেষে হাজির হলো অদ্ভুত, লঝ্‌ঝরে একটি বাড়ির সামনে।

এমন অদ্ভুত বাড়ি জীবনে দেখেনি নীলু। ঘরগুলো বিশ্রী ভঙ্গিতে যেন গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে বাড়িটার। গোটা বাড়ি মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের প্রাচীন বৃক্ষের মত ঝুঁকে আছে।

'কী ভাবছ বুঝতে পারছি,' বলল শীলা। 'আমার খালা পাগল টাইপের মানুষ। যখনই তাঁর মনে হয় আরও জায়গার দরকার, সাথে সাথে রুম তুলে ফেলেন। জিনিসটা কেমন দেখাবে তার ধার ধারেন না মোটেই। এজন্যেই মা খালাকে নাম দিয়েছেন "খেয়ালী"।'

'যথার্থ নামই বটে,' বলল নীলু। পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে, রহস্যময় বাড়িটার ভেতর কেমন দেখতে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ও।

বান্ধবীকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল শীলা, দরজার সাথে

লাগানো কলিংবেল টিপল। 'ভিক্টোরিয়া খালা,' গলা চড়াল সে। 'আমি, শীলা।'

ক্যাচ ম্যাচ করে এক ইঞ্চি পরিমাণ খুলে গেল দরজা। ওখানে উঁকি দিল এক জোড়া বাদামী চোখ। চোখের ওপর পাপড়িগুলো সাদা, চারপাশে অসংখ্য ভাঁজ, রঙটা বাদামী। তবে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ। তীক্ষ্ণ চোখ দুটি নীলু আর শীলাকে জরিপ করল বার কয়েক। তারপর পুরোপুরি উন্মুক্ত হলো কবাট। উদয় হলো থলথলে একটা মুখ, দাঁতগুলো যেন সাদা মুক্তো। চওড়া হাসিতে কুঁচকে গেল মুখখানা।

'ছোট্ট শীলা,' চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা। 'আমার পুতুল সোনা। আয় আয়। ভেতরে আয়।'

শীলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তিনি। নীলু লক্ষ করল ঘরের মাঝখানে একটা ঝর্ণা। দেয়াল বলতে কিছু নেই চারপাশে, বদলে বৃত্তাকারে দরজা আছে গোটাসাতেক।

ভিক্টোরিয়া খালার পরনে ঢোলা প্যান্ট আর লম্বা টিউনিক। টিউনিকের গায়ে পশু-পাখির ছবি। তাঁর মাথার চুল সাদা। তাতে শীলার মত অনেকগুলো বেণী।

শীলাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে নীলুর দিকে ফিরলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, 'এই মেয়েটা কে রে?'

'ও নীলু, খালা। জিনাত সুলতানা নীলু। বাংলাদেশের মেয়ে। তবে আমেরিকায় থাকে।' বলল শীলা। 'আমার নতুন বান্ধবী! হেবারস্যাম ম্যানসনে উঠেছে ও ওর বাবার সাথে গরমের ছুটিতে। তোমার সাথে কথা বলতে এসেছে।'

'সাহসী মেয়ে,' বলে একটা দরজার দিকে পা বাড়ালেন ভিক্টোরিয়া।

পেছন পেছন এগোল দুই বান্ধবী।

একটা ফ্যান্সি রুমে ঢুকলেন ভিক্টোরিয়া। এ ঘরে লম্বা লম্বা

চেয়ার, ঝকঝকে সোফা আর অভিজাত লাউঞ্জ দেখে অবাক হয়ে গেল নীলু।

'এটা খালার বৈঠকখানা,' ফিসফিস করে বলল শীলা। 'শুধু বিশেষ অতিথিদেরকে তিনি এখানে বসার সুযোগ দেন।'

'বসো তোমরা।' বলে একটা সোফায় বসলেন ভিক্টোরিয়া। তাকালেন নীলুর দিকে। 'হ্যাঁ বলো। কী জানতে চাও।'

'ইয়ে মানে, খালা,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল নীলু। 'আমি একটা মেয়ের সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চাই। মেয়েটার নাম ইউজেনি হেবারস্যাম। এখানকার লোকজন তাকে বলে–"জলাভূমির ভূত" বা "জলাভূমির ভয়ঙ্কর"।'

বাধা দিলেন ভিক্টোরিয়া। 'তবে যে গল্প শোনা যায় মেয়েটিকে নিয়ে সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। ওই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকদিন কেউ নাড়াচাড়া করেনি...'

'আপনি মেয়েটাকে দেখেছেন কখনও?' জানতে চাইল নীলু।

'আরে, না,' বললেন ভিক্টোরিয়া খালা। 'ওকে কেউ দেখেনি। শুধু ওর গল্পই শুনেছে।' ঝুঁকে এলেন তিনি নীলুর দিকে। 'তুমি ওকে দেখেছ?'

'জি, না।' ভীরু গলায় বলল নীলু। 'তবে মেয়েটার হাসির শব্দ শুনেছি। ওর কথাও শুনেছি। আমাকে সাবধান করে দিয়েছে ওর জিনিসগুলো যেন আমি নিজের ভাবতে না যাই।'

মুচকি হাসলেন ভিক্টোরিয়া।

'ইউজেনি ওরকমই,' বললেন তিনি। 'ভয়ানক স্বার্থপর।'

'ওকে তুমি চিনতে, খালা?' প্রশ্ন করল শীলা।

'নারে। তবে আমার মা দেখেছে ওকে,' কর্কশ শোনাল খালার কণ্ঠ। 'কিশোরী বয়সে মা ইউজেনির ফাইফরমাশ খেটে দিত। তখন ক্রীতদাসদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইউজেনি আমার মা'র সাথে ক্রীতদাসীর মত আচরণ করত। খুব খারাপ ব্যবহার

করত। একবার মা ওর একটা ড্রেস পরেছিল লোভ সামলাতে না পেরে। ইউজেনি এত জোরে মাকে চড় দেয়, মা অজ্ঞান হয়ে যায়।'

নীলু শিউরে উঠল।

'ইউজেনির ভাগ্যে যা ঘটার কথা ছিল তাই ঘটেছে,' উপসংহার টানলেন ভিক্টোরিয়া। 'ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল মেয়েটা। কেউ তার জিনিস ধরলে তার জীবন নরক করে ছাড়ত।'

'ও আমার জীবন নরক করতে চায় না,' গুঙিয়ে উঠল নীলু। 'আমাকে নরকে নিয়ে যেতে চায়। মেরে ফেলতে চায়।'

তারপর পুরো ঘটনা খুলে বলল সে ভিক্টোরিয়াকে।

'তোমার বিখ্যাত গুল্লা ওষুধ দিয়ে ওকে শায়েস্তা করা যায় না?' আশা নিয়ে জানতে চাইল শীলা।

ভিক্টোরিয়া রাগ নিয়ে তাকালেন বোনঝির দিকে।

'শোন, পুতুল সোনা,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'আমার গুল্লা কাউকে শায়েস্তা করার জন্যে নয়। কাউকে মোকাবিলা করতে চাস তো বিদ্যা আর বুদ্ধি দিয়ে কর। তবে তোদের একেবারে হতাশ করতে চাই না আমি। একটা কাজ কর—তোরা তো আর জানিস না জলার ভূতটা কেমন দেখতে, কী দিয়ে তৈরি। তোরা জলাভূমিতে যা। সম্ভব হলে দেখে আয় ওটার আসল চেহারা তারপর আমার সাথে যোগাযোগ করিস। তখন দেখব কী করা যায়। এখন তা হলে তোরা যা।'

'কিন্তু কীভাবে ওর দেখা পাব, খালা?' হাউমাউ করে উঠল দু'জনে একসঙ্গে।

'তোরা তো চালাক-চতুর আছিস। নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখ। পেরে যাবি। আমি উঠি। গ্রীন হাউসে কাজ আছে।'

উঠে দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়া। তাঁর পিছু পিছু আবার ঝর্ণা ঘরে ঢুকল দুই বান্ধবী। সাতটা দরজার একটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন

বৃদ্ধা। খুললেন। সবুজ গাছপালা দেখা গেল ঘরের ভেতর।

'বাইরে যাবার দরজাটা তো তোর চেনাই আছে, শীলা?' বললেন তিনি। 'আবার আসিস কেমন?'

বলে গ্রীন হাউসে ঢুকে পড়লেন তিনি।

একুশ

খালার বাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুই বান্ধবী। ফেরার পথে সারাটা রাস্তা চিন্তা করতে করতে এল নীলু জলাভূমির পিশাচীকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়।

'একটা কাজ করি চলো,' বলল সে শীলাকে। 'মিষ্টির লোভ দেখিয়ে মেয়েটাকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসি

'আরে নাহ্, তেতো স্বভাবের মেয়েটার মিষ্টি পছন্দ হবে বলে মনে হয় না,' বলল শীলা।

'মেয়েটার ঘরের বাইরে, ব্যালকনিতে একটা ফাঁদ পাতব আমরা,' পরামর্শ দিল নীলু। 'থ্রি স্টুজেস-এর মত ওর পা লক্ষ্য করে ল্যাসো ছুঁড়ে দেব, তারপর ঝুলিয়ে রাখব ছাদে।'

'বেশ হবে!' এবার আইডিয়াটা পছন্দ হলো শীলার। 'কিন্তু কাজটা করবে কীভাবে?'

'এখনও জানি না,' স্বীকার করল নীলু। 'গবেষণা করতে পারলে ভাল হতো। তবে এতে সময়ের দরকার। আর আমাদের কিছু জিনিসপত্রও কিনতে হবে। তার মানে বাপির কাছে হাত

পাততে হবে। আর বাপি ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলে নির্ঘাত ভেটো দেবে। তখন সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। নাহ্, আমার দেখছি গরমের ছুটির পুরোটা সময় ভূতের তাড়া খেয়ে পালাতে হবে।'

বাসার সামনে এসে নীলু বলল, 'চলো, সাঁতার কেটে আসি।'

'ঠিক এ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি তোমাকে,' বলতে বলতে টি শার্ট খুলে ফেলল শীলা। নীচে ঝলমলে, সবুজ রঙের বেদিং সুট পরে আছে ও।

'আমি শুধু ভেতরে ঢুকে কাপড় বদলে চলে আসব,' বলল নীলু।

'আমি সৈকতে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে,' বলল শীলা।

নীলু দুরু দুরু বুকে, পা টিপে টিপে এগোল ইউজেনির বেডরুমের দিকে।

'আমাকে যে কাজটা স্রেফ করতে হবে,' জোরে জোরে বলল ও, 'আমার জামাকাপড় নিয়ে কেটে পড়ব।'

কিন্তু পেতলের নবঅলা দরজার সামনে দাঁড়াতেই ওর বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল। নব ধরে ঘোরাতেই নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

ঘরের ভেতর উঁকি দিল নীলু।

'হ্যালো,' ফিসফিস করল ও। ঘরটা অস্বাভাবিক নীরব। ছোট্ট টি সেটটি বিকেলের আলো লেগে ঝলমল করছে।

তবে ভাগ্য ভালই বলতে হবে, নীলুকে সুটকেস বা অন্য কিছু খুলতে হলো না। সুটকেসের ওপর স্তূপ করা আছে জামাকাপড়।

গভীর দম নিয়ে ঝট করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল নীলু। দ্রুত প্রয়োজনীয় জামাকাপড় আর সুটকেসটা নিয়ে এক লাফে পরমুহূর্তে ঘরের বাইরে চলে এল।

পেরেছে নীলু।

নিজের বোকামিতে ওর এখন হাসি পাচ্ছে। বেডরুমে তো আর

সত্যি সত্যি কোন ভূত নেই। অন্তত দিনের বেলা সেরকম ভয়ের কিছু নেই।

ছোট একটা বেডরুমে জামাকাপড় আর সুটকেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেদিং সুট গায়ে চড়াল নীলু।

এক দৌড়ে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু থমকে দাঁড়াল ও, ঘুরল–ফিরে চলল ইউজেনির রুমে। জলাভূমির ভূত মেয়েটা ওকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

'ওর বেডরুমেই পাত্তা লাগাই না কেন?' নিজেকে ফিসফিস করে শোনাল নীলু। 'শুধু বুকে সাহস নিয়ে শেষবারের মত ঘরটা খুঁজে দেখলেই হলো।'

আবার ওই ঘরে ঢুকল নীলু। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ক্লজিটের দিকে। ইউজেনির ড্রেসগুলো পরীক্ষা করল। হেয়ারব্রাশ আর আয়নাতে খোদাই করা নাম দেখল।

কিন্তু নতুন কোন বুদ্ধি এল না মাথায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, চোখ আটকে গেল ঝলমলে টি সেটের ওপর।

আর ঠিক তখন বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেল।

দ্রুত নেমে এল নীলু সিঁড়ি বেয়ে, রান্নাঘর দিয়ে ঢুকে, পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর এক দৌড়ে সাগর সৈকত। শীলা ততক্ষণে নেমে গেছে পানিতে।

'শীলা!' ডাকল নীলু, দৌড়ে গেল। 'পেয়েছি!'

'কী পেয়েছ?' জানতে চাইল শীলা।

'একটা টি পার্টি দেব আমরা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল নীলু। 'ইউজেনির টি সেট দিয়ে। ওর হেয়ারব্রাশও ব্যবহার করব আমরা। ওকে ধরার মোক্ষম উপায় হলো ওর সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা। ওর টি সেট ধরলেই ও এখানে চলে আসবে।'

খাবি খেল শীলা।

'বুঝলাম। কিন্তু ভূতটা যদি সত্যি সত্যি এসে পড়ে তখন কী করব আমরা?'

'জানি না,' কপালে ভাঁজ পড়ল নীলুর। 'সত্যি জানি না কীসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি আমরা। তবে একটা কথা নিশ্চিত জানি এখানে একবার এলে আর জলায় ফিরে যেতে হবে না ওকে। আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।'

'বলো আমাদের!' প্রতিবাদ করল শীলা।

'ঠিক!' বলল নীলু। 'কাল রাতেই পার্টির ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? তোমার মাকে বলবে আমার বাসায় কাল রাতে থাকবে–আর আমার বাবা ঘুমিয়ে যাবার পর আমরা জলাভূমির ভয়ঙ্করটার মুখোমুখি হব।'

বাইশ

সে রাতে জিনাত সুলতানা নীলু দাঁড়িয়ে ছিল তার নতুন ঘরের জানালার সামনে। ঘরটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু নিরাপদ তো।

বেলাভূমিতে ঢেউ ভেঙে পড়ার ছলাৎ ছল শব্দ শুনতে পাচ্ছিল নীলু। চাঁদের আলোয় রুপোর মত চকচক করছে সবকিছু। জানালার নীচে, ঝোপে কী যেন একটা খসখস করে উঠল।

লাফ মেরে উঠল নীলু।

ঝোপটা নড়ছে।

'কে ওখানে?' ভয়ে সিঁটিয়ে গেল ও।

অন্ধকার ঝোপ। কিছু দেখা যায় না। নীলু বুঝতে পারল ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখে ও মস্ত ভুল করেছে। বাইরে যে-ই থাকুক, দেখতে পাচ্ছে ওকে পরিষ্কার।

বিছানায় ডাইভ দিয়ে পড়ল নীলু, হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ অফ করল। ঝপ করে আঁধার নেমে এল ঘরে। আরও ভয় ভয় করতে লাগল নীলুর। আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভীত চোখে তাকাচ্ছে বেলাভূমি আর ঝোপের দিকে।

'ইস্, এখন যদি একটা ফ্ল্যাশলাইট পেতাম!' বিড়বিড় করল ও। কালি গোলা অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে কী আছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও।

ভেজা পায়ের আওয়াজ।

কেউ আসছে জানালার নীচ দিয়ে।

থপ থপ থপ (বিরতি) থপ। থপ। থপ। (বিরতি)

এটা নির্ঘাত জলাভূমির সেই পিশাচী। নীলুকে ধরতে আসছে।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল নীলু।

থেমে গেছে পায়ের শব্দ। নীলু শ্বাস নিতে ভুলে গেছে, শরীরের একটা পেশী পর্যন্ত নড়াতে ভয় পেল।

তখন, বাইরে, গুঙিয়ে উঠল কে যেন। পৈশাচিক কণ্ঠে কে যেন ওকে অভিশাপ দিচ্ছে। ঠিক ইউজেনির রুমের সেই ভুতুড়ে গলাটার মত।

তারপর আবার কিছু একটা নড়ে উঠল। লাফিয়ে উঠল নীলু।

উঁকি দিল অন্ধকারে। অস্পষ্ট একটা আকৃতি দেখতে পেল ও, কুঁজো হয়ে হাঁটছে সাগরের দিকে।

চোখ ঘষল নীলু, কাঠামোটাকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে চায়। ছোট্ট, কুঁজো শরীরটাকে শুধু দেখতে পেল ও। কোন মুখ নয়, চুল নয়, অন্য কিছু নয়।

'ধ্যাত্তেরি!' বলল নীলু।

জলাভূমির ভয়ঙ্কর সৈকতে চলে এসেছে, নেমে পড়ল ঢেউয়ের মধ্যে। কোমর পর্যন্ত ডুবে যাবার পর থেমে দাঁড়াল। এরপর আবার পানির ভেতর হাঁটতে শুরু করল। বুক পর্যন্ত উঠে এল পানি। এরপর সে স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল নীলুর চোখ।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে কালো, চকচকে একটা বৃত্ত দেখতে পেল সে, জলার ভূত মেয়েটা যেখানে 'নেই' হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে রইল নীলু। অপেক্ষা করছে মেয়েটা কখন ভেসে উঠবে।

কিন্তু আর ভেসে উঠল না। স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সে।

তেইশ

'এই যে এসে পড়েছি আমি,' নীলু দরজা খুলে দিলে শুকনো মুখে বলল শীলা। 'তোমার টি পার্টির জন্য রেডি।'

'ধরে নাও আমরা অ্যাডভেঞ্চারে বেরুচ্ছি,' হাসল নীলু। 'মুখটা অমন পচা করে রেখো না তো। তা হলে কোন মজা পাব না। জানো, পাঁচ বছর বয়সে আমি শেষ টি পার্টির আয়োজন করেছিলাম।'

হাসিমুখে কথাটা বললেও ভেতরে কিন্তু কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে

গেছে নীলুর।

শীলা কিছু না বলে বান্ধবীর সাথে চলে এল দোতলায়।

ওরা পা টিপে টিপেই হাঁটছিল, কিন্তু ড. আহমেদ ফয়সালের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কীভাবে যেন টের পেয়ে গেলেন তিনি। আসলে বাবা-মা'দের ফাঁকি দেয়া খুব কষ্ট।

'এই যে, মেয়েরা,' ডাকলেন তিনি।

কুঁকড়ে গেল নীলু। বাবা ব্যাপারটা টের পেলে সব ভেস্তে যাবে।

'বাবা যা-ই জিজ্ঞেস করুক না কেন,' ফিসফিস করে বলল সে শীলাকে। 'ভূত শব্দটা একদম উচ্চারণ করবে না।'

ঘরের ভেতর উঁকি দিল ওরা, ড. ফয়সাল বসে আছেন একটা ইজি চেয়ারে, কাঁকড়ার ছবি আঁকছেন।

'কেমন হয়েছে?' ছবিটি দেখালেন তিনি ওদের। খুবই বাজে হয়েছে। কাঁকড়া বলে চেনাই যায় না।

'খুব সুন্দর হয়েছে, বাপি,' বলল নীলু। 'আচ্ছা, গুডনাইট।'

'দাঁড়া। দাঁড়া,' বললেন তিনি। 'কাল খুব ভোরে আমাকে সৈকতে ছুটতে হবে। কাজেই আমি চাই না রাতে তোরা হৈ হুল্লোড় করে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাস।'

'একটুও ব্যাঘাত ঘটাব না, আংকেল,' বলল শীলা। 'টেরই পাবেন না আমরা ঘরে আছি।'

ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল ওরা ডক্টরের ঘর থেকে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চলল ইউজেনির ঘরের দিকে।

'আলো! আগে আলো জ্বালো!' কিচমিচ করে উঠল শীলা। দ্রুত সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল শীলা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দু'জনই। দু'জন আছে বলে ঘরটাকে এখন আর ভৌতিক মনে হচ্ছে না।

'কাজে লেগে পড়ি কী বলো?' বলল নীলু।

ব্যালকনির দরজা খুলল ও, ফলে সহজে বারান্দায় যেতে পারবে ওরা, দেখতে পাবে জলাভূমির ভূতকে। ঠাণ্ডা চা'র বোতল খুলল নীলু, ঢালল টি পটে।

তারপর খুলল ক্লজিট।

'তুমি সানহ্যাটটা পরবে মাথায় আর আমি লেস দেয়া মোজা পরব হাতে।' বলল সে।

'আচ্ছা,' কাঁপা গলায় বলল শীলা। চওড়া কিনারার হ্যাটটা মাথায় চাপাল ও, চিবুকে গোলাপী ফিতে বাঁধার সময় ভীরু দৃষ্টিতে তাকাল আয়নার দিকে।

'হেই,' বলল ও। 'হ্যাটটা কী সুন্দর দেখেছ!'

'দেখেছি,' বলল নীলু। সে ভ্যানিটি টেবিল থেকে একটা হেয়ারব্রাশ তুলে নিল।

শীলা গেল ক্লজিটের সামনে, একটা শাল বের করে মুড়ে নিল কাঁধ।

'বাহ্, দারুণ লাগছে তো,' চোখের পাপড়ি পিটপিট করল সে বার কয়েক অভিনেত্রী স্কারলেট ও'হারার মত।

খিলখিল হাসল নীলু। পা বাড়াল টি টেবিলের দিকে।

'ক'কাপ চা খাবে গো তুমি?' গেয়ে উঠল সে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে। 'নয় নাকি দশ?'

উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ল দু'জনেই। তারপর চা পান করতে লাগল।

'হি হি,' আবার হাসল নীলু, হাসতে হাসতে দম প্রায় বন্ধ হবার অবস্থা। 'আজ বোধহয় জলাভূমির ভূত আর আসবে না।'

'খুউব...খারাপ...' চেনা, ভুতুড়ে কণ্ঠটা এই সময় কথা বলে উঠল।

'ইইইইই!' চিৎকার করে উঠল মেয়ে দুটি, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। 'ও এখানে!'

'ইইইই আহ্‌হ্‌হ্‌, ইইইই আহ্‌হ্‌হ্‌হ্‌।' গর্জে উঠল জলাভূমির ভূত। মনে হলো জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ও। আবার 'ইহিহিহি' করে চিৎকার ছাড়ল সে।

তারপর ব্যালকনির দরজার নব অদৃশ্য টানে মোচড় খেতে শুরু করল।

'ও-ওটা তালাবন্ধ ছিল না?' শিউরে উঠল শীলা।

'আমি তালা খুলেছি,' চিৎকার করল নীলু।

'বেশ করেছ,' বলে দড়াম করে ঘরের এককোণে পড়ে গেল শীলা।

নীলুর হাতে ইউজেনির রুপোর চিরুনি। কিন্তু অস্ত্র হিসেবে এটা ভূতের বিরুদ্ধে কোনই কাজে আসবে না। তবু ওটা বাগিয়ে ধরে দরজার দিকে ফিরল ও।

জলাভূমির ভূত দরজার নব নিয়ে টানাটানি করছে। ভেতরে ঢুকতে পারছে না। নীলু প্রার্থনা করল যেন ঢুকতে না পারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো দরজা, বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল জলাভূমির ভয়ঙ্কর।

চব্বিশ

জলাভূমির ভূত এমন বীভৎস হবে কল্পনাও করেনি নীলু। মেয়েটা ওরই বয়সী, তবে কুঁজো হয়ে আছে আশি বছরের বুড়ির মত।

তবে রূপকথার ডাইনীদের মত পাটখড়ি চেহারা বা হাড্ডিসার

শরীর নয় তার। মনে হলো গোটা কাঠামো মাটি দিয়ে তৈরি।

পিশাচ মেয়েটা হাত জোড়া ভীতিকর ভঙ্গিতে বাঁকা করে আছে, কাদা গলে গলে পড়ছে হাতের ফাঁক দিয়ে। মুখ নয়, যেন বালু আর আবর্জনার শ্যাওলা ধরা স্তূপ, পিচ্ছিল গা বোঝাই জলার পচা ঘাস-পাতা।

এক কদম সামনে বাড়ল পিশাচী। ভক করে পচা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল নীলুর। জলার পচা পাঁকের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে।

'ইইইইইইইই,' চিৎকার দিল জলাভূমির ভয়ঙ্কর। ওর হাঁ করা মুখে দাঁতের বালাই নেই, প্রকাণ্ড হাঁ থেকে আঠালো কাদা গলে গলে পড়ল মেঝেতে।

তারপর লাফ দিল ওটা নীলুকে লক্ষ্য করে। হেয়ারব্রাশ দিয়ে আত্মরক্ষার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দৌড় লাগাল নীলু। একটুর জন্যে পিশাচী ধরতে পারল না নীলুকে, বিদ্যুৎগতিতে পাশ কাটিয়ে গেল ও, লাফ মেরে চলে এল বিছানার পেছনে। তাড়া করল ওকে জলার ভূত। কাদামাখা হলে কী হবে, ভূত মেয়েটার চলার গতি মোটেই মন্থর নয়, বরং দ্রুত। আর শক্তিশালী।

আরেক লাফে বিছানায় উঠে এল জলাভূমির ভয়ঙ্কর। সুন্দর বেডশীটটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। আবার লাফ দিল ওটা নীলুকে লক্ষ্য করে।

গোঙানি বেরিয়ে এল নীলুর গলা থেকে। তবে ঠিক সময়েই পিশাচীর থাবা থেকে সরে গেল দূরে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে দৌড় দিল বেডরুমের দরজার দিকে। ওর ইচ্ছে দরজা খুলে কেটে পড়বে। হঠাৎ শীলার কথা মনে পড়ল। শীলাকে বিপদের মুখে ফেলে এভাবে যেতে পারে না সে। কিন্তু শীলা কোথায়? দেখা যাচ্ছে না ওকে।

জলাভূমির ভূতকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে বান্ধবীর দিকে

তাকাবার ফুরসত পায়নি নীলু। আর এতক্ষণে শীলাও কোন কথা বলেনি।

নীলু পৌঁছে গেছে দরজার কাছে, নব ধরে টান দিল। কিন্তু খুলল না দরজা।

'কাছে আসবি না। খবরদার।' কাঁদো কাঁদো গলায় শাসাল সে জলার ভূতকে।

কিন্তু দানবীটা ওকে পাত্তাই দিল না। তার ঠোঁট বেঁকে গেল কুটিল হাসির ভঙ্গিতে। পা বাড়াল নীলুর দিকে।

'ইইইইইই হিইইই হিইইই,' নিঃশ্বাস ছাড়ল ওটা, পচা ডিমের গন্ধঅলা বাতাস ধাক্কা দিল নীলুকে।

নীলু আতংকিত চোখে চেয়ে আছে জলাভূমির ভয়ঙ্করের পোশাকের দিকে। নড়ছে ওটা!

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ও। জামা নয়, পিশাচী সাপের একটা কোমরবন্ধ পরে এসেছে। মোচড় খাচ্ছে কালো কালো সাপ।

ভৌতিক মূর্তিটার পায়ের আঙুলের ফাঁকে বড় বড় পোকা কিলবিল করছে।

'বীভৎস!' বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেল নীলুর কণ্ঠে। হঠাৎ টি পটের কথা মনে পড়ে গেল ওর। পিশাচীর গায়ে চা ছুঁড়ে মারলে কেমন হয়?

নোংরা হাত দুটো নীলুর গলা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে, পিছু হটতে গিয়ে টি টেবিলের সাথে ধাক্কা খেল। সাথে সাথে কাপ পিরিচ ভেঙে একসা। শুধু টি পটটা খাড়া হয়ে রইল। নীলু ওটা ধরে বলল, 'এই নে, শয়তানী। চা খা!' বলে টি পট ছুঁড়ে মারল ডাইনীর গায়ে। মুখে নয়, কাঁধে লাগল ওটা ওর।

ভয়ানক রাগে মুখ খিঁচাল জলার ভূত, আস্তে আস্তে, ওদের চোখের সামনে একটা হাত অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

পঁচিশ

'আ আ আ!' আর্তনাদ করে উঠল নীলু। চোখের সামনে অমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখে ওর আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড়।

এক হাত নিয়ে ফোঁপাচ্ছে পিশাচী, ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীলুর দিকে।

নীলু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল ওর দিকে।

তারপর, আরেকটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। নীলু দেখল পিশাচীর কাটা হাতের পাশ দিয়ে আরেকটা হাত গজিয়েছে। নতুন হাতটা আগেরটার চেয়েও লম্বা আর ভয়ঙ্কর। 'আ আ আ আ!' চিৎকার দিল নীলু।

বিজয়ের হাসি হাসল যেন জলার পিশাচ, আবার হাত তুলে এগোতে শুরু করল নীলুর দিকে। হাত নয়, যেন একজোড়া র‍্যাটল স্নেক, ফোঁস ফোঁস করছে। চটচটে আঠালো হাত দিয়ে ধরে ফেলল সে নীলুর মুখ। আঙুল ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল মুখ আর নাকের ফুটোয়।

গোঁ গোঁ করে উঠল নীলু। ভয়ের চোটে চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে।

'সাবধান, পিশাচ!' এমন সময় বলে উঠল শীলা। 'তোর টি সেট কিন্তু আমার কাছে।'

রাগে চোখ ছোট হয়ে এল পিশাচীর। নীলুর মুখ ছেড়ে দিল

সে। হাপরের মত হাঁপাতে লাগল নীলু।

শীলাকে দেখল বিছানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর, আছাড় মারার ভঙ্গিতে ধরে আছে টি সেট।

কটমট করে তাকাল সে জলাভূমির ভয়ঙ্করের দিকে।

'শোন, নোংরা ভূত,' চেঁচিয়ে বলল সে। 'এক্ষুণি যদি এখান থেকে চলে না যাস, তোর দামি কাপগুলো একটা একটা করে ভাঙব। তারপর ধরব পিরিচগুলো। আর এত সুন্দর জিনিস ভেঙে ফেলার জন্যে কিন্তু দায়ী থাকবি তুই।'

বিকট চিৎকার দিয়ে বিছানার দিকে ঝড়ের বেগে পা বাড়াল জলাভূমির ভূত।

'না, না, না!' চেঁচাল শীলা। একটা কাপ আছড়ে ফেলল সে মেঝেতে। থমকে দাঁড়াল পিশাচী, শীলার দিকে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচাল।

'গেট আউট!' হিসিয়ে উঠল শীলা।

পিশাচী দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়, দাঁত খিঁচাল, ঘোঁত ঘোঁত করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। তারপর এগোল শীলার দিকে। হঠাৎ কী মনে করে বাঁকানো হাত নামিয়ে ফেলল ভূতটা, মাথা নেমে এল বুকের ওপর, ঘুরে দাঁড়াল। গোঙাতে গোঙাতে বেরিয়ে গেল বারান্দার দরজা দিয়ে।

শীলা এক লাফে নামল বিছানা থেকে, ঝট করে কবাট আটকে তালা মেরে দিল দরজায়।

নীলু এবং সে হতভম্ব, ভীত, কাদামাখা অবস্থায় দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

হঠাৎ হলঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো।

'না আ আ আ আ আ!' আঁতকে উঠল মেয়েরা।

'এই তোরা ওপরে কী করছিস?' নীচ থেকে হাঁক ছাড়লেন নীলুর বাবা, দ্রুত উঠে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে। 'খালি ঝনঝন আর

ঠনঠন। কতবার বলেছি আমাকে একটু...

তাঁর কথা মুখেই রয়ে গেল বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘরের ভেতর তাকাল শীলা এবং নীলুও।

ঘরটা একটা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সারা মেঝেতে কাদামাখা পায়ের ছাপ, দেয়ালেও কাদা মাখা। বেডশীট নোংরা হয়ে আছে কাদা পানিতে। সানহ্যাটটা ভেঙে পড়ে আছে মাটিতে। দরজায় চায়ের দাগ। 'নীলু!' গর্জে উঠলেন ড. আহমেদ ফয়সাল । 'ঘরের এ কী দশা করেছ তুমি?'

'আ-আমি করিনি, বাপি,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল নীলু। 'সব জলাভূমির ভূতের কাজ। সে-ই আগে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।'

'ব্যস, আর একটা কথাও নয়,' ধমক দিলেন পিতা, 'নিজে জিনিস ভেঙে এখন দোষ চাপাচ্ছ ভূতের গায়ে? লজ্জা লাগে না তোমার? সত্যি, তোমাকে নিয়ে যে কী করি আমি!'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নয়,' চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর। 'তোমরা দু'জনে এক্ষুণি পরিষ্কার হয়ে শুয়ে পড়বে। আর সকাল বেলায়, শীলা, তুমি চাইলে বাড়ি চলে যেতে পারো। আর নীলু, তুমি নিজে এই ঘর পরিষ্কার করবে,' কথা শেষ করে দুমদাম পা ফেলে চলে গেলেন ডক্টর।

'ওহ্, শীলা!' করুণ হয়ে উঠল নীলুর চেহারা।

'"'ওহ্,' শীলা" বলবে না তো!' গরগর করে উঠল শীলা। 'তোমার জন্যে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু আমি কী করে জানব ভূতটা এসে এমন কাণ্ড বাধাবে,' বলল নীলু। 'চলো তোমার খালার বাসায় গিয়ে একটা প্ল্যান করি।'

'তুমি যা খুশি করোগে। আমি এর মধ্যে আর নেই,' বলল শীলা। তারপর আরেকটা বেডরুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

ছাব্বিশ

ইউজেনির ঘরটা আবার আগের মত সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে হলো নীলুকে। দুটো দিন ব্যয় করতে হলো তাকে এ কাজে। তবে কাজটা সে করল অবশ্যই দিনের বেলায়। দিন দুই পরে বাবাকে বলল, 'বাপি, করার মত কিচ্ছু পাচ্ছি না। একটা কাজ করো, আমাকে তোমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বানিয়ে নাও।'

'হাহ্!' হাসলেন ডক্টর। 'তুই করবি আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্টগিরি? তা হলেই হয়েছে। এসব কাজ তোকে দিয়ে হবে না।'

'আহ্, বাপি,' গলা ধরে ঝুলে পড়ল নীলু বাবার। 'কথা দিচ্ছি তোমার সাথে আমি বাইরে যাব।'

'ঠিক আছে। এতই যখন আগ্রহ তোর। তা হলে চল।' নাছোড়বান্দা মেয়ের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হলো জীববিজ্ঞানীকে।

দুপুরের খাবার নিয়ে দু'জনে যাত্রা শুরু করল। চলে এল একটা পাথুরে খাঁড়ির কাছে। ঝিকমিক করছে পানি।

'এই তো আসল জায়গায় এসে পড়েছি,' খুশি গলায় বললেন ডক্টর। 'কাঁকড়াগুলোর আস্তানা এখানেই।'

ব্যাগ খুলে তিনি একে একে বের করলেন ছোট স্কেল, রুলার আর নোটবুক। তারপর বালির একটা গর্তের সামনে বসে দুটো বেগুনী দাঁড়ার কাঁকড়ার দিকে স্থির তাকিয়ে রইলেন।

বাপের ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারল না মেয়ে। অমন পাথর হয়ে কীভাবে বসে আছেন তার বাপি? নীলু নিজেও আরেকটা গর্তের সামনে গিয়ে বসল।

পানি ভরা গর্তের তলা দিয়ে একটা কাঁকড়া ওর দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল। বিশাল বেগুনী দাঁড়া দুটো বাড়িয়ে দিল।

খিলখিল হেসে উঠল নীলু, আঙুল নাড়ল দাঁড়ার সামনে। তারপর গর্ত থেকে ওটাকে তুলে পায়ের কাছে, শুকনো বালুতে ছেড়ে দিল।

কিড় কিড় করে ওটা দৌড় দিল সাগর পানে। নীলুও পিছু পিছু দৌড়াল।

আধা মিনিট পরে গতি কমে এল কাঁকড়ার। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। বেগুনী থাবা জোড়া শরীরের নীচে মুড়ে বলের মত পড়ে রইল। নীলু ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল কাঁকড়াটিকে।

'নীলু,' পেছন থেকে ডাকলেন ড. আহমেদ ফয়সাল। 'তুই কাঁকড়াটাকে পানি থেকে তুলেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, বাপি,' স্বীকার করল নীলু। 'কেন? কী হয়েছে?'

'শিগ্‌গির ওটাকে আগের জায়গায় রেখে আয়

'ইসসিরে।' মুখ ভেংচাল নীলু। তবে কাঁকড়াটাকে ধরে ঠিকই গর্তে রেখে দিল। ধীরে ধীরে কুণ্ডলি ভাঙল কাঁকড়া, নড়াচড়া শুরু করল।

ড. আহমেদ ফয়সাল ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'এই কাঁকড়াগুলো পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। পানি থেকে তুলে আনলে শুকিয়ে মারা যায় ওরা। মরে গেলে ওদের নিয়ে গবেষণা করব কীভাবে।'

'সরি,' বলল নীলু।

'ঠিক আছে। অমন আর করবি না,' বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন ডক্টর।

নীলু গর্তের কাঁকড়াটির দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবছে। একসময় বলল, 'দুঃখিত, ভাই। জানতাম না এই ছোট্ট পানির গর্তটাই তোমার জীবন। এখান থেকে তোমাকে তুলে নিলে তুমি শুকিয়ে মরে যাবে।'

হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নীলুর চেহারা। গর্তের চারপাশে খুশির চোটে রীতিমত লাফাতে শুরু করল।

'পেয়েছি! পেয়েছি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও।

'কী পেয়েছিস?' জানতে চাইলেন বাপ।

'না, কিছু না।' অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল নীলু। 'গবেষণা করার একটা জিনিস পেয়েছি। তাই বলছিলাম আর কী!'

সাতাশ

পরদিন নীলু তার বাবাকে বলল বাইকটা নিয়ে সে একটু ঘুরে আসতে চায় কোথাও থেকে।

'ঠিক আছে, যা।' অনুমতি দিলেন ডক্টর। 'আজ আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। কাঁকড়াগুলো শীঘ্রি ডিম পাড়বে।'

'আ-আ?' অন্যমনস্ক সুরে বলল নীলু। 'ভাল খবর।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সদর দরজার দিকে পা বাড়াল। ড্রাইভওয়েের শেষ মাথায় ওর বাইক রাখা, বাহনটা পরীক্ষা করে

দেখল নীলু। গিয়ারে তেল-টেল মেখে চড়ে বসল বাইকে। এবারের পরিকল্পনায় কাজ হতেই হবে, বিড়বিড় করল ও।

মিনিট বিশেক পর সেই সেতুর ধারে চলে এল নীলু। আকাশের দিকে চাইল মুখ তুলে। মাঝ আকাশে ধক ধক করে জ্বলছে সূর্য। খুশি হয়ে উঠল নীলু। 'বেশ এতেই চলবে,' কথাটা নিজেকেই শোনাল যেন ও।

বাইক ঠেলে এগোল নীলু জলার ভূতের বেলাভূমির দিকে। আশপাশে কোন কিছু নড়ে উঠলে বা শব্দ হলে লাফ মেরে উঠল ও–হয়তো ঘাসে খসখস শব্দ তুলল বাতাস বা পানিতে বুদ্বুদ তুলল ব্যাঙাচি।

অবশেষে, ঢিবঢিব বুকে সেতুর মাথায় চলে এল নীলু।

'হেই, জলার ভূত?' ভয়ে ভয়ে ডাকল ও। 'ইয়ে, ইউজেনি?'

নীরবতা।

হঠাৎ সৈকতের ওপর লাফাতে শুরু করল নীলু।

'ইস, কী সুন্দর দিন। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে চারদিক,' গলা ছেড়ে বলল ও। 'কত্ত সুখী আমি। ঘুমানোর জন্যে আমার উষ্ণ, আরামদায়ক বিছানা আছে। আর সকালে নাস্তার টেবিলে আমাকে জলাভূমির ছাইভস্মও গিলতে হয় না।'

লাফ থামাল নীলু। কান পাতল জলার ভূতের ঈর্ষাকাতর গোঙানি শোনার জন্যে।

কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।

হুমম, কী যেন ভাবল ও। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'আমি আমার বাইকে চড়ে যখন-তখন যেখানে খুশি যেতে পারি।'

এখনও কোন সাড়া নেই।

'আমার চুল কী সুন্দর কোঁকড়ানো,' বলল নীলু, নেড়ে দিল বেণী জোড়া। সে জানে ইউজেনির চুল সমান, সে তাই ভেবেছে কোঁকড়ানো চুলের কথা শুনলে মেয়েটা ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাতাসের কানাকানি আর মৃদুমন্দ ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুর আওয়াজ নেই।

অবশেষে, শেষ অস্ত্রটা ছাড়ল নীলু।

'আমার অনেক বন্ধু আছে!' গলা ফাটাল সে। 'আমার বাবা আমাকে খুব ভালবাসে।'

'খুব...বেশি...দিন...নেই,' জলার ধারের একটা গর্ত হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো, জলাভূমির পিশাচীর খনখনে কণ্ঠ ভেসে এল। 'খুব শীঘ্রি...আমার...বন্ধু...হবে...তুমি।'

আটাশ

'না আ আ আ আ আ!' ভয়ানক আঁতকে উঠল নীলু, পরক্ষণে ছুটল বাইক লক্ষ্য করে। এক লাফে সেতুতে উঠে পড়ল ও, বাইকে চড়ে পাগলের মত প্যাডেল মারতে শুরু করল।

'তো-তোমার বন্ধু হতে আমার ব-বয়েই গেছে,' চেঁচিয়ে বলল নীলু।

'ইইইইই-হিহিহি, ইইইইইই-আহ্‌হ্‌হ্‌,' রক্ত হিম করা চিৎকার ভেসে এল পেছন থেকে।

নীলু শুনল পেছনে থপথপ শব্দ হচ্ছে, জলার ভয়ঙ্কর আসছে! পেছনে ফিরে দেখতে সাহসে কুলোল না। যে জোরে বাইক ছুটিয়েছে, একটু এদিক-ওদিক হলে সোজা জলার মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। আর ওই ডাইনীটা তো তাই চায়।

উত্তেজনায় প্যাডেলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল নীলু, সাঁই সাঁই ঘোরাচ্ছে, ভীষণ জোরে ছুটছে ওর সাইকেল।

ওই তো! দেখা যাচ্ছে সেতুর শেষ মাথা! তারপরেই রাস্তা।

'এবার!' গর্জে উঠল নীলু।

প্যাডেলে পা দিয়ে শেষ সজোরে চাপটা দিল ও, এক্ষুণি কাঠের তক্তা ছেড়ে উঠে পড়বে রাস্তায়।

কিন্তু উঠতে পারল না নীলু।

'হুউউউ!' কেঁদে ফেলল ও ভয়ের চোটে।

ঘাড় ফেরাতেই জলাভূমির ভয়ঙ্করকে দেখতে পেল। ভয়ঙ্কর গতিতে দৌড়ে আসছে ওটা কাদা ছিটাতে ছিটাতে। নোংরা একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে নীলুর দিকে, দুর্গন্ধযুক্ত কাদা ছিটকে এল নীলুর মুখে।

'হু!' ঘেন্নায় শিউরে উঠল নীলু। বাইকের হ্যাণ্ডেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। এখান থেকে যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাইকে প্যাডেল মারতেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। নীলু পেছন ফিরে তাকিয়েছিল ডাইনীটা কতদূরে আছে দেখতে, ওকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলছে দেখে আঁতকে উঠে সে প্যাডেল মারতে গিয়েছিল। আর তখুনি ব্রেক ফেল করে সাইকেল নিয়ে উল্টে পড়ল নীলু।

'ইইইইই!' তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছেড়ে ডিগবাজি খেল ও। ডান পা আর হাতে চোট লাগল। জ্বালা করে উঠল ভীষণ। কিন্তু ক্ষতস্থান পরীক্ষা করার সময় নেই এখন। জলার ডাইনীটা ঝুঁকে আসছে ওর ওপর। হাত বাড়াল ওটা নীলুর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্যে। কাদামাখা বীভৎস মুখটা বিকৃত হাসিতে বাঁকা হয়ে গেল। প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে সে।

উনত্রিশ

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল নীলু। কিন্তু ওর পা বিঁধে গেছে সাইকেলের চেনে। চেষ্টা করেও ছাড়ানো গেল না।

জলার ডাইনীর নিঃশ্বাসে বিকট, পচা গন্ধ। নাকে এসে লাগছে নীলুর। ঠাণ্ডা, আঠালো মাটির স্পর্শ পেল ও। চোখ বুজল ভয়ে। আর রেহাই নেই, বুঝতে পেরেছে ও।

নীলুর কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। এত জোরে মুঠি চেপে আছে যে তালুতে নখ বসে গেল। অপেক্ষা করছে ডাইনীটা কখন কামড় বসাবে ওর গলায়।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কয়েকটি লম্বা মুহূর্ত পার হয়ে গেল। অথচ ডাইনীটা ওর ওপর হামলা চালাল না।

হঠাৎ জলার ভূত গুঙিয়ে উঠল–শুকনো, খক খক কাশির ভঙ্গিতে। চোখ মেলে তাকাল নীলু।

প্রখর সূর্যতাপে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে জলার ভূত।

তা হলে আমার ধারণাটাই কি ঠিক হতে যাচ্ছে? মনে মনে ভাবল নীলু।

বেগুনী দাঁড়ার কাঁকড়াটা যেভাবে ছোট্ট গর্তটার দিকে মরার মত হেঁটে যাচ্ছিল, তেমনি টলতে টলতে জলার দিকে এগোল জলার ডাইনী। প্রতিটি পা ফেলার সময় ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর, ওটার

কনুই আর হাঁটুর মাটি শুকিয়ে খটখট করছে।

'ইয়াহু,' সোল্লাসে চিৎকার দিল নীলু। বাইকের চেইনে এখনও ওর পা আটকানো, কিন্তু ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করল না সে। 'আমার প্ল্যানে কাজ হয়েছে। আমি সত্যি জিনিয়াস।'

এমন সময় ঠাণ্ডা, ভেজা কিছু একটা টপাস করে পড়ল নীলুর নাকের ওপর। তারপর একটা কাঁধে। তারপর আরেকটা। তারপর আরও একটা। জিনিসটা কী বুঝতে পেরে হিম হয়ে গেল নীলু। 'বৃষ্টি?' চিৎকার করে উঠল ও। 'না আ আ আ আ!'

ত্রিশ

রীতিমত আতংক নিয়ে নীলু দেখল বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে জলার পিশাচীর গায়ে।

মুহূর্তের মধ্যে ওটা তার আগের চেহারা ফিরে পেল—ভেজা, আঠালো, নোংরা আর ভয়ঙ্কর।

তারপর, হঠাৎ গলে যেতে শুরু করল ওটা।

নীলু অবাক হয়ে দেখল জলার প্রেত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কাদার একটা স্তূপে পরিণত হয়েছে। তারপর ঘূর্ণায়মান নোংরা ডোবায় ওটার রূপান্তর ঘটল।

একটু পরে থেমে গেল বৃষ্টি। মেঘের আড়াল থেকে হেসে উঠল সূর্য।

এবার সাইকেলের চেন থেকে পা ছাড়ানোর জন্যে রীতিমত

টানাটানি শুরু করে দিল নীলু। শেষে পা-টা মুক্ত করতে পারল ও।

কিন্তু সিধে হবার আগেই দেখল ডোবাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার পিশাচের রূপ পেয়েছে মেয়েটা, ভেজা, বিকট এবং আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

কয়েক পা পিছু হটল ওটা, তারপর নীলু কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাফ দিল ওকে লক্ষ্য করে। চিৎকার দেয়ারও সময় পেল না মেয়েটা, তার আগেই বিকট প্রাণীটার হাতে বন্দি হয়ে গেল ও।

একত্রিশ

জলাভূমির ভয়ঙ্করের আঙুলগুলো অক্টোপাসের শুঁড়ের মত, জাপটে ধরেছে নীলুকে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। নীলুর চোখে এবং নাকে বমি ওঠা গন্ধযুক্ত মাটি ঢুকে গেছে।

নীলু প্রাণপণ চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল পেত্নির পেটে-টের পেল ফাঁকা কিছুর মধ্যে ঢুকে গেছে পা।

পিশাচী ভয়ানক চিৎকার করছে, কান ফেটে যেতে চাইছে, মুখের তীব্র গন্ধে বমি আসতে চাইছে। নীলু অনেক কষ্টে প্রেতিনীর হাত সরিয়ে নিতে পারল মুখের ওপর থেকে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল বার কয়েক। তারপর জলার ভূতের মুখে ঢুকিয়ে দিল নখ।

মাটির মধ্যে নীলুর আঙুল ঢুকে গেল। ভয়ানক আতংকে চিৎকার দিল নীলু দৃশ্যটা দেখে-পিশাচীর নাক, গাল এবং চকচকে

হলুদ চোখের একটা ওর থাবার মধ্যে ছিঁড়ে চলে এসেছে।

জলার ভয়ঙ্কর গর্জে উঠল আধভাঙা, বিকট মুখে। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল নীলুর গলা। মটকে দেবে।

চাপের চোটে নীলু চোখে সর্ষেফুল দেখল, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে বুক, তারপরও সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল জলার ভূতকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় কাঁধ উড়ে গেল ওটার। কিন্তু নীলু সেই দৃশ্য দেখতে পেল না। কারণ প্রচণ্ড শক্তিতে ওটা এখনও নীলুর গলা চেপে ধরে আছে।

শ্বাস নিতে পারছে না ও। দম বন্ধ হয়ে আসছে। সূর্যটা ক্রমশ। ম্লান হয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু অস্পষ্ট আর বিবর্ণ হয়ে উঠল।

বত্রিশ

দুম!

নীলুর চোখের সামনে জলাভূমির পিশাচীর মাথাটা কয়েক লাখ মাটির কণায় পরিণত হলো, যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। দানবীর হাত শিথিল হলো ওর গলা থেকে।

থুক থুক করে মুখ থেকে কাদামাটি ছুঁড়ে ফেলল নীলু, এঁকে বেঁকে বেরিয়ে এল পিশাচীর খিঁচুনি খেতে থাকা শরীরের নীচ থেকে।

মুখ হাঁ করে দম নিল নীলু, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল–দেখল

শীলা কুৎসিত প্রাণীটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে গদার মত লাঠি।

'শীলা!' চেঁচিয়ে উঠল নীলু।

'মনে হলো আমার সাহায্য দরকার তোমার!' হাসছে শীলা।

হঠাৎ লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, চিৎকার করে উঠল।

'না,' প্রার্থনা করল নীলু। আর নয়!

মুণ্ডুহীন পিশাচী ওর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিশ্রী একটা শব্দ করে ঘাড়ের ওপর গজিয়ে উঠল নতুন মুণ্ডু। 'শিগ্‌গির পালাও!' চেঁচিয়ে উঠল নীলু, এক ঝটকায় টেনে তুলল বাইক।

'আমার বাইক নিয়ে আসিনি!' কাঁদো কাঁদো শোনাল শীলার কণ্ঠ।

'আমার হ্যাণ্ডেলবারে উঠে বসো,' বলল নীলু। লাফিয়ে হ্যাণ্ডেলবারে বসে পড়ল শীলা, নীলু প্যাডেল মারতে লাগল।

পেছনে, শুনল ওরা, থপ থপ করে এগিয়ে আসছে জলাভূমির ভয়ঙ্কর।

থপ থপ থপ থপ, পায়ের আওয়াজ বেড়েই চলেছে।

'জলদি,' গলা ফাটাল শীলা।

'তোমার গায়ে অনেক ওজন,' হাঁপাচ্ছে নীলু। চেষ্টা করছে আরো জোরে প্যাডেল মারতে।

'শুনতে পাচ্ছ?' শীলা ঘাড় ফিরিয়ে বলল।

'কী?' গুঙিয়ে উঠল নীলু।

'কিছু না!' বলল শীলা। 'আমার মনে হয় ও আর এখানে নেই।'

নীলু মাথা ঘোরাল। দেখল বাদামী রঙের একটা কাঠামো জলার হলুদ ঘাসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, একটু পর অদৃশ্য হয়ে গেল পানিতে।

'মনে হয় সূর্যের তাপে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছিল ভূতটা,'

মন্তব্য করল নীলু।

'হতে পারে। তবে আবার ধাওয়া করার আগে কেটে পড়ি চলো,' বলে হ্যাণ্ডেলবার দিয়ে লাফিয়ে নামল শীলা, চঞ্চলা হরিণীর মত ছুট দিল।

'হেই, আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ?' বলে দ্বিগুণ জোরে প্যাডেল মারতে লাগল নীলু।

তেত্রিশ

'আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে কি তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছি?' নীলু পরদিন জিজ্ঞেস করল তার বান্ধবীকে।

শীলাকে নিয়ে সে স্প্যানিশ শ্যাওলা আর গাছের চাঁদোয়ার নীচ দিয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে।

'কম করে হলেও এক ডজনবার,' জবাব দিল শীলা। 'এত ধন্যবাদের ঠেলায় আমার নিজেরই এখন বিব্রত লাগছে। তবে তোমাকে ওভাবে একলা রেখে দৌড়ে আসা উচিত হয়নি আমার। থাকগে, এই যে এসে পড়েছি আমরা।'

ভিক্টোরিয়া খালার ...ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। শীলা দরজায় কড়া নাড়ল। 'খালা, বাড়ি আছ? আমি শীলা।' কে যেন পুরুষ কণ্ঠে কথা বলে উঠল পেছন থেকে। লাফিয়ে উঠল দু'জনেই।

'ভিক্টোরিয়ার খোঁজ করছ, অ্যাঁ?' জানতে চাইল পুরুষ কণ্ঠ।

ওরা ঘুরে দেখল বুড়ো এক লোক, বয়সের ভারে নুয়ে গেছে সামনের দিকে। হাতে একটা লাঞ্চ প্যাকেট এবং মাছ ধরার বড়শি।

'হ্যালো, মি. জনসন,' বলল শীলা। 'ইনি আমার খালার প্রতিবেশী।' নীলুকে জানাল সে। 'আমার আংকেলের মত।'

'এ দ্বীপের প্রত্যেকেই দেখছি তোমার আংকেলের মত,' মন্তব্য করল নীলু।

'মি. জনসন,' বলল শীলা। 'আমার খালাকে দেখেছেন?'

'গতকাল থেকে দেখছি না,' বললেন বুড়ো মানুষটি। 'মেইনল্যাণ্ডে গেছেন তিনি। তার মেয়ে মার্সিয়ার বাচ্চা হবে।'

'আবার?' অবাক হলো শীলা। 'মেয়ে বটে মার্সিয়া। এত বাচ্চা ভালবাসে! প্রতিবছর মা হচ্ছে।'

'এখন কী করব তা হলে?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল নীলু।

'জানি না,' শীলাও ফিসফিস করে জবাব দিল। জনসন কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ করে গলা চড়াল ও, 'খালাকে তা হলে একটা চিঠি লিখে রেখে যাই।'

দরজার নীচে, ম্যাটে চাবি রেখে গেছেন ভিক্টোরিয়া। তিনি কোথাও গেলে ওভাবেই চাবি রেখে যান। কাজেই দরজা খুলতে সমস্যা হলো না কোন।

'এখন এক টুকরো কাগজ আর কলম দরকার,' বলল নীলু।

'আমার মাথায় কিন্তু আরেকটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল শীলা। 'চলো রহস্যময় "গুল্লা আরোগ্য নিকেতন" রুমে যাই। সমস্যার সমাধান হয়তো নিজেরাই বের করতে পারব।'

'কাজটা কি উচিত হবে?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল নীলু। 'তোমার খালা গুল্লা রেখেছেন সিরিয়াস রোগীদের চিকিৎসার জন্যে।'

'আমাদের সমস্যাটাও সিরিয়াস,' বলল শীলা। তারপর একটা

ঘরে ঢুকে পড়ল নীলুকে নিয়ে।

লতা-পাতা আর নানা সুগন্ধী মশলার মিশ্রিত একটা গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। মসলার অসংখ্য কাঁচের জার, অদ্ভুত সব লতা-পাতা আর দেয়াল বোঝাই ধুলোপড়া, পুরানো বইয়ের স্তূপ দেখতে পেল নীলু। বই মেঝেতেও লুটোপুটি খাচ্ছে। বিশাল একটা কেটলি আর কিছু বাক্সও চোখে পড়ল। ওতে হাতে লেখা লেবেল লাগানো–'দাঁত ব্যথা', 'পেট ব্যথা', 'ক্রন্দনরত শিশু' ইত্যাদি।

'যে বাচ্চারা সারাদিন প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদে তাদের কান্না বন্ধ করার ওষুধও আছে খালার কাছে,' সগর্বে ঘোষণা করল শীলা।

শীলা, নীলুকে নিয়ে কোনার দিকে এক ডেস্কের কাছে গেল। ওটার ওপরেও বই। এ ঘরে শুধু বই আর বই।

'শীলা, তুমি আসলে কী খুঁজছ?' জানতে চাইল নীলু।

'একটা নোটবই,' জবাব দিল শীলা। 'আমার ধারণা ওটার মধ্যে খালা নানা জাদুমন্ত্র লিখে রেখেছে যা দিয়ে জলার ভূতের কবল থেকে আমরা রক্ষা পাব।'

ডেস্কের ড্রয়ার খুঁজতে লাগল শীলা আঁতিপাতি করে।

'নোটবইটা উনি সঙ্গে নিয়ে যাননি তো?' জিজ্ঞেস করল নীলু।

'আশা করি নেননি,' বিড়বিড় করে শীলা, কাজে ব্যস্ত।

সবগুলো ড্রয়ার খুঁজে দেখল শীলা, একটার মধ্যেও নোটবুক নেই। 'গেল কোথায় তা হলে?' হতাশ শোনাল কণ্ঠ।

এরপর ঘরের প্রতিটি কোণ তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল দুই কিশোরী। এমনকী কার্পেটের নীচে মেঝেও বাদ দিল না। হঠাৎ অন্ধকার ঘরের কোণে, ছোট একটা টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নীলু।

'গেছিরে!' এক ঠ্যাঙে লাফাচ্ছে ও।

লাফালাফি থেমে গেল ওর টেবিলের ওপর একটা কালো বাক্স দেখে। খুলল সে ওটা। ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা

খাতা।

নোটবই'র মত দেখতে!

চৌত্রিশ

বাদামী রঙের বইটিকে দেখে মনে হলো শতাব্দী প্রাচীন। ওটা হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে নীলু বলল, 'শীলা' তুমি কি চামড়া মোড়ানো কোন নোটবই-র খোঁজ করছ?'

'হ্যাঁ। কালো ইলাস্টিক ব্যাণ্ডে মোড়া,' জবাব দিল শীলা।

'তা হলে ওটা পেয়ে গেছি আমি!' হাতে ধরা বইটা মাথার ওপর উঁচু করে দেখাল নীলু।

'আরে!' বলল শীলা। 'ওটাই তো!'

এরপর দুই বান্ধবী মিলে বইটা নিয়ে বসে পড়ল। বহু পুরনো বই বলে পৃষ্ঠাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে, ভিক্টোরিয়া খালা আঁকাবাঁকা অক্ষরে কী সব লিখেছেন। বেশিরভাগ শব্দ 'গুল্লা' নিয়ে যার মানে কিছুই বুঝতে পারল না নীলু। তবে একটা জায়গায় ওর নজর আটকে গেল। ওখানে লেখা পানিতে বাস করে বলে গুল্লা ভূতরা বেশ স্বাস্থ্যবান আর মোটাতাজা হয়ে থাকে। পুকুর, বৃষ্টি, জলা–এ সবকিছুই গাড়ির গ্যাসের মত ভূতদেরও জীবনী শক্তি।

নীলু একটা লাইনে আঙুল রেখে শীলার দৃষ্টি আকর্ষণ করল: শুধুমাত্র তীব্র তাপমাত্রা পানির ভূতদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

'কাজেই জলার ভূতটাকে শুকিয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে

হবে আমাদের,' মন্তব্য করল শীলা।

'কিন্তু কীভাবে?' শুধাল নীলু।

'দ্যাখো না এখানে কী লেখা আছে,' নোটবই'র আরেক জায়গায় চলে গেল ওর আঙুল।

'ব্যাপারটা সহজ,' বলল ও। 'চিলি পাউডার, সালফার, পচা ডিমের খোলা আর রোববার জবাই করা কোন মুরগির পালক। এগুলো একসাথে চালনির মধ্যে রেখে বড় কোন পাত্রে তিনবার ঝাঁকাতে হবে। তারপর ওটার সাথে দিতে হবে যন্ত্রণা।'

'যন্ত্রণা?' অবাক হলো নীলু। 'তরল বা কঠিন অবস্থায় যন্ত্রণা পাওয়া যায় নাকি?'

চিন্তিত দেখাল শীলাকে। 'ঠিকই বলেছ। আরে, দেখ। এখানে একটা ফুটনোট আছে। যন্ত্রণা বলতে চোখের জল, চিৎকার বা রক্ত হলেও চলবে।'

'ধ্যাত, কী বলছ!' বলল নীলু।

'না, আমি কিছু বলছি না। এখানে তাই লেখা।'

'ঠিক আছে। তা হলে এসো। আমরা চিৎকার দিই,' বলল নীলু।

'এ কাজটা তো আমরা দু'জনেই ভাল পারি। কী বলো? তারপর?'

'তারপর ধুলোর ওপর চক দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকতে হবে এবং মাঝখানে খুঁড়তে হবে গভীর গর্ত,' বই দেখে বলে চলল শীলা। 'গর্তের মধ্যে ওই জিনিসগুলো ঢেলে দিতে হবে। ভূতটা তখন গর্তের মধ্যে ঢুকে যাবে। আর কখনও বেরুতে পারবে না।'

পড়া শেষ করল শীলা, তাকাল বান্ধবীর দিকে।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল নীলু। 'এসো, চেষ্টা করে দেখি।'

পঁয়ত্রিশ

পরদিন সকালে শীলার নির্দেশিত একটা জায়গায় নীলু এবং শীলা মিলিত হলো।

ওটা একটা ধুলোময় মাঠ—দ্বীপের যে অংশটাতে গাছপালা নেই, তারই একটা জায়গা। জলার ধারে ধুলো ধূসরিত রাস্তাটার পাশেই মাঠটি।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল নীলু। মাঠের ধারে এসে ব্রেক কষল বাইকের। 'চমৎকার জায়গা।'

এদিক-ওদিক তাকাল সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে সূর্য। আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই।

ভুতুড়ে ফাঁদের জন্যে ওরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করে এনেছে। নীলু তার বাইকের ঝুড়ি থেকে একটা বড় বাটি আর সবুজ রঙের কাগজ মোড়ানো একটা পচা ডিম বের করল।

শীলা এনেছে কতগুলো সাদা পালক, ময়দার চালনি আর উজ্জ্বল রঙের পাউডার।

'কাজ শুরু করা যাক,' বলল শীলা, নীলুর হাত থেকে বাটিটা নিল। তারপর বাটির ভেতর চালনি রেখে লাল চিলি পাউডার, হলুদ সালফার এবং পালকগুলো ঢেলে দিল। নীলু পচা ডিমটা ভেঙে কুসুম ফেলে দিল ধুলোর ওপর।

'ইক্!' মুখ বাঁকাল ও। 'কী বিশ্রী গন্ধ!'

তারপর নাক চেপে ধরে ভাঙা খোলটা রাখল চালনির মধ্যে। শীলা মিশ্রিত জিনিস তিনবার ঝাঁকাল, নীলুকে দিল এক টুকরো চক।

বড় করে একটা বৃত্ত আঁকল নীলু। জুতো খুলে হিলের সরু ডগা দিয়ে বৃত্তের মাঝখানে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল ও।

'ঠিক আছে, এবার আমরা রেডি,' বলল শীলা নার্ভাস ভঙ্গিতে। আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। সূর্য সমানে উষ্ণ উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে। সে এরপর দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসটা বাটি থেকে ঢেলে দিল গর্তে।

দুই বান্ধবী চড়ে বসল যে যার বাইকে, মাঠের শেষ মাথায় চলে এল। বাইক দুটো লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

অপেক্ষা করছে।

অপেক্ষা করছে।

'কী হলো?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল নীলু।

'বুঝতে পারছি না।' গলা নামিয়ে জবাব দিল শীলা। 'ময়লা গর্তে জিনিসগুলো না ফেলে চিনামাটির প্লেটে সাজিয়ে দিলে বোধহয় ভাল করতাম।'

হঠাৎ ঢোক গিলল ও, মুখে হাত চাপা দিল যাতে চিৎকার বেরিয়ে না আসে। নীলু মাঠের দিকে তাকাল।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে জলাভূমির ভয়ঙ্কর। পানি থেকে উঠে এসেছে ওটা এইমাত্র। এখনও পানি ঝরছে গা থেকে।

ওটাকে আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। দৃশ্যত ওটার মুখ বলতে কিছু নেই–স্রেফ আকৃতিহীন মাটির একটা ঢেলা। হলুদ একটা চোখ ঝুলে আছে সামনের দিকে।

'সম্ভবত এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি ডাইনীটা,' শীলার কানে কানে বলল নীলু।

জলাভূমির ভয়ঙ্কর গর্তের দিকে তাকাল লোভী দৃষ্টিতে।

বাদামী কাদার লালা বেয়ে পড়ছে ওর চিবুক থেকে, গর্তের দিকে পা বাড়াল। এগোল বৃত্তের দিকে।

একবার ডানে, আরেকবার বামে তাকাল ডাইনী। তাকাল সামনে এবং পেছনেও।

তারপর এক লাফে চকের লাইন পেরিয়ে গর্তের কাছে পৌঁছে গেল।

দম বন্ধ করে বসে রইল শীলা এবং নীলু। ডাইনীটা কি বৃত্ত ত্যাগ করার সময় অদৃশ্য হয়ে যাবে নাকি গর্ত থেকে আগুন বেরিয়ে ওকে চলৎশক্তিহীন করে দেবে?

জলাভূমির ভয়ঙ্কর গর্ত থেকে ডিমের খোসা, পালক ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চটচটে জিনিসটা বের করল। তারপর চট করে ঘুরল। যেন পালানোর পথ খুঁজছে।

'কাজ হচ্ছে,' গুঙিয়ে উঠল নীলু।

জলার ডাইনীর কাঁধ খিঁচুনি খেতে শুরু করেছে বিপুলভাবে।

'শুকিয়ে যেতে শুরু করছে নাকি?' অধৈর্য শোনাল নীলুর কণ্ঠ।

'শ্‌শ্‌শ্‌,' হিসিয়ে উঠল শীলা। 'শোনো!'

কান পাতল নীলু। যা শুনল গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল।

'ইইইইই হিইইই-হিইই,' চিৎকার করে উঠল জলার ডাইনী।

তারপর হাতজোড়া শূন্যে তুলে নীলুদের তৈরি করা জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বৃত্তের বাইরে।

সে নিজেও এক লাফে বেরিয়ে এল বৃত্ত থেকে। জিনিসটা তুলে নিয়ে ফিরে গেল নিজের আস্তানায়।

এক সেকেণ্ড পর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ছত্রিশ

'কী হলো?' আঁতকে উঠল নীলু। 'অদৃশ্য হয়ে গেল!'

'বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা,' বলল শীলা। 'হয়তো রেসিপিটা কাজ করেনি ভূতটা আগে মানুষ ছিল বলে। বইতে লেখা ছিল "জলার প্রাণী"।'

'ওটাকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম আদৌ সে তা নয়,' মন্তব্য করল নীলু।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল শীলা।

'পেয়েছি।' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'ওই ডাইনীটার ধারণা সে-ই সর্বেসর্বা। তবে আমার দ্বীপে ওকে কেরদানি করতে দেব না। ওকে ঠিকই শায়েস্তা করব আমরা। তবে এখানে নয়, ওখানে।'

'কোন্‌খানে?' নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল নীলু। সে সকল আশা হারিয়ে ফেলেছে।

'ওইখানে!' জলার দিকে আঙুল দেখাল শীলা।

'পাগল নাকি!' প্রতিবাদ করল নীলু। 'ওখানে আমরা যেতে পারব না। ডাইনীটাও চায় যেন ওখানেই যাই আমরা–তা হলে কাদার মধ্যে চুবিয়ে মারতে সুবিধে হবে তার।'

'শোনো,' বলল শীলা। 'গুল্লা ম্যাজিক কখনও কাজ করে, কখনও আবার করে না। তবে গুল্লার একটা বৈশিষ্ট্য হলো পানিতে ওটার কাজ করার ক্ষমতা সাংঘাতিক। মাছ ধরার সময় এর প্রমাণ

আমি বহুবার পেয়েছি।'

হতাশ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল নীলু, শুয়েই থাকল। চেহারায় নিরাসক্ত ভাব।

'বড়শি দিয়ে শেষ কবে তুমি জলার ভূত ধরেছ, শীলা?' ঠাট্টা ওর গলায়।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না বুঝতে পারছি,' বলল শীলা। 'তবে বড়শি দিয়ে ভূত ধরতে যাচ্ছি না আমি। কাছে এসো। বলছি।'

ধীরে ধীরে উঠে বসল নীলু। শীলা ওর কানে কানে খুলে বলল প্ল্যানটা। শুনতে শুনতে বড় বড় হয়ে উঠল নীলুর চোখ। শিরশির করছে গা।

'তুমি নিশ্চিত এতে কাজ হবে?' জিজ্ঞেস করল ও, ভয়ে কাঁপছে।

'না,' জবাব দিল শীলা। 'আমি নিশ্চিত নই। তবে একটা কথা নিশ্চিত জানি–এটাই আমাদের শেষ সুযোগ। হয় ওর, না হয় আমাদের।'

সাঁইত্রিশ

'এই যে আমার ডিঙ্গি,' ঘোষণা করল শীলা। 'গোটা পৃথিবীতে সবচে' প্রিয় জিনিস আমার। আমার বাইকের চেয়েও, অবশ্যই।'

নীলু এবং শীলা মাঠ থেকে সোজা চলে এসেছে শীলাদের বাড়ির কাছের ডকে। কাঠের ডকের সাথে ডিঙ্গি নৌকাটা বাঁধা

ছিল। ঢেউয়ের তালে অল্প অল্প দুলছে।

নীলু হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইল নৌকাটার দিকে।

'খুবই ছোট ওটা,' বলল সে। 'আমাদের ভার বইতে পারবে তো?'

'ছোট হলেও মজবুত আছে আমার ডিঙ্গি,' বলল শীলা। 'বন্যা আর ঝড়ের মধ্যেও কতবার নৌকা নিয়ে বেরিয়েছি আমি। কখনও ঝামেলায় পড়তে হয়নি। আমাদের দু'জনের ভার বইবার ক্ষমতা রাখে ওটা। এখন তুমি যদি নৌকা বাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়...'

লাফ মেরে নৌকায় উঠে পড়ল শীলা। ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে হালকা পায়ে হেঁটে গেল পেছন দিকে। ওখানে মোটরসহ একটা প্রপেলারও আছে।

'ইঞ্জিন চালু করে দিলেই হলো,' বলল শীলা। 'আর বৈঠা বাওয়ার দরকার হবে না তোমার।'

'দারুণ!' মুগ্ধ হলো নীলু।

'চলে এসো,' বলল শীলা। 'সূর্য মাঝ আকাশে থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি।'

সাবধানে নৌকায় উঠল নীলু, পা পিছলে পানিতে পড়তে রাজি নয়। এটি জলা না হলেও কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে যেতে চায় না সে।

'বৈঠা নাও,' বলল শীলা। 'আর একটা লাইফজ্যাকেট পরে নাও। ব্যস, এরপর আমাদের কাজ হবে শুধু স্রোতের অনুকূলে ভেসে যাওয়া। আধমাইল পরেই জলার শুরু।'

শিউরে উঠল নীলু। জলার পিশাচীর সাথে যদি ওরা বুদ্ধিতে পেরে না ওঠে তা হলে কী হবে?

ভাটার টানে এগিয়ে চলল ওরা। বেশ দ্রুত চলছে ডিঙ্গি। খানিক পরে সরু একটা খালে ঢুকে পড়ল ওরা, দু'ধারে লম্বা ঘাস। পানির রং এখানে কাদার মত, নোংরা। কাদার মধ্যে বৈঠা বাওয়া

ক্রমে কষ্টকর হয়ে উঠল মেয়ে দুটির জন্যে।

'অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছি?' জিজ্ঞেস করল নীলু।

শীলা তাকাল এদিক-ওদিক। 'হ্যাঁ। অনেক কাছে চলে এসেছি।'

'এখন কী?' বলল নীলু। 'নিজেকেই আমার ভূতের টোপ বলে মনে হচ্ছে।'

'টোপ তুমি নও। টোপ হলো এটা।' বলল শীলা।

সে নৌকার একপাশে ঝুঁকে পড়ল, বৈঠা দিয়ে দমাদম পিটতে লাগল। নৌকার গায়ে বৈঠার বাড়ি অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল গোটা জলায়।

'এতে ডাইনীটা আকৃষ্ট হবে?' জিজ্ঞেস করল নীলু।

'এভাবে ডলফিনদের আকৃষ্ট করেছি আমি,' জবাব দিল শীলা। 'ডলফিনের সাথে মাছ এসেছে। সাথে আর কী কী এসেছে কে জানে? একটা কাজ করি। এসো, কিছু মাছ ধরি। সাপার করা যাবে।'

নীলু মাথা ঝাঁকাল, বসল ডিঙ্গির শেষ মাথায়। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে!'

'মাছ ধরার জালটা দাও,' অধৈর্য গলায় চেঁচাল শীলা।

নীলু বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে ডিঙ্গির মেঝেতে রাখা জাল তুলল। পেঁচিয়ে গেছে গিট্‌ঠু। অনেক কষ্টে গিট্টু খুলল ও, জালটা মেলে ধরল সামনে।

'ইইইইইই।'

যেন শূন্য থেকে ভেসে এল জলাভূমির ভয়ঙ্করের ভয়াবহ চিৎকার। নীলু সভয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। কোত্থেকে এসেছে চিৎকারটা?

ওর ডান দিক থেকে। ওখানে থকথক করছে কাদা। হঠাৎ কাদাগুলো বিস্ফোরিত হতে শুরু করল। বিশাল এক গর্তের সৃষ্টি

হলো ওখানে। গর্তের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড লাফ মেরে বেরিয়ে এল জলাভূমির ডাইনী।

নীলুকে লক্ষ্য করে আরেকটা লাফ দিল সে!

আটত্রিশ

জলাভূমির ডাইনী কাদামাখা, ভেজা শরীর নিয়ে আছড়ে পড়ল নীলুর গায়ে। ভয়ানক দুলে উঠল ডিঙ্গি।

শীলার সাহায্য চাইবে ভেবেছিল নীলু। কিন্তু ডাইনীর শরীরটা ওকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে, মুখ দিয়ে শব্দই বেরুল না। ওর কোমর ধরে আছে ওটা, তবে হাত দুটো মুক্ত নীলুর। থাবা বাড়িয়ে অস্ত্র জাতীয় কিছু একটা খুঁজছিল নীলু। হঠাৎ পেয়ে গেল জাল।

একটা গোঙানি দিয়ে এক ঝটকায় জালটা হাতের মুঠোয় ধরে ফেলল নীলু। পরমুহূর্তে জাল দিয়ে মুড়ে ফেলল ডাইনীকে।

ওদের ধস্তাধস্তিতে ডিঙ্গি দুলছে, জলার ভূত নীলুকে টেনে নিতে চাইছে তার আস্তানা অর্থাৎ পানির নীচে।

নীলু জাল ধরে আছে, জলার দানোর সাথে যুঝছে প্রাণপণে, কিছুতেই পানিতে নামবে না। এমন সময় শীলার চিৎকার শুনতে পেল ও।

'খবরদার ডাইনী!' হুংকার ছাড়ল শীলা। এক ঝটকায় নৌকার মোটর খুলে আনল, স্টার্ট দিল।

'ভূ-উম' শব্দে গর্জে উঠল মোটর, ভীষণ বেগে ঘুরতে লাগল প্রপেলার। ওটা জলার দানোর দিকে লক্ষ্যস্থির করে সামনে পা

বাড়াল শীলা।

মোটর থেকে তীব্র গতিতে গরম বাতাস বেরুচ্ছে, সরাসরি আঘাত করল ডাইনীটাকে, কাদার একটা বড় চাঙড় ছিটকে এল নীলুর মুখে।

নীলু চোখ বুজল সভয়ে। টের পেল ডাইনীটার ধারাল নখ জাল ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে ওর নরম মাংসে, বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকাল নীলু। ভয়ঙ্কর প্রাণীটা হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। কী বীভৎস হাসি! জাল ছিঁড়তে শুরু করেছে সে।

'ওর গায়ে গরম বাতাস দাও, শীলা। জলদি!' আর্তনাদ করে উঠল নীলু। 'জাল ছিঁড়ে এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে ও।'

পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল নীলু। কিন্তু তিন কদম পেছাতেই টের পেল নৌকার শেষ মাথায় চলে এসেছে ও। এদিকে সামনে এগোবারও রাস্তা নেই। ফাঁদে পড়েছে নীলু।

ওদিকে ডাইনীটা জাল ছিঁড়ে ফেলেছে, মুক্ত হয়ে গেছে।

নীলুর গায়ে লাফ দিল ওটা।

আবার ঘিনঘিনে, বিকট জিনিসটার নীচে চাপা পড়ে গেল নীলু। থরথর করে কেঁপে উঠল নৌকা।

'ইইইইই-আহ্হ্হ্,' হিসিয়ে উঠল জলাভূমির ভয়ঙ্কর। নীলু ওর মুখে খামচি মারতে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল সে শক্ত হাতে।

এমন সময় নীলু শুনতে পেল মোটরের শব্দ। গরম বাতাসে জলার ডাইনীর গা থেকে কয়েকটা ঘাস আর বালি উড়ে গেল।

'আর তুই আমার পিছু নিতে পারবি না, জলার ডাইনী!' গর্জে উঠল নীলু। হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল জলার ডাইনীকে, ঠেলতে লাগল। ফেলে দেবে ডিঙ্গি থেকে।

কিন্তু প্রবল আঘাত দিব্যি সয়ে গেল ডাইনীটা, টানতে শুরু করল নীলুকে। পাতাল রাজ্যে নিয়ে যাবেই। নীলুও যাবে না। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দু'জনের। সেই সাথে একবার ডান দিকে,

একবার বাম দিকে, প্রবলভাবে দুলতে শুরু করল ডিঙ্গি নৌকা। ওদিকে শীলা মোটর চালিয়েই রেখেছে। শুকনো বাতাস দিয়ে ডাইনীটাকে শুকিয়ে মারার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু প্রচণ্ড দুলুনিতে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তার জন্যে।

ভীষণ দুলছে নৌকা।

একবার ডানে।

আবার বামে।

আরেকবার দুললেই উল্টে পড়ে যাবে সবাই। আর পানিতে একবার পড়ে গেলে লাইফজ্যাকেটেও কাজ হবে না নীলু আর শীলার জন্যে।

নৌকা প্রায় উল্টে যাচ্ছে, কিনারায় শুয়ে আছে নীলু, আঁতকে উঠে চোখ বুজল ও, এবার আর রক্ষা নেই।

উনচল্লিশ

কিন্তু উল্টে গেল না নৌকা।

নীলু টের পেল কমে এসেছে দুলুনি।

জলাভূমির ভয়ঙ্করের গাঁক গাঁক চিৎকারও সেই সাথে ম্লান হয়ে আসছে।

ওর বুকের ধুকপুকুনি একটু একটু কমে এল।

বিকট শব্দ হচ্ছে শুধু মোটরের। দারুণ বেগে ঘুরছে প্রপেলার, গরম বাতাস মউত ডেকে আনছে জলার পিশাচীর। শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে সে।

দানবীয় কোঁচকানো, অসংখ্য শিরা বের করা হাত ঝুলে পড়ল নীলুর মুখের ওপর থেকে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল নীলু। কেশে উঠল খকখক করে।

'শীলা, মোটরটা নৌকায় লাগাও। তীরে চলো। আমি এদিকটা দেখছি,' বলল নীলু।

সে একটা বৈঠা দিয়ে জলার ডাইনীর গায়ে বাতাস করতে লাগল। বীভৎস প্রাণীটার অনবরত চোখ ঘোরানো বন্ধ হয়ে গেছে। চটচটে, পিচ্ছিল চুল শক্ত কাঠ হয়ে আছে। কনুই আর হাত ফেটে গেছে, মুখে চিড় ধরেছে।

নীলুর মনে হলো ডাইনীটার ভঙ্গুর ফ্লাওয়ার পটের মত দশা হয়েছে। বৈঠা দিয়ে একটা বাড়ি দিলেই ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে।

'বৃষ্টি আসবে না তো?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল ও।

'মনে হয় না,' আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল শীলা। গনগন করে জ্বলছে সূর্য। গালের ঘাম মুছল সে হাতের চেটো দিয়ে। 'গরমে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ,' খুশি হলো নীলু।

কয়েক মিনিট পর তীরে এসে পৌঁছল ওরা। নৌকাটাকে টেনে তুলল মাটিতে। এখানে ওদের বাইক দুটো পার্ক করা। শুকনো ঘাসে চুমু খেল নীলু। 'আহ্, শুকনো মাটি। ভাবিনি আর কোনদিন তোমাকে স্পর্শ করতে পারব।'

'স্ফূর্তি হবে পরে,' ওকে সতর্ক করে দিল শীলা।' নৌকায় কিন্তু মূর্তিমান আতংকটা এখনও রয়ে গেছে। ওটাকে নিয়ে কী করব ভেবেছ কিছু?'

নীলু পা টিপে টিপে গেল ডিঙ্গির ধারে। জালের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে জলাভূমির ভয়ঙ্কর। শুকনো কাদামাটির ভাঙাচোরা একটা কাঠামো। গুঁতো দিল সে ওটার বাহুতে, ভেঙে গেল হাত। নীলুর হাতে ধুলো লেগে গেল।

‘এই তো পেয়েছি,’ বলল নীলু। ‘ওকে ভেঙে ফেলব, ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলব। তারপর বৃষ্টি হলেও ক্ষতি নেই। ছোট ছোট টুকরো সে নিশ্চয়ই জোড়া লাগাতে পারবে না। আর কোনদিন জ্যান্ত হয়েও উঠতে পারবে না।’

‘কী জানি!’ বলল শীলা। ‘শয়তানের তো ছলের অভাব নেই।’

‘তবে আমার ধারণা এতে কাজ হবে,’ বলল নীলু। ‘আর আমার ধারণা ভুল কিনা বৃষ্টি এলেই তা বোঝা যাবে। এখন এসো ওটার দফারফা করি।’

শুকনো মাটির ডাইনীটাকে ওরা তুলে নিল শীলার বাইকের বড় ঝুড়িতে। গুঁতো আর চিমটি দিয়েই চলল। কিন্তু ডাইনীর মাঝে প্রাণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

বারবার ওরা তাকাল আকাশের দিকে বৃষ্টি আসছে কিনা দেখতে। না, আসছে না। আগের মতই ঝকঝক করছে আকাশ।

যে যার বাইকে উঠে পড়ল ওরা, ধীর গতিতে চলে এল রাস্তায়। একটা জায়গা খুঁজছে ওরা যেখানে সূর্যের আলো সবচে’ ভালভাবে উত্তাপ ছড়ায়।

হেবারস্যাম প্রাসাদ আর মেইনল্যাণ্ড ব্রিজের মাঝামাঝিতে এমন একটা জায়গা পেয়েও গেল ওরা। আশপাশে শুকনো, মরা একটা তৃণভূমি আর খান কয়েক গাছ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

‘এতেই চলবে,’ বলল শীলা। লাফ মেরে নামল বাইক থেকে, বড় একটা ডাল খুঁজে নিল। তারপর এগোল শীলার বাইকের দিকে। ওর ঝুড়িতে রাখা শুকনো মাটির মস্ত ঢেলাটা নামাল দু’হাতে। তারপর গদার মত লাঠিটা মাথার ওপর তুলল, পরক্ষণে ওটা সবেগে নেমে এল ঢেলাটার ওপর।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল জলাভূমির ভয়ঙ্কর।

‘যা, শয়তান। নরকে যা!’ হিসহিস করে উঠল নীলু।

বারবার লাঠিটা দিয়ে আঘাত করে চলল সে, শেষ পর্যন্ত ধুলো

ছাড়া কিছুই রইল না রাস্তায়। সেই ধুলোর ওপর দিয়ে ওরা বাইক চালাল বার কয়েক। যেন মাটির সাথে মিশিয়ে দিল ডাইনীর শরীর। শেষে সন্তুষ্ট হয়ে নীলু বলল, 'চলো এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

চল্লিশ

গাড়ি ছুটে চলেছে হাইওয়ে ধরে। বাড়ি ফিরে চলেছে জিনাত সুলতানা নীলু। দুটো মাস যে কীভাবে কেটে গেছে, টেরই পায়নি ও। প্রাণের বান্ধবীকে রেখে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে ওর। শীলা কথা দিয়েছে নীলুদের শিকাগোর বাড়িতে যাবে।

মসল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে নীলুর। এই দু'মাসে ছোট্ট দ্বীপটির আনাচ-কানাচ সব চেনা হয়ে গেছে তার শীলার দৌলতে। দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো বটে!

ড. আহমেদ ফয়সাল শিস বাজাতে বাজাতে গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর প্রজেক্ট সফল। শিকাগো গিয়ে বেগুনী দাঁড়ার কাঁকড়ার ওপর জম্পেশ একটা নিবন্ধ জমা দেবেন তিনি।

নীলু জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরে। গাছ দেখছিল, আকাশ দেখছিল। খারাপ লাগছিল ওর। এই ক'টা দিনে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সবকিছুর ওপর। শুধু ওই পুরানো বাড়িটা বাদে। বাপরে, ওটা দুঃস্বপ্নেও তাকে তাড়া করে ফিরবে।

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে প্রবল বেগে কেঁপে উঠল নীলু।

বেশ দূরে যেখানে সে আর শীলা জলার ডাইনীটাকে মাটির

সাথে মিশিয়ে দিয়ে নিশ্চিত মনে বাড়ি গিয়েছিল সেখানে কী যেন একটা দেখতে পেয়েছে নীলু।

প্রচণ্ড তাপের কারণে হিট ওয়েভের সৃষ্টি হয়েছে, ভাবল নীলু। ভয়ের কিছু নেই।

ঠিক তখন ওকে দারুণ চমকে দিয়ে উইণ্ডশিল্ডের ওপর টপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল।

'না!' আঁতকে উঠল নীলু।

'ভয় পেলি নাকি?' মুচকি হাসলেন নীলুর বাবা। 'হ্যাঁ, বৃষ্টি আসছে। এ এলাকায় তীব্র উত্তাপের কারণে মাঝে মাঝেই হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়।'

গুরুগুরু শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। লাফিয়ে উঠল নীলু। লালচে, ধুলো মাখা রাস্তাটা গাঢ় হয়ে উঠল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টির পর্দা ঢেকে ফেলেছে রাস্তাটাকে।

'বাপি,' ভীত গলায় বলল নীলু। 'আরেকটু জোরে চালাও না।'

'আমি স্পিড লিমিট অমান্য করতে পারি না, নীলু।' বললেন ডক্টর। 'কাজটা বেআইনী এবং বিপজ্জনক, জানাই আছে তোর।'

রাস্তার ওপর ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল নীলু। হয়তো কল্পনা, ভাবল ও। কিন্তু রাস্তার ওপর সত্যি একটা কাঠামো যেন আকৃতি পেতে শুরু করেছে। প্রথমে কাঁধ দেখা গেল। তারপর মুখ। বিকট মুখটা ওর দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল।

তারপর শব্দটা শুনল ও। স্রেফ বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ নয়। নীলু যেন পরিষ্কার শুনতে পেল সেই পরিচিত, রক্ত হিম করা চিৎকার। 'ইইইই-হিইইই-হিইইই!'

'বাপি!' চিৎকার করে উঠল নীলু। 'জলদি চালাও! আমাদের ধরতে আসছে জলাভূমির ভয়ঙ্কর!'

***

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সে- প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না**। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১/৩/১৫ রুদ্র সীমান্ত+শয়তানের চক্র+শর্ত (ওয়েস্টার্ন ভলিউম)

কাজি মাহবুব হোসেন/কাজী শাহনূর হোসেন/গোলাম মাওলা নঈম

বিষয়ঃ রুদ্র সীমান্ত/কাজি মাহবুব হোসেনঃ কিঙ বিগ স্পেন্সার, রাজার মতই চাল-চলন। তার কথাই আইন। ছেলের উস্কানিতে পাহাড়ের ছোট র‍্যাঞ্চারদের উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নিল। খুন হলো বিল গ্রেহাম। আগুন জ্বলল। খাবার কেনা বন্ধ করে দেয়া হলো। মাইক মরগ্যান নেতৃত্ব দিচ্ছে পাহাড়ীদের। দুর্ধর্ষ পিস্তলবাজ সে–কিন্তু মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে কিঙ সাম্রাজ্যের এত লোকের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে? শুরু হলো সংগ্রাম।

শয়তানের চক্র/কাজী শাহনূর হোসেনঃ পাঁচ বছর পর থ্রী ফর্কসে ফিরেছে বব। উদ্দেশ্য, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু শহরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই উত্তেজনার আঁচ পেল ও। কথা নেই বার্তা নেই সেলুনে গ্রেপ্তার করা হলো ওকে। ওর বন্ধু গ্লেন আর হার্শেলকে নাকি খোঁজা হচ্ছে খুনের দায়ে। রুখে দাঁড়াল বব। বিনা বিচারে খুন হতে দেবে না বন্ধুদের।

শর্ত/গোলাম মাওলা নঈমঃ ছয় বছর পর চকটো বেণ্ডে ফের দেখা হলো ওদের—আত্মবিশ্বাসী টগবগে দুই যুবক, কর্নেল স্টুয়ার্টের আর্মির সাবেক ক্যাপ্টেন। একসময় পাশাপাশি চলেছে ওরা, পাড়ি দিয়েছে বহু বিপদসংকুল পথ, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই। কিন্তু এখন...পরস্পরকে খুন করতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে।

আরও আসছে

১০/৩/১৫ অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার (অনুবাদ/রিপ্রিন্ট)

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/কাজী মায়মুর হোসেন